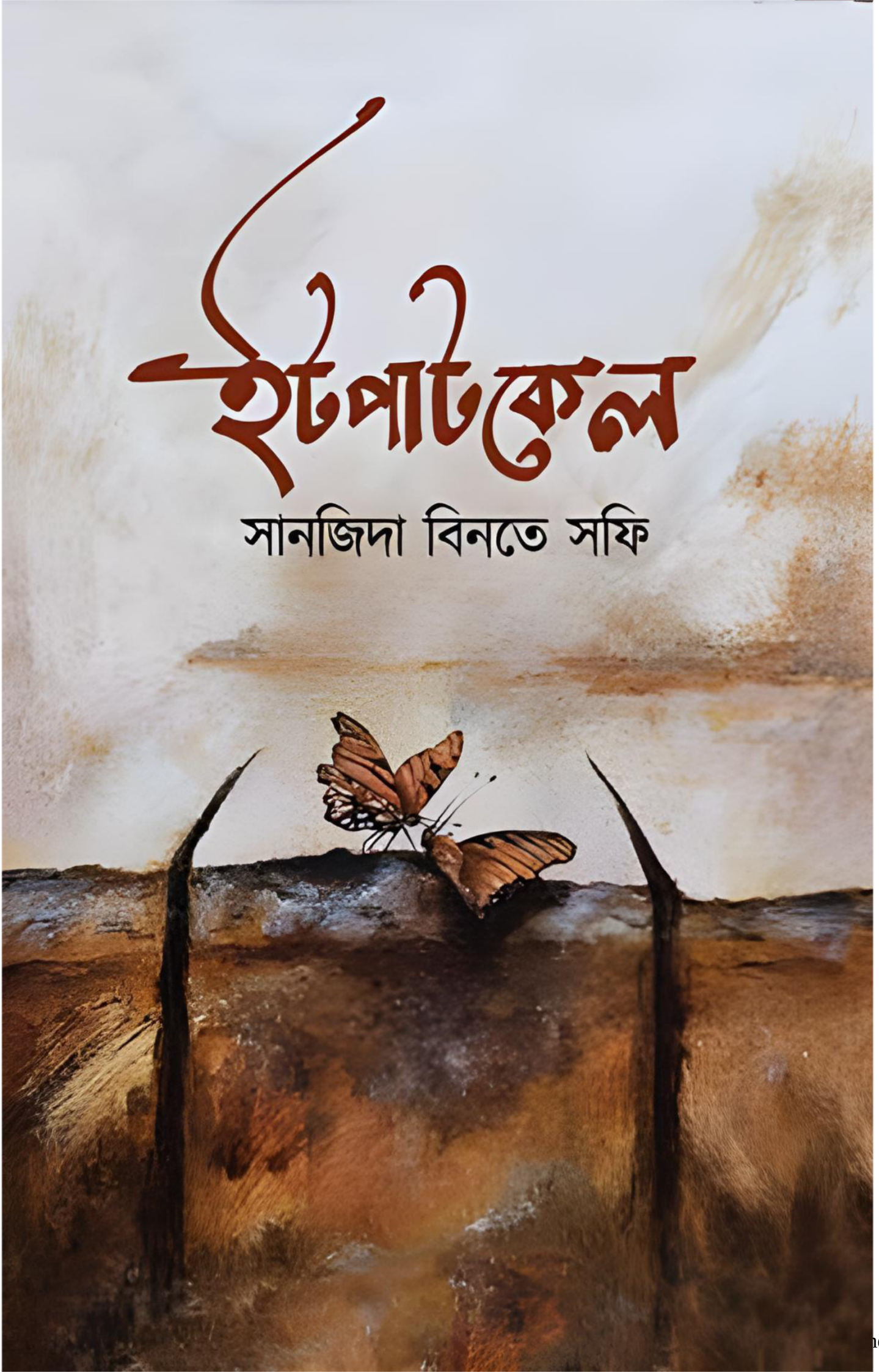
ইটপাটকেল

সানজিদা বিনতে সফি



ইটপাটকেল

সানজিদা বিনতে সফি

নবকথন

FREE PDF PETE FOLLOW TELEGRAM, CLICK KORUN

@ebook_bangla_robinhood

CamScanner

ভূমিকা

আমার পাঠকের কাছে আশমিন অত্যন্ত প্রিয় একটি চরিত্র। পাঠকের ভালোবাসায় আমি আশমিনকে বইয়ের পাতায় আনার সাহস করতে পেরেছি। কতটুকু সফল হয়েছি জানি না। তবে আমি চেষ্টা করেছি। অনলাইনে লেখা ইটপাটকেল আর বইয়ের ইটপাটকেল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঠোঁটকাটা নির্লজ্জ আশমিন বইয়ের পাতায় নিজেকে একটু পরিবর্তন করতে চেষ্টা করেছে। তবে লেখক হিসেবে আমি মনে করি সে সম্পূর্ণ ব্যর্থ!

প্রতিটি সন্তানের কাছে 'মা' শব্দটা খুব আবেগ আর ভালোবাসার। মায়ের কোনো অজানা অতীত হুট করেই সামনে এলে সন্তানের জন্য সেটা অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি সেই অতীত প্রেয়সীর পরিবারের সাথে জুড়ে থাকে তবে?

আমি জানি না—আমি গল্প কতটুকু ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি। এর উত্তর আমার পাঠক ভালো দিতে পারবে। প্রথম বই লেখার দুঃসাহস করেছি। তাই ভুল-ত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল।

সানজিদা বিনতে সফি
১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

CamScanner



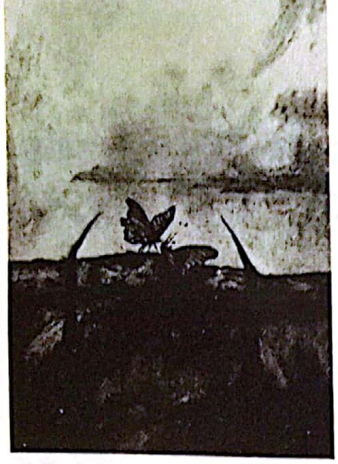
এই উৎসর্গটি আমার মাকে। এর কারণ লেখার প্রয়োজন নেই। মা শব্দটাই এর কারণ বহন করে। কখনো বলা হয়নি, আজ বলছি,

"ভালোবাসি, মা।"

FREE PDF PETE FOLLOW TELEGRAM, CLICK KORUN



CamScanner



দেশের নামকরা মডেল ও অভিনেত্রী সাবা খানের খুনের দায়ে পিবিআই-এর হাতে গ্রেফতার হয়েছে মিনিস্টার আশমিন জায়িন চৌধুরী। আশমিনকে পিবিআই হেডকোয়ার্টারে আনতেই চারদিক থেকে সাংবাদিকরা ঘিরে ধরেছে তাকে। আশমিন শান্ত নিশ্চল মুখে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। সাংবাদিকদের ভিড় সামলাতে পুলিশ হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। একের পর এক তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছে তার দিকে।

"নিজের ইমেজ পরিস্কার রাখতেই কি আপনার গোপন প্রেমিকাকে খুন করেছেন, মন্ত্রী সাহেব? নাকি এর পিছনে অন্য কোনো গল্প আছে? সাবা খান কি এমন কোনো গোপন তথ্য জেনে গিয়েছিলেন, যার জন্য তাঁকে নিজের প্রাণ দিতে হলো?"

আশমিন থামল। ভিড়ের মাঝে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে মুচকি হাসল সে। ঘাড় কাত করে চশমার উপর দিয়ে তাকাল মাইক্রোফোন হাতে দাঁড়ানো প্রশ্নকর্তার দিকে। যে কি না ক্রুর হেসে এই মুহূর্তে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। মাস্কের আড়ালে নিজের স্ত্রীকে দেখে চমকাল না সে। আশমিনকে থামতে দেখে কোলাহল কিঞ্চিৎ কমেছে বইকি। বুক টান টান করে হেঁটে স্ত্রীর সামনে দাঁড়ালে আশমিন। বাঁকা হেসে খানিকটা রসিকতার ছলে বলল, "আপনি তো দেখছি সবই জানেন। খুন হয়েছে ঘণ্টাখানেক হলো। এর মধ্যেই আপনি এত ইনফরমেশন জেনে গিয়েছেন! সাংবাদিকতা ছাড়ুন তো, ম্যাডাম। এই পেশায় কিচ্ছু নেই। আপনি বরং পিবিআই-এ যোগ দিন। তরতরিয়ে পদোন্নতি হয়ে যাবে। আপনার অবগতির জন্য জানিয়ে দিই, আমাকে সন্দেহভাজন হিসেবে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আনা হয়েছে, সাংবাদিক সাহেবা। আমার অপরাধ এখনো প্রমাণ হয়নি।"

এমন কঠিন সময়ে দাঁড়িয়ে আশমিনের সস্তা রসিকতায় চোয়াল শক্ত হয়ে এলো নুরের। ব্যঙ্গাত্মক গলায় বলল, "তাহলে কি আপনি লাশের সাথে এক্কা-দোক্কা খেলতে গিয়েছিলেন, মন্ত্রী সাহেব? তথ্য অনুযায়ী আপনাকে লাশের পাশেই পাওয়া গেছে।"

CamScanner

"এক্কা-দোক্কা খেলতে যাব কেন? বউ ছাড়া কারোর সাথে আমি এক্কা-দোক্কা খেলি না। ইয়ে মানে, আমি একটু বউভক্ত তো। আপনি একটু সবুর করুন, সবকিছু জেনে যাবেন।"

আশমিন চলে যেতে গিয়েও আবার দাঁড়াল। দুষ্টু হেসে বলল, "ও আরেকটা কথা, আমার আবার তাড়াহুড়ো একদম পছন্দ নয়। সবকিছু সময় নিয়ে করতে হয়।"

আশমিনের এমন নির্লজ্জ ইঙ্গিতে গা জ্বলে উঠল নুরের। কিছু বলার জন্য মুখ খুলতেই একজন অফিসার এসে বলল, "স্যার, এখান থেকে চলুন। আমাদের ভেতরে যেতে হবে। সবাই অপেক্ষা করছে।"

নুরের দিক থেকে চোখ সরিয়ে আশমিন গম্ভীর গলায় বলল, "হুম, চলুন।"

আশমিন ভেতরে চলে যেতেই নুরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তানভির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "জামাই দিয়া করাইলি তো নিজের বেজ্জতি। চল, অফিসে যাই। এইহানে আর কাম নাই।"

"আরে দাঁড়া, তোর কী মনে হয়? খুন কে করেছে? এই মন্ত্রী বেটা তো খুন করে নাই। কাজটা অন্য কারোর।"

তানভির অত্যন্ত দুঃখী গলায় বললেন, "এভাবে বলিস না, দোস্ত। এই লোক তোর একমাত্র স্বামী। তাও অনেক বছরের পুরোনো।"

নুর বিরক্ত চোখে তানভিরকে দেখল। সেখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বলল, "তার আরও একটা পরিচয় আছে। সে কামিনী চৌধুরীর ছেলে। আমার আব্বুর খুনি। তাদের জন্য আমার আব্বুকে মরতে হয়েছে। আমি এদের কাউকে শান্তিতে থাকতে দেবো না। চৌধুরী-বাড়ির সবাইকে চরম মূল্য দিতে হবে!"

নুরের চোখেমুখে প্রতিশোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। তানভির শুরু থেকেই সব জানেন। তাই আর কথা বাড়াল না। তবে নুরের দিকে সন্দিহান চোখে তাকাল একবার। এসবের পিছনে নুরের হাত নেই তো? নূরকে দেখতে যতটা সাধারণ লাগে আদতে সে তেমন নয়। পুরোনো বন্ধু হিসেবে এতটুকু খুব ভালো করেই আন্দাজ করতে পারে তানভির।

"কী মনে হয়, কতক্ষণ আটকে রাখা যাবে তাকে?"

নুর রহস্যময় হেসে বলল, "দেখা যাক। আমার ভাই আর কোনো কাজে লাগবে?"

"আশমিন ভাইয়ের জন্য মায়া হয়, দোস্ত। বেচারা দুধকলা দিয়া কালসাপ পুষতাছে! আগে জানলে কি আর আশিয়ানরে এত বড়ো পোস্টে দিত?"

নুর দুম করে কিল বসাল, তানভিরের পিঠে। রাগে গজগজ করতে করতে বলল, "আমার ভাই যোগ্য ছিল, তাই চাকরিটা পেয়েছে। অবান্তর কথা বলা বন্ধ কর।"

তানভির আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চাকরির পাওয়ার পিছনে আশমিন আছে, তা সে অনেক আগে থেকেই জানে। কেন যে নুর সেটা বিশ্বাস করতে চায় না, কে জানে! আমরা যাদের ঘৃণা করি তাদের ভালো কোনো গুণ আমাদের চোখে পড়ে না। অথবা পড়লেও এড়িয়ে যাই। নুরের ক্ষেত্রেও একই লজিক কাজ করছে। আশমিনের ভালো দিকগুলো তার চোখে ধরাই দিচ্ছে না। তানভিরের ভাবনার মাঝেই সাদা রঙের মার্সিডিজ বেঞ্জ ব্র্যান্ডের গাড়ি এসে থামল তাদের সামনে। গাড়ি থেকে গোমড়া মুখে বেরিয়ে এসেছে সানভি।

"চলুন, ম্যাম। এভাবে বাইরে ঘোরাঘুরি করা ঠিক হবে না।"

নুর সানভির মলিন মুখ দেখে রসিকতা করে বলল, "এমন গাল ফুলিয়ে রেখেছ কেন, সানভি? কেউ বকেছে নাকি?"

সানভি মাথা নিচু করে চুপ করে রইল। নুরের রসিকতা ভালো লাগছে না তার। স্যারের জন্য মন কেমন করছে! খুনটা তার স্যার করেনি। কিছুক্ষণ আগে সে অফিসেই ছিলেন। মনোযোগ দিয়ে কাজ করছিল। লাশের পাশে কখন আলাদিনের জিনের মতো হাজির হলো, সেই অঙ্কটাই মেলাতে পারছে না সানভি। বাসার সবার ঘুম হারাম হয়ে গেছে। আমজাদ চৌধুরীর প্রেশার হাই হয়ে যা-তা অবস্থা। আর এদিকে স্যারের স্ত্রী কি না এমন হেসে হেসে রসিকতা করছে! পৃথিবীতে মানবতা বলতে কিচ্ছু নেই। উঁহুঁ, একদমই নেই।

নুর গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, "চিন্তাভাবনা পরে করো, সানভি। আগে বাসায় চলো। নাটকের গুরুত্বপূর্ণ অংশ মিস করে যাচ্ছি তো।"

সানভি মন খারাপ করেই গাড়িতে বসল। স্যারের জন্য মায়া হচ্ছে তার। কতদিন বন্দি থাকবে, কে জানে!

আশমিনের সামনের চেয়ারে আশিয়ান বসে আছে। তার পাশে পিবিআই প্রধান রিয়াদ হোসেন দাঁড়িয়ে আছেন। থেমে থেমে কপালের ঘাম মুছছেন তিনি। আশিয়ান তীক্ষ্ণ গলায় বলল, "এত রাতে আপনি মিস. সাবা খানের বাসায় কী করছিলেন? কী এমন হলো যে, আপনি তাকে খুনই করে ফেললেন?"

আশমিন নিঃশব্দে হাসল। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী বাচ্চাকাচ্চা দিয়ে ইন্টারোগেশন করছ, রিয়াদ? এখন কি দুধের বাচ্চার কাছে জবাবদিহি করতে হবে?"

"আপনি এখন অপরাধীর চেয়ারে বসে আছেন, স্যার। তাই আমাদের সাথে কো-অপারেট করুন। যা জিজ্ঞেস করছি তার সঠিক জবাব দিন। কেন মেরেছেন সাবা খানকে?"

আশিয়ানের ধারালো বাক্যে অধর বাঁকিয়ে হাসল আশমিন। চেয়ারে গা এলিয়ে বসে শান্ত গলায় বলল, "আপনি কি আমাকে খুন করতে দেখেছেন, অফিসার? মার্ডার ওয়েপান আমার হাতে ছিল? সাবা খানের বাসায় আমার উপস্থিতি আমাকে খুনি প্রমাণ করে দিলো? না মানে, কী মনে হয় আপনার? খুন করে আমি আপনাদের আসার অপেক্ষা করছিলাম যে, কখন আসবেন আর আমাকে গ্রেফতার করবেন? এসবে সময় নষ্ট না করে আসল অপরাধীকে খুঁজুন। এখানে বসে থাকা ছাড়াও আমার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। সাবাকে খুন করার কোনো রিজন আমার কাছে নেই, অফিসার। সে আমার ভালো বন্ধু ছিল, এ কথা কম-বেশি সবাই জানে। তাছাড়া আমার যদি কাউকে মারতেই হয় তাহলে নিজে গিয়ে মারার প্রয়োজন নেই। একটা ফোনকলই যথেষ্ট। কী বলো, রিয়াদ?"

পিবিআই প্রধান অপ্রস্তুত হাসলেন। আশমিন জায়িন চৌধুরী হলো রাঘব-বোয়াল। উপযুক্ত প্রমাণ হাতে না নিয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করার কোনো মানে নেই। তিনি আমতা আমতা করে বললেন, "সাধারণ প্রসিডিওর তো ফলো করতেই হবে, স্যার। আমরা তো নিয়মের বাইরে যেতে পারি না। বুঝতেই তো পারছেন।"

আশমিন ঘড়ি দেখল। আশিয়ানের রাগে লাল হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, "প্রসিডিউর আজকের জন্য এখানেই শেষ। আমি এসেছি অলরেডি দুঘণ্টা হয়ে গেছে। বাসায় যাচ্ছি আমি। বউ অপেক্ষা করছে।"

"আপনি এভাবে যেতে পারেন না, স্যার। একটা মার্ডার কেসের প্রাইম সাসপেক্ট আপনি। আজ রাত আপনাকে এখানেই থাকতে হবে।"

আশমিন বিরক্ত গলায় রিয়াদ হোসেনকে বলল, "রিয়াদ, এই বাচ্চা তুমি সামলাও। ওকে বুঝিয়ে দাও, নিয়ম আমরাই তৈরি করি।"

আশমিনকে রেগে যেতে দেখে রিয়াদ হোসেন চোখ রাঙালেন আশিয়ানকে। কাঁচুমাচু গলায় বললেন, "আপনি যান, স্যার। আমি এদিকটা দেখছি।"

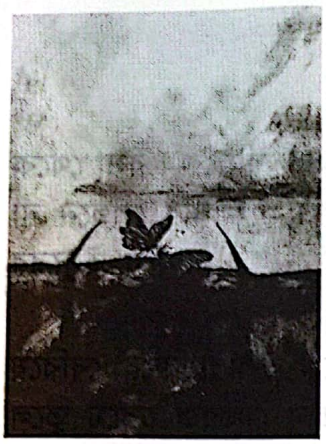
আশমিন চশমার উপর দিয়ে কড়া চোখে দেখল আশিয়ানকে। বসা থেকে উঠে দুহাতে টেবিল ভর দিয়ে ঝুঁকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, "আমার পেছনে না লেগে নিজের ডিউটি নিষ্ঠার সাথে পালন করো। সিংহের সামনে ইঁদুরের নাচানাচি হাস্যকর লাগে।"

আশমিন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রিয়াদ হোসেনকে ইশারা করে বেরিয়ে গেল। রিয়াদ হোসেন আশিয়ানের উপর বিরক্ত। তিনি মেজাজ চরমে তুলে ক্যাটকেটে গলায় বললেন, "এই ছেলে, সমস্যা কী তোমার? মন্ত্রী সাহেব তো তোমার বোন জামাই হয়। তা বোন জামাইয়ের পেছনে এভাবে লাগছ কেন?"

আশিয়ান নিজের রাগ গিলে নিল। চোখমুখ শক্ত করে বলল, "আমি আমার ডিউটি করছি, স্যার।"

"অ্যাহ, আসছে আমার ডিউটিওয়ালা! এভাবে ডিউটি করলে পৃথিবী থেকে ভ্যানিশ হয়ে যাবে, ছোকড়া। জায়গা বুঝে পা ফেলো, ছেলে। উনি একটা কেন, দশটা খুন করলেও আটকে রাখার ক্ষমতা আমাদের নেই। কারণ প্রমাণ পাবে না। খুব তো এই কেসের দায়িত্ব নিয়েছ! যাও, এবার প্রমাণ করো খুন অর্থমন্ত্রী আশমিন জায়িন চৌধুরী করেছে। তারপর এই লম্বা লম্বা ভাষণ ঝেড়ো। যত্তসব!"

রিয়াদ হোসেনের ঝাড়ি খেয়ে আশিয়ানের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। চুপচাপ হজম করল সে। তাকে ইঁদুর বলা! সিংহের মাথার উপর যদি তাণ্ডব করতে না পারে তাহলে এই চাকরি ছেড়ে দেবে—মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল সে।



নুর চৌধুরী-বাড়ি ফিরে বাড়ির পরিবেশ থমথমে দেখে বাঁকা হাসল। ড্রয়িংরুমে আমজাদ চৌধুরী-সহ সবাই উপস্থিত। কামিনী চৌধুরীর ভাই মিজু সিদ্দিক কাউকে ফোন করে চ্যাঁচামেচি করছেন। ছেলের কুকীর্তি ঢাকতেই এত আয়োজন চলছে! নুর ঠোঁট কামড়ে কামিনী চৌধুরীর দিকে তাকাল। দেখে মনে হচ্ছে মহিলা কেঁদে সাগর বানিয়ে তবেই দম নেবেন! যত্তসব কুমিরের কান্না! নুর নিজের জন্য বরাদ্দ কাউচে গিয়ে গা এলিয়ে বসল। আমজাদ চৌধুরী ক্লান্ত মুখে তাঁর পিএ গোলাম রব্বানির সাথে কথা বলছেন। তার উপস্থিতি কেউ তেমন একটা টের পায়নি। অথবা পেয়েও গুরুত্ব দেয়নি। তবে তাদের এমন বিধ্বস্ত দেখে ভালো লাগছে। বুকের ভেতর শীতল বাতাস বয়ে যাচ্ছে। মুচকি হেসে চোখ বন্ধ করল নুর। বাবার হাসি হাসি মুখটা ভেসে উঠল মানসপটে। এই তো বাবা আদর করে তার চুল বেঁধে দিচ্ছেন। আদর করে খাইয়ে দিচ্ছেন। আর বাসস্ট্যান্ডে তাকে বিদায় দেওয়া। তখন দুশ্চিন্তায় কাতর বাবার কত উপদেশ তাকে! নুরের ঠোঁটের হাসি প্রশস্ত হলো। তখনই মনের কোণে ভেসে উঠল বাবার রক্তাক্ত দেহখানা! ঘরের মেঝেতে নদীর ধারার মতো বয়ে যাওয়া বাবার লহু।

ঝট করেই চোখ খুলে ফেলল নুর। টলটলে রক্তাক্ত চোখে তাকাল কামিনী চৌধুরীর দিকে। যতবার এই মহিলাকে নিজের চোখের সামনে দেখে, ততবার নিজ হাতে কুপিয়ে খণ্ডবিখণ্ড করার লোভে তার হাত নিশপিশ করে। ভেতরের অস্থিরতা আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল। ঝট করে উঠে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেল সে। মাথার যন্ত্রণাটা বাড়ছে। একটা লম্বা শাওয়ার নিতে হবে। হাতের ব্যাগটা বিছানায় ফেলে দ্রুত ওয়াশরুমে ঢুকে গেল নুর। শাওয়ার ছেড়ে চোখ বন্ধ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে। চৌধুরী-বাড়িতে পা রাখার পর থেকে মায়ের সাথে দূরত্ব বেড়েছে। আজ কতগুলো দিন মায়ের মুখটা দেখা হয় না তার! বুকের ভেতর হাহাকার করে উঠল। চারিদিকে হাজার শূন্যতা যেন ধেয়ে আসছে তাকে গ্রাস করতে। ঠাস করে ওয়াশরুমের দরজা খুলে গেল। কেউ একজন দেওয়ালের সাথে চেপে ধরেছে তাকে। বন্ধ চোখ খুলতেই আশমিনের রক্তিম মুখখানা দেখেই রহস্যময় হাসল নুর। শুভ্র

পাঞ্জাবি ভিজে শরীরে লে
গলিয়ে পানি এসে ভিজিয়ে
গলায় বলল, "শ্বশুরবাড়ি
আমি তো ভেবেছিলাম কয়ে

আশমিনের চোয়াল
সাহেবের আদর-যত্ন পছন্দ
এসেছি। নাও, শুরু করো।

নুর ধাক্কা দিয়ে সরি
দাঁড়ান, যা বলার দূর থেকে

"সাবার ফ্ল্যাটে কেন

"প্রয়োজন ছিল।"

নুরের নির্লিপ্ত কণ্ঠে
চোয়াল শক্ত করে বলল,
পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে।
আর কত, নুর? অনেক তে

আশমিনের ক্লান্ত গল
করে বলল, "এখনো কিছু
যদি আমাদের মাঝে না
একজন খুনিকে প্রটেক্ট ক
তো ছাড়ব না আমি। আ
বের করে নেব। একটু শা
বড়ো বড়ো কথা না বলে
শাস্তি দিন। যন্ত্রণাময় মৃতু
আপনার মধ্যে নেই। কাপু

আশমিন আগুন চো
গেছে তার। শেষের শব্দ
পৃথিবী থেকে গত হয়ে
চেষ্টা করল। শান্ত গলায়
জেদকে সাইডে রেখে
ব্যাপারে কিছুই জানে না
শুধু চৌধুরী-বাড়ি থেকে
করেছে তারা সঠিকভাবে
রাখতে তোমাদের অপমা

পাঞ্জাবি ভিজে শরীরে লেপটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আশমিনের ভেজা চুল গলিয়ে পানি এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে নুরের বদন। নুর মুখ সরিয়ে নিল। ব্যঙ্গাত্মক গলায় বলল, "শ্বশুরবাড়ি থেকে দেখছি বড্ড তাড়াতাড়ি ছাড়া পেয়ে গেলেন! আমি তো ভেবেছিলাম কয়েকদিন খাতির-যত্ন চলবে।"

আশমিনের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "শালা সাহেবের আদর-যত্ন পছন্দ হয়নি। তাই তার বোনের কাছে আদর পেতে চলে এসেছি। নাও, শুরু করো।"

নুর ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো আশমিনকে। বিরক্ত গলায় বলল, "সরে দাঁড়ান, যা বলার দূর থেকে বলুন।"

"সাবার ফ্ল্যাটে কেন গিয়েছিলে?"

"প্রয়োজন ছিল।"

নুরের নির্লিপ্ত কণ্ঠে মেজাজ হারাল আশমিন। শক্ত করে বাহু চেপে ধরে চোয়াল শক্ত করে বলল, "তোমার প্রয়োজন আমাকে পিবিআই হেড অফিস পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে। আমার কতটা সম্মানহানি হয়েছে, একবার ভেবেছ? আর কত, নুর? অনেক তো হলো।"

আশমিনের ক্লান্ত গলা। নুর নিজেকে সামলাতে পারল না। ক্রোধে গর্জন করে বলল, "এখনো কিছুই হয়নি, আশমিন চৌধুরী। সবে তো শুরু। আপনি যদি আমাদের মাঝে না দাঁড়াতেন তাহলে আজ এমন কিছুই হতো না। একজন খুনিকে প্রটেক্ট করছেন আপনি; আমার আব্বুর খুনিকে। এত সহজে তো ছাড়ব না আমি। আপনাদের জীবন থেকে সুখ, শান্তি, স্বস্তি সব নিংড়ে বের করে নেব। একটু শান্তির আশায় মরিয়া হবেন সবাই। পাবেন না। এত বড়ো বড়ো কথা না বলে আমাদের সাথে ন্যায় করুন তো, যান, দোষীকে শাস্তি দিন। যন্ত্রণাময় মৃত্যু দিন তাকে। পারবেন? পারবেন না। সেই সাহস আপনার মধ্যে নেই। কাপুরুষ আপনি!"

আশমিন আগুন চোখে তাকিয়ে আছে। রাগে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে গেছে তার। শেষের শব্দটা অন্য কারও মুখ থেকে বের হলে সে এতক্ষণে পৃথিবী থেকে গত হয়ে যেত। আশমিন চোখ বন্ধ করে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল। শান্ত গলায় বলল, "আম্মু এই খুনের সাথে জড়িত নয়, নুর। জেদকে সাইডে রেখে আমাকে একবার বিশ্বাস করো, আম্মু এই খুনের ব্যাপারে কিছুই জানে না। আমি নিজে খোঁজ নিয়েছি। সেদিনের ডাকাতগুলো শুধু চৌধুরী-বাড়ি থেকে তাদের ভাড়া করা হয়েছে বলে স্বীকার করেছে। কে করেছে তারা সঠিকভাবে বলতে পারেনি। আমার আম্মু নিজের ইগো বজায় রাখতে তোমাদের অপমান করেছে আমি স্বীকার করছি। সমাজের মানুষ দিয়ে

CamScanner

তোমাদের অপদস্থ করেছে সবটাই মেনে নিচ্ছি, তবে আংকেলের মৃত্যুতে তার কোনো হাত নেই।"

নুর অবজ্ঞার হাসি দিয়ে আশমিনের চোখে চোখ রেখে বলল, "এক কথা আর কতবার বলবেন, মন্ত্রী সাহেব? শুনে শুনে কান পচে যাওয়ার জোগাড়! নিজের মাকে বাঁচাতে একের পর এক মিথ্যা লাইন বাই লাইন সাজিয়ে বলে যাচ্ছেন। লজ্জা হয় না আপনার? আচ্ছা মেনে নিলাম আপনার মা নির্দোষ। তাহলে চৌধুরী-বাড়ি থেকে কে তাদের ভাড়া করেছিল? আপনি? নাকি আংকেল?"

আশমিন জবাব দিলো না। মৌন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নুরের দিকে। সে নিজেও এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছে। তার দিনগুলো ভয়ানক শঙ্কায় কাটে! সত্যি যদি তার মা এই খুনের সাথে জড়িয়ে থাকে, কী করবে সে? মাকে কি শাস্তি দিতে পারবে? আর ভাবতে চায় না আশমিন। তার আম্মু কখনো এমন করতে পারে না। অহংকারী বটে। তবে খুনি নয়।

নুরকে ছেড়ে ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে গেল আশমিন। নুর শান্ত চোখে তাকিয়ে রইল আশমিনের যাওয়ার দিকে।

ধীর পায়ে এগিয়ে গেল বিছানার দিকে। ল্যাপটপ খুলে সাবার অন্তরঙ্গ ভিডিয়োটা পাঠিয়ে দিলো বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলে। সাবার সাথের মানুষটার মুখ ব্লার করে দিয়েছে সে। ফেইস দেখা না গেলেও এটা স্পষ্ট যে, এই লোকটা আশমিন নয়। নিজের কাজ সেরে মাথা এলিয়ে দিলো নুর। এই ফুটেজটা সংগ্রহ করতে গিয়ে আজ এত ঝামেলা হয়ে গেছে। ভাগ্য ভালো আগেভাগেই বেরিয়ে আসতে পেরেছে সে। মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল নুর। এত কিছুর পরও আশমিনকে প্রটেক্ট করতে ইচ্ছে হয়! আনমনেই মলিন হাসল সে। ভালোবাসা এত বিচিত্র কেন? অতীতের কালো অধ্যায়ে তাদের ভালোবাসা অদৃশ্য হয়ে গেছে। গায়ে গা ঘেঁষে থাকলেও মন পর্যন্ত পৌঁছানো অসম্ভব! চোখ বন্ধ করে বাবার মুখটা মনে করার চেষ্টা করল নুর। মনে পড়ে গেল সেই দিনগুলো...।

ডিসেম্বরের শীতে সবাই তখন নাজেহাল। নুরদের বাড়িতে তখন পিঠার আয়োজন চলছে। পিঠার গন্ধে ম-ম করছে শিকদার-বাড়ি। সকাল সাতটা বাজলেও বাইরের আবহাওয়া দেখে তা বোঝার উপায় নেই। মনে হচ্ছে এই সবে ফজরের আজান হলো। ঘন কুয়াশায় কিছুই চোখে পড়ছে না। দুহাত দূরের কিছুও নজরের বাইরে।

আড়মোড়া ভেঙে অলস ভঙ্গিতে বিছানায় শুয়ে আছে নুর। এই শীতের সকালে উঠে নিজের চামড়া ফাটানোর কোনো মানেই হয় না। শীতের আবহাওয়া নুরের একদম সহ্য হয় না। শীতের শুরুতেই তার পা ফেটে খরার ফসলি জমির মতো হয়ে যায়। আর ঠান্ডা পানি মুখে লাগলেই তো গাল আর ঠোঁট ফেটে যা তা অবস্থা! তাই রোদ ওঠার আগ পর্যন্ত সে পুরোপুরি চেষ্টা চালিয়ে যায় বিছানায় থেকে যাওয়ার, কিন্তু তার মা নাফিজা শিকদার তা হতে দিলে তো। হলে থাকার এই এক সুবিধা। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে হয় না। বাড়িতে নাফিজা শিকদার সেই কাকডাকা ভোর হতে চ্যাঁচামেচি করতে থাকেন। কাক উড়ে গেলেও তাঁর চ্যাঁচামেচি বন্ধ হয় না। ঠিক এই মুহূর্তে নাফিজা শিকদার ভয়ংকর রেগে তার ভাই আশিয়ানকে কয়েক ঘা লাগিয়েছেন। আশিয়ান নুরের তিন বছরের ছোটো। এবার অনার্স প্রথম বর্ষে অ্যাডমিশন নিয়েছে। আশিয়ান মার খেয়ে আবার মায়ের পিছনে লেগেছে। এই ছেলের লজ্জা বলতে কিছুই নেই। অহরহ মায়ের হাতে উত্তমমধ্যম খেয়ে ঠিক তার পর মুহূর্তেই আবার মায়ের গা ঘেঁষে বসে দাঁত বের করে বলবে, "আম্মু, তোমার হাতের মাইর না খেলে আমার দিন ভালো কাটে না। মনে হয় ডালের মধ্যে নুন নেই। তুমি তো আমার দিনটা ভালো করে দিলে। আজ আব্বু আসলে বলব তোমাকে নানুর বাড়িতে রেখে আসতে। না মানে বেড়াতে নিয়ে যেতে।"

নাফিজা শিকদার রেগে আরও কয়েক ঘা লাগিয়ে দিলেও আশিয়ানের কোনো হেলদোল হয় না। নাফিজা শিকদার হাঁপিয়ে গেলে দুহাতে মাকে জড়িয়ে ধরে শব্দ করে হাসতে থাকে। ফ্যানের নিচে বসিয়ে ঠান্ডা পানি খাইয়ে আবার নিজের দুষ্টামিতে লেগে যায়।

আজ আশিয়ানের মার খাওয়ার কারণ, সে চৌধুরীদের খেজুর বাগানের রসের হাঁড়ি ফাটিয়ে দিয়ে এসেছে। তা আবার হাসতে হাসতে এসে মায়ের কাছে বুক ফুলিয়ে বলেছেও। ব্যস, নাফিজা শিকদারের গরম মাথা আরও কয়েক ডিগ্রি গরম হয়ে গেল। পিঠে কয়েক ঘা লাগিয়ে গজগজ করতে করতে নুরের রুমে গিয়ে তাকেও কয়েক গা লাগালেন। এত বড়ো ডাঙর মেয়ে বিছানায় শুয়ে দিনের অর্ধেকটা পার করে দেয়। প্রথম ছেলের পর এ দুটো বজ্জাতকে পৃথিবীতে আনাই তাঁর মস্ত ভুল। আরও অনেক কথা শুনিয়ে তিনি আবার রান্নাঘরে চলে গেলেন। নুর হাই তুলে সোজা হয়ে বসল। পিঠের উপর কয়েকবার হাত বুলিয়ে ওয়াশরুমে চলে গেল ফ্রেশ হতে। এসব তার কাছে নতুন কিছু নয়।

নুরের বাবা রাফসান শিকদার একজন ব্যবসায়ী। মুন্সিগঞ্জ সদরে তাঁদের দুটো চালের আড়ত আছে। এছাড়াও তার বাবা আলুর ব্যাবসা করেন। মুন্সিগঞ্জের প্রধান ফসল হচ্ছে আলু। প্রায় সব কৃষকই আলু চাষ করে। তাই তার ব্যাবসাও রমরমা চলে। মফস্সলে থেকেও মোটামুটি টাকাওয়ালা মানুষ তিনি।

নুরেরা তিন ভাই বোন। বড়ো ভাই অমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা শেষ করে নিজের ব্যাবসা সামলাচ্ছে। স্বভাবে নুর আর আশিয়ানের সম্পূর্ণ বিপরীত সে। অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের অল্পভাষী মানুষ অমি শিকদার। ভাইবোনদের সকল আবদার তার কাছেই। ঢাকা থেকে বাড়িতে আসলে ভাইয়ের গলা ধরে বাঁদরের মতো ঝুলে থাকে দুই ভাইবোন। টানাটানি করে অমির কাপড় ছিঁড়ে ফেললেও অমি হাসিমুখে দুটোকে সামলে নেয়। এত বড়ো হয়েও ভাই আর বাবার কাছে তারা নিতান্তই বাচ্চা। আশিয়ান মুন্সিগঞ্জ হড়েগঙ্গা সরকারি কলেজে অনার্স প্রথম বর্ষে অধ্যায়নরত। ভাইয়ের সাথে ঢাকা যেতে চাইলেও নাফিজা শিকদার কিছুতেই রাজি হননি। ছেলেকে এত দূরে দিয়ে রাতের ঘুম হারাম করবেন না তিনি। এননিতেই দুই ছেলে-মেয়ে ঢাকায় থাকে। আশিয়ান চলে গেলে বাড়ি পুরো ফাঁকা হয়ে যাবে তাঁর। নুর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জার্নালিজম নিয়ে এ বছর অনার্স শেষ করেছে। রেজাল্ট আসার আগ পর্যন্ত গ্রামেই থাকবে সে।

সকাল সকাল স্ত্রীর চ্যাঁচামেচিকে মোটেও কানে তোলেন না নুরের বাবা। তিনি নিজের মতো নাস্তা করছেন। নুর এসে ধপ করে বাবার পাশে বসে গম্ভীর গলায় বলল, "দাদু এটা মোটেও ঠিক করেনি, আব্বু। নিজের ভাইয়ের মেয়েকে আমাদের আম্মু বানিয়ে দিয়েছে। আজ যদি আম্মুর অন্য কোথাও বিয়ে হতো তাহলে সে আমাদের ফুপু হতো। শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে আমাদের কত আদর করত। আর এখন সকাল-বিকেল ঝাড়ুর বাড়ি খাচ্ছি।"

রাফসান শিকদার মুচকি হাসলেন। নিজের প্লেট থেকে এক টুকরো রুটি মেয়ের মুখে তুলে দিয়ে শান্ত গলায় বললেন, "আমি তোমার আম্মুকে অনেক ভালোবাসি, মা। তাই তোমার দাদু তাকে তোমাদের আম্মু বানিয়ে দিয়েছে। সে বুঝতে পারেনি তার জন্য তোমাদের সকাল-বিকেল ঝাড়ুর বাড়ি খেতে হবে। মায়ের কথা শুনলে তো আর মা বকবে না। এখন থেকে মায়ের সব কথা শুনবে। ঠিক আছে?"

নুর রুটি চিবানোতে মন দিলো। আশিয়ান গালে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, "উনি শত্রুপক্ষের লোক, আপু। বলে লাভ নেই। উলটো আমাদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিতে পারেন। তাই পিঠ বাঁচাতে চাইলে সাবধান।"

নুর টেবিলের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে সন্দিহান গলায় বলল, "এই, আম্মু সকালে পিঠা বানিয়েছিল না? সেগুলো কোথায়?"

"আগে নাস্তা শেষ কর, তারপর পাবি। না খেয়ে চেহারা ইঁদুরের মতো হচ্ছে দিনদিন। পুরো চারটা রুটি খেতে হবে। নে শুরু কর।"

নাফিজা শিকদারের কথা শুনে নুর রুটি খাওয়ায় মন দিলো। মার খাওয়ার চেয়ে রুটি খাওয়া উত্তম।

নাফিজা শিকদার গরম গরম পাটিসাপটা রাফসান শিকদারের প্লেটে তুলে দিতে দিতে উদ্‌বিগ্ন গলায় বললেন, "কাল থেকে অমির ফোন বন্ধ পাচ্ছি। ছেলেটা তো কখনো ফোন বন্ধ রাখে না, অমির আব্বু। আমার চিন্তা হচ্ছে।"

"চিন্তা করো না, ব্যস্ত আছে হয়তো। আমার সাথে কাল বিকেলে একবার কথা হয়েছে। বাড়িতে আসবে বলল। ফোনে চার্জ নেই হয়তো। কিছুক্ষণ পর আবার কল করে দেখো। আমিও কল দেবো।"

নাফিজা শিকদার উদ্‌বিগ্ন মুখেই মাথা নাড়লেন। ছেলেটা রাজনীতিতে জড়ানোর পর থেকে সারাক্ষণ চিন্তায় থাকেন তিনি। আজকাল কাউকে বিশ্বাস নেই। কখন কী হয়ে যায়, বলা মুশকিল। এবার এলে ভালো করে বুঝিয়ে বলবেন রাজনীতি ছেড়ে দিতে। ছেলের গায়ে একটা সুচের খোঁচাও তাঁর কলিজা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়।

রাফসান শিকদার দুটো পিঠা খেয়ে বেড়িয়ে গেলেন। আজ তিনি চাষিদের কাছে আলুর বীজ বিক্রি করবেন। তাই সারাদিন আর বাসায় আসবেন না।

নুর আর আশিয়ান চিন্তিত মুখে নাস্তা সারল। ভাইয়ের জন্য চিন্তা হচ্ছে। রুমে গিয়ে অমির ফোনে কয়েকবার কল করল নুর। ফোন লাগাতার বন্ধ বলছে। চিন্তায় পায়চারি শুরু করে দিয়েছে নুর। আশিয়ান নিজের চুল টানতে টানতে বলল, "ভাইকে বলেছিলাম রাজনীতিতে না যেতে। আমার ওই আশমিন চৌধুরীকে একদম ভালো লাগে না। তার দলের কত ছেলেকে নিজের জীবন দিতে হয়েছে তার জন্য। আমার ভাই কেন যে তার সাথে হাত মিলাল, কে জানে! তারা পাওয়ারফুল মানুষ। তাদের কিছু হবে না। তাদের শেল্টার দেওয়ার মানুষ আছে। আমাদের তো কেউ নেই। ভাই কেন এটা বোঝে না, বলো তো, আপু?"

নুর বিরক্ত হয়ে ফোন কান থেকে নামিয়ে রাখল, "চৌধুরি-বাড়িতে গিয়ে লুবানার থেকে আশমিন ভাইয়ার নাম্বার নিয়ে আয়। সে জানে আমার ভাইয়া কোথায়। আমার ভাইয়ার কিছু হলে এই লোককে আমি ছাড়ব না। রাজনীতি করা জন্মের মতো ঘুচিয়ে দেবো।"

আশিয়ান দৌড়ে চলে গেল চৌধুরী-বাড়ির দিকে। আসার পথে আরও কয়েকটা হাঁড়ি ভেঙে আসবে। সারা বছর গাছ দেখে দেখে রসের ভাগ পাবে না। তা তো হতে পারে না।

আশিয়ান কয়েক মিনিটেই চৌধুরী-বাড়ির প্রধান ফটকে উপস্থিত হলো। দারোয়ান মতি মিয়াঁ তাকে দেখেই পান খাওয়া দাঁত বের করে হেসে কৌতুকের স্বরে বলল, "বাড়িতে খাতির-যত্ন তো মনে অয় ভালোই অইছে, মিয়াঁ। সকাল সকাল নালিশ গেছে হুনলাম।"

"মায়ের কানে কথাটা কে তুলল, বলো তো, মতি চাচা? আমার মতো নিষ্পাপ শিশুর বিরুদ্ধে এ কেমন ষড়যন্ত্র?"

মতি মিয়াঁ খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসল। মুখ ভরতি পানের পিক ফেলে ফিসফিস করে বলল, "আব্দুল আলি কইছে। হেয় বলে নিজের চোক্ষে দেখছে। তা তুমি কি হেই খবর জানতেই আইছ?"

"না, চাচা। লুবানা আপুর কাছে এসেছি। জরুরি দরকার। আপু কি কলেজে চলে গেছে?"

"না, ছোডো ম্যাডাম তো আউজকা বাইর অয় নাই। গেলে বাড়িতেই পাইবা।"

আশিয়ান দ্রুত পায়ে ভেতরে চলে গেল। মূল ফটক থেকে বাড়ির দূরত্ব মিনিট দুয়েকের। বাড়ির বারান্দায় লুবানার মা লতিফা চৌধুরীর সাথে দেখা হয়ে গেল তার। আশিয়ানকে দেখেই তিনি চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন, "তুই নাকি আমাদের রসের হাঁড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিস?"

"মিথ্যা কথা। তুমিও আজকাল গুজবে কান দিচ্ছ নাকি, কাকি? তুমি জানো না, আমি কত ভালো ছেলে?"

"সব জানা আছে আমার। দিন দিন চূড়ান্ত দুষ্ট হচ্ছিস তুই। তা সকাল সকাল কী মনে করে আসা হলো?"

"লুবানা আপুর কাছে এসেছি। ভাইয়ার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না কাল থেকে। আশমিন ভাইয়ার সাথেই তো থাকে। তার নাম্বারটা নিতেই এসেছি।"

লতিফা চৌধুরী উদ্‌বিগ্ন গলায় বললেন, "কী বলছিস! এটা তো খুব চিন্তার কথা। আজকাল দেশের যা অবস্থা! এমন কিছু শুনলেই তো কলিজা শুকিয়ে যায়। তুই দাঁড়া, আমি লুবানাকে ডেকে দিতে বলছি।"

লতিফা চৌধুরী কাজের মেয়েকে ডেকে বললেন লুবানাকে ডেকে দিতে। এরপর আশিয়ানকে বললেন, "তুই বস। লুবানা এক্ষুনি চলে আসবে। সারা রাত চোখের সামনে ফোন নিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। আর সকাল হলে মরার মতো ঘুমায়। মেয়েটাকে নিয়ে কী যে করি!"

আশিয়ান বসল না। এ মাথা থেকে ও মাথা পায়চারি করতে লাগল। লতিফা বেগম বিড়বিড় করে মেয়েকে গালি দিতে দিতে উঠে গেলেন। লুবানা এলো পনেরো মিনিট পর। ঘুমের জন্য চোখ খুলতে পারছে না সে। আশিয়ানকে দেখে বিরক্তিতে চোখমুখ কুঁচকে ফেলল, "তোকে বলেছি না সকাল সকাল আমার কাছে আসবি না? বড়োদের কথা শুনিস না কেন, বেয়াদব? আমার কাঁচা ঘুমটা ভেঙে কী লাভ হলো তোর?"

"আমি আসতে চাইনি। আপু পাঠিয়েছে। আশমিন ভাইয়ার নাম্বার চাই। দিয়ে দাও, চলে যাই।"

মুহূর্তেই লুবানার ঘুম ছুটে গেল। চোখ বড়ো বড়ো করে আশিয়ানের দিকে তাকাল। সন্দিহান গলায় বলল, "নুর আপু চেয়েছে ভাইয়ার নাম্বার? আমার বিশ্বাস হয় না। উঁহুঁ, না মানে না।"

"উফ, আপু! মজা করো না তো। বিশ্বাস না হলে আপুকে কল করে জেনে নাও। তবুও নাম্বারটা দাও, প্লিজ। ভাইয়াকে কাল রাত থেকে ফোনে পাচ্ছি না। সবাই খুব চিন্তায় আছি।"

"আরে বোকা, এত চিন্তা করছিস কেন? হয়তো ফোনে চার্জ নেই, তাই পাচ্ছিস না। অমি ভাইয়া তো আর ছোটো বাচ্চা না। তোরা অযথাই চিন্তা করছিস।"

"তুমি কি নাম্বারটা দেবে?"

আশিয়ানের রাগী মুখের দিকে তাকিয়ে লুবানা হালকা হাসল। গাল টেনে বলল, "রেগে যাচ্ছিস কেন? দাঁড়া, নিয়ে আসছি।"

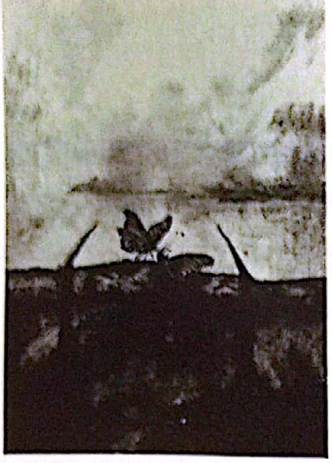
নাম্বার লিখে কাগজটা এনে আশিয়ানের হাতে দিলো। আশিয়ানকে আরেকটু রাগিয়ে দিতে চিন্তিত হওয়ার ভান করে বলল, "আমার কী মনে হয়, জানিস? অমি ভাইয়া তার গোপন প্রেমিকা নিয়ে পালিয়ে গেছে। বুঝলি আশিয়ান, আমি আগেই জানতাম এমন কোনো কেস আছে। আমার সন্দেহ কখনো মিথ্যা হয় না।"

নিজের ভাইয়ের সম্পর্কে কোনো নেতিবাচক কথা আশিয়ান বা নুর, কেউই সহ্য করতে পারে না। আশিয়ানের হালকা লাল হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল লুবানা। আশিয়ানের মেজাজ চরম খারাপ হলো। সে চটে যাওয়া মেজাজ নিয়ে বলল, "আমার ভাইয়ের মতো অমন

দুধের বাচ্চার নামে এত বড়ো অপবাদ দিতে তোমার জিভ কাঁপল না? এই এলাকার সবাই জানে, আমার ভাইয়ের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র। আমার ভাই এখনো চিংড়ি মাছের লেজ ছিঁড়ে খেতে পারে না। আর তুমি তার নামে এত বড়ো অপবাদ দিলা? যাও, এক্ষুনি হারপিক দিয়ে মুখ ধুয়ে এসো। তোমার মুখ অপবিত্র হয়ে গেছে।"

"চুপ কর, নাটকবাজ! এত কথা তুই বলিস কীভাবে? যা, তাড়াতাড়ি বাসায় যা। নুর আপুকে অমি ভাইয়ার আপডেট আমাকে দিতে বলিস।"

আশিয়ান দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল। লুবানা তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে হালকা হাসল।



নিস্তব্ধ অন্ধকার রুমে একটু পর পর ফোনের আলো জ্বলে উঠছে। বেলা মাথার উপর উঠে গেলেও ফোনের মালিক গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ফোন তোলার কোনো তাড়া তার মধ্যে নেই। তবে অপরপ্রান্তে থাকা মানুষটা যেন কল দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। একের পর এক কল করতে করতে ফোনের নোটিফিকেশন ভরিয়ে দিচ্ছে। বারবার আলো জ্বলে ওঠায় তন্দ্রা হালকা হয়ে এলো আশমিনের। সদ্য বিবাহিত দম্পতির মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা চোখের পাতাগুলোকে নিষ্ঠুরের মতো টেনে আলাদা করল সে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, এই কলটা যদি তার অ্যাসিস্ট্যান্ট সানভির হয়ে থাকে তাহলে আজ দুই ঘণ্টা ড্রাইভ করে তাকে পদ্মা নদীতে ফেলে দিয়ে আসবে। চোখ খুলে ফোনের স্ক্রিনে তাকিয়েও কোনো লাভ হলো না তার। ঝাপসা চোখে কিছুই দেখতে পেলে না সে। বেডসাইড টেবিল হাতড়ে চশমা চোখে দিয়ে কয়েক সেকেন্ড চোখ কঁচলে পুনরায় ফোনের দিকে তাকাল। নাম্বারটা তার পরিচিত। কলদাতাকে ভালো করেই চেনে। হুট করে ঘুম ভাঙায় মাথাটা টনটন করছে তার। ফোনটা রিসিভ করে কানে চেপে গম্ভীর গলায় "হ্যালো" বলতেই ফোনের ওপাশে হাঁসফাঁস করতে থাকা তরুণীর সদ্য খোলা মুখটা আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল। আশমিনের ঘুমঘোর গলার স্বর কর্ণকুহরে প্রবেশ করতেই তার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেছে। কয়েকবার ঢোক গিলে নিজেকে ধাতস্থ করল সে। আশমিন ততক্ষণে উঠে বসেছে। নিজের ঠান্ডা হাতটা কপালে চেপে ধরে শান্ত গলায় ডাকল, "নুর!"

নুরের চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে গেল। কয়েকবার ঢোক গিলে মিনমিনে গলায় বলল, "আপনি কীভাবে বুঝলেন আমি কল করেছি?"

"তোমার নাম্বার ছিল আমার কাছে।"

নুরের ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করতে, "কেন?" কিন্তু সে আর কথা বাড়াল না। নিজেকে ধাতস্থ করে শান্ত গলায় বলল, "আপনি বোধ হয় ঘুমাচ্ছিলেন, ভাইয়া। আমি খুবই দুঃখিত এই অসময়ে কল করার জন্য। আসলে কাল থেকে অমি ভাইয়াকে ফোনে পাচ্ছি না। ভাইয়া তো আপনার সাথেই বেশিভাগ সময় থাকে। তাই..."

আশমিনের এই নরম আবহাওয়াটা ও খুব তেতো লাগছে। নুরের ভাইয়া ডাকটা কাঁটার মতো সর্বাঙ্গে হুল ফুটিয়ে দিচ্ছে। নিজের বিরক্তি ভাবটা লুকিয়ে যথাসম্ভব গলার স্বর গম্ভীর করে বলল, "আর কখনো যেন না শুনি!"

নুর থতমত খেয়ে গেল। দ্বিধান্বিত গলায় বলল, "মানে?"

"আর কখনো ভাইয়া ডাকবে না। ভাইয়া শব্দটা আমার পছন্দ নয়।"

"ভাইয়া না ডাকলে কী ডাকব? তাছাড়া লুবানাও তো আপনাকে ভাইয়া ডাকে।"

"তুমি ডাকবে না। কে কী ডাকল, তাতে তোমার কান দেওয়ার প্রয়োজন নেই।"

নুর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "ঠিক আছে, ডাকব না। এবার বলুন ভাইয়া কোথায়? আপনার সাথেই আছে তো?"

আশমিনের কপালে ভাঁজ পড়ল। অমির কোনো খবর সে জানে না। দলে অনেক ছেলেই কাজ করে। আশমিনের অফিসে পরশু তাদের কথা হয়েছে। তবে সানভি কিছু জানলে জানতেও পারে। ফোনের অপরপ্রান্তে নুর উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছে। আশিয়ান কৌতূহলী চোখে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। আশমিন শান্ত গলায় বলল, "দেখছি।"

"তার মানে আপনি জানেন না, ভাইয়া কোথায়?"

আশমিন দুই আঙুলের সাহায্যে কপালের এক পাশ মালিশ করতে করতে বলল, "আপাতত না।"

"মানে কী?" নুরের চিৎকারে আশমিনের মাথার যন্ত্রণা কয়েকগুণ বেড়ে গেল। নিজেকে শান্ত রেখে নরম গলায় বলল, "আস্তে কথা বলো, নুর। চ্যাঁচামেচি করার মতো কিছু হয়নি। আমি দেখছি ও কোথায় আছে।"

"আপনার কাছে ব্যাপারটা স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে মোটেও স্বাভাবিক নয়। আপনার জন্য হয়তো সে আপনার দলের সামান্য একজন কর্মী। তার কিছু হলেও আপনাদের খুব একটা ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না, কিন্তু আমরা আমাদের ভাই হারিয়ে ফেলব। একটা কথা পরিস্কার করে বলে দিই, আমার ভাইকে আপনাদের রাজনীতি থেকে দূরে রাখুন। সে ঢাকায় নিজের ক্যারিয়ার গড়তে গিয়েছে। তাকে এসবের মধ্যে জড়াবেন না। আশা করি আমার মায়ের সন্তানকে তার কোলে সহি-সালামত ফিরিয়ে দেবেন।"

নুর কল কেটে লম্বা শ্বাস টেনে নিল। ফুসফুস বাতাস শূন্য হয়ে গিয়েছিল প্রায়। বুকের ভেতর ঢিপঢিপ করছে। একটু কি বেশিই বলে ফেলেছে? দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে চোখ ঘুরাতেই দেখল আশিয়ান চোখ বড়ো বড়ো করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে কপালে ভাঁজ ফেলে বলল, "কী? এভাবে তাকিয়ে আছিস কেন?"

আশিয়ান নিজেকে সামলে নিল। সোজা হয়ে বসে গম্ভীর গলায় বলল, "গত শুক্রবার তুমি আমার থেকে তিনশ টাকা ধার নিয়েছ, এখনই ফেরত দাও।"

"এখন আমি টাকা পাব কোথায়? বলেছি তো আব্বুর থেকে নিয়ে পরে দিয়ে দেবো।"

"সেই সুযোগ পেলে তো! আজকের পর তুমি আর বেঁচে থাকবে কি না সেটাই তো সন্দেহ। আমার মন বলছে, তুমি এই পৃথিবীতে আর কয়েক ঘণ্টার মেহমান মাত্র। কিছুক্ষণ পরই আশমিন ভাইয়া এসে তোমাকে তুলে এক আছাড় মারবে। না, আছাড় মারবে না, গুলি করবে। তাদের বাড়ির বড়ো আমগাছের সাথে ফাঁসিও দিতে পারে। আচ্ছা, তোমাকে কীভাবে মারবে, বলো তো? কোন অপশনটা ভালো? তুমি যেভাবে কথা বলেছ! আল্লাহ! সে তো তোমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে! এই এলাকার সবাই জানে, আশমিন ভাইয়া তার সাথে উঁচু গলায় কথা বলা পছন্দ করে না। গতবার বিরোধী দলের এক পাতি নেতা তার সাথে উঁচু গলায় কথা বলেছিল, সবার সামনে তার গাল লাল করে দিয়েছে আশমিন ভাই। লোকটা এখন এক কানে কম শোনে। আর তুমি তো তাকে এতগুলো কথা শুনিয়ে দিলে! মরার জন্য প্রস্তুত হও, তেহজিব নুর শিকদার।"

নুর পায়ের থেকে স্যান্ডেল খুলে ছুড়ে মারল আশিয়ানের দিকে। চ্যাঁচিয়ে বলল, "আমার রুম থেকে এক্ষুনি বের হ, শয়তান! নাহলে জুতিয়ে চাপা ভেঙে দেবো।"

আশিয়ান স্যান্ডেলটা খপ করে ধরে ফেলল। আলাদিনের জিনের মতো হো-হো করে হেসে বলল, "আমি মাকে গিয়ে বলব, তুমি আবারও ঘরে স্যান্ডেল পরে ঘুরছ। আচ্ছা থাক, এমনিতেই তুমি আর কয়েক মুহূর্তের অতিথি। তোমার শেষ ইচ্ছা কী, বলে ফেলো?"

নুর তেড়ে যেতেই আশিয়ান দৌড়ে পালাল। নুর বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। আশমিনকে সে ভয় করে না। তবে আশমিন নামটা তার বুকে কাঁপন সৃষ্টি করে। তার সামনে গেলে আপনাআপনি হাত-পা কাঁপতে থাকে। মুখ হয়ে উঠে আরক্ত। শুভ্রতায় মোড়ানো সুদর্শন পুরুষটির শান্ত দৃষ্টি তাকে এলোমেলো করে দেয়। সেই পুরুষটিকে নিয়ে ভাবতে চায় না সে। রাজনীতি পছন্দ নয় তার, কিন্তু বেহায়া শরীর–মন সায় দিলে তো! তাকে দেখলেই যেন সব বিদ্রহ করে বসে।



আশমিন আগের মতোই থম মেরে বসে আছে। নূরের ধারালো বাক্যে সে হকচকিয়ে গেছে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে মাথা ব্যথাটাও বাড়ছে খুব। ডায়াল লিস্টে আঙুল চালিয়ে সানভিকে কল করল সে। কয়েকবার রিং হতেই তড়িঘড়ি করে ফোন তুলল সে, "হ্যালো, স্যার।"

"অমি কোথায়? কোন খবর জানো, সান?"

সানভি কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে বলল, "বাসায় আছে হয়তো, স্যার। পরশু রাতে বলল জ্বর এসেছে। তাই দুদিন বের হতে পারেনি। তাকে কি কোনো প্রয়োজন, স্যার?"

আশমিন কপালে আঙুল চালাতে চালাতে দেয়ালঘড়ির দিকে তাকাল। সময়ের কাঁটা একটার ঘর পার হয়েছে। সে শান্ত গলায় বলল, "না, কোনো প্রয়োজন নেই। দুই ঘণ্টার মধ্যে আমার বাসায় হাজির হবে। দরকার আছে।"

"ঠিক আছে, স্যার।"

আশমিন কল কেটে সোজা ওয়াশরুমে চলে গেল। আপাতত একটা লম্বা শাওয়ার নেওয়া দরকার।

নিজেকে সাদা পাঞ্জাবিতে মুড়িয়ে দ্রুত পায়ে নিচে নামল আশমিন। ঘড়িতে বিকেল চারটার কাঁটা পার হয়েছে। অফিসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফাইল দেখতে গিয়ে অনেকটা দেরি হয়ে গেল। চোখের চশমা ঠেলে উপরে তুলে সাবধানী চোখে মাকে খুঁজল সে। আশমিন নিচে নামতেই তার মা মিসেস কামিনী চৌধুরী হাসি মুখে এগিয়ে এলেন। আশমিন তাঁর হাত ধরে গিয়ে সোফায় বসল। ছেলে অন্তঃপ্রাণ কামিনী চৌধুরী গভীর মমতা নিয়ে তাকিয়ে রইলেন ছেলের দিকে। আশমিন মোবাইলে চোখ রেখেই আলতো হাসল। মায়ের এই ভালোবাসায় সে অভ্যস্ত। কামিনী চৌধুরী পরম মমতায় ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "কফি দেবো, আব্বু? মাথা ব্যথাটা কি একটু কমেছে?"

"না, আম্মু। একটু বের হচ্ছি। মুন্সিগঞ্জের দিকে যাব একটু।"

কামিনী চৌধুরী উদ্‌বিগ্ন হলেন। অস্থির গলায় বললেন, "ওদিকে কেন যাবে? আমাকে তো আগে কিছু জানালে না। তোমার আব্বু কি তোমার সাথে যাবে? সেও তো আমাকে কিছু বলল না!"

আশমিন তার মায়ের হাত ধরে শান্ত গলায় বলল, "এত টেনশন করার মতো কিছু হয়নি, আম্মু। শান্ত হও। আমি একাই যাচ্ছি। কাজ শেষ হলে চলে আসব। চিন্তা করো না।"

"চিন্তা করব না মানে? আর কে যাচ্ছে তোমার সাথে? চারিদিকে আমাদের শত্রুর কি অভাব আছে, আশমিন? এতটা খামখেয়ালি তুমি কীভাবে করতে পারো? তোমার বাবা জানে? দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি তাঁকে আসতে বলছি।"

উত্তেজনায় অস্থির কামিনী চৌধুরীকে থামাতে আশমিন হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। ছেলের নিরাপত্তায় এক বিন্দু ছাড় দিতেও রাজি নন তিনি। আশমিন দুহাতে মাকে আগলে নিল। ছেলের আলিঙ্গনে কিছুটা শান্ত হলেন তিনি। আশমিন তাকে আশ্বস্ত গলায় বলল, "এতটা হাইপার হয়ো না, আম্মু। আমার সাথে সান আর আলি যাবে। দলের ছেলেরা যাবে। আর বাহাদুর তো আছেই। তাছাড়া গ্রামের জমিজমা নিয়েও কিছু কাজ আছে। তাই যেতেই হবে। আব্বু আর কয় দিক সামলাবে, বলো তো? বয়স হচ্ছে তো তাঁর। আমাকেই তো দেখতে হবে সব।"

কামিনী চৌধুরী আঁকড়ে ধরে রাখেন ছেলেকে। আর একটা মাত্র সাত রাজার ধন। কামিনী চৌধুরীর বিয়ের পনেরো বছর পর জন্ম আশমিনের। ডাক্তাররা একপ্রকার আশা ছেড়েই দিয়েছিল। কামিনী চৌধুরী রাত-দিন এক করে কান্নাকাটি করে আল্লাহর কাছে একটা সন্তান ভিক্ষা চেয়েছেন। অবশেষে আল্লাহ সৌভাগ্যের দরজা খুলে দিয়েছেন। তার ঘর আলো করে এসেছে ছেলে। আমজাদ চৌধুরী খুশিতে কয়েক হাজার মানুষকে দাওয়াত করে খাইয়েছিলেন। জনপ্রতিনিধি হওয়ার দরুন চারিদিকে অনেক শত্রুও কামিয়েছেন তিনি। যার শিকার মাঝে মাঝে আশমিন হয়ে যায়। কিছুদিন আগেও গুলি লেগে মারাত্মক আহত হয়েছিল সে। তাই কামিনী চৌধুরী ছেলেকে চোখের আড়াল করতে চায় না। আশমিন মায়ের ভয় বুঝতে পেরে মুচকি হাসে। মায়ের মাথায় চুমু খেয়ে নরম স্বরে বলল, "আমি নিজের খেয়াল রাখব, আম্মু। কালকের মধ্যেই ফিরে আসব। তুমি চিন্তা কোরো না। তোমার ছেলে বড়ো হয়ে গেছে। তাকেও তো বাবার দায়িত্বের বোঝা হালকা করতে হবে।"

কামিনী চৌধুরী মাথা দুলালেন। ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই বাড়ির সবচেয়ে অস্থির সদস্য ফুলি দৌড়ে এলো। তাল সামলাতে না পেরে সোফার সাথে হোঁচট খেয়ে পায়ের চামড়া তুলে ফেলল সে। কামিনী চৌধুরী আর আশমিন সবটা দেখেও কিছু বলল না। তারা এসব দেখে দেখে অভ্যস্ত। ফুলি পায়ের আঘাতে মালিশ করতে করতে অস্থির গলায় বলল, "ভাইজান, আলি ভাই আর সানসিল্ক ভাই আইছে। হেরা সামনের রুমে আছে। আপনেরে যাইতে কয়।"

"এই, তুই কি মানুষ হবি না, ফুলি? এভাবে কেউ দৌড়ে আসে? আমি তো ভেবেছিলাম বাড়িতে ডাকাত এসেছে। এখন পেলি তো ব্যথা?"

কামিনী চৌধুরীর ধমক শুনে ফুলি বোকার মতো হাসল। আশমিন উঠে গেল। ফুলির মাথায় হাত বুলিয়ে পকেট থেকে বের করে তার হাতে দশ টাকা ধরিয়ে দিলো। ফুলির পাঁচ বছর বয়স থেকেই আশমিন তাকে এভাবে দশ টাকা করে দিয়ে আসছে। দিনে দশবার দেখা হলে দশবারই আশমিন তাকে দশ টাকার নোট দেবে। আশমিনের দেওয়া টাকা সে মাটির ব্যাংকে জমিয়ে রাখে। এভাবে অনেকগুলো টাকার ব্যাংক জমা হয়েছে তার রুমে। একটাও এখনো ভাঙেনি সে। ফুলির মা চৌধুরী-বাড়ির সবচেয়ে পুরোনো গৃহকর্মী ছিলেন। ফুলির আট বছর বয়সে তিনি পরলোকে গমন করেন। ফুলি বাড়িতে কাজ করলেও কেউ কাজের লোকের মতো দেখে না তাকে।

আশমিন তার পাশে দাঁড়ানো কামিনী চৌধুরীকে এক পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে তাঁর মাথায় চুমু খেয়ে নরম গলায় বলল, "আমি আসছি, আম্মু। আব্বুকে বলো আমি কালকের মধ্যেই ফিরে আসব। বাকিটা আমি তাঁর সাথে কথা বলে নেব।"

কামিনী চৌধুরী ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। আশমিন মায়ের সাথে কথা শেষ করে দ্রুত পায়ে সামনের বৈঠকখানায় চলে গেল। আলি আর সানভি চিন্তিত মুখে কিছু একটা নিয়ে আলোচনা করছে। আশমিনকে দেখে তাদের আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটল। আশমিন গম্ভীর মুখে এসে বসল তাদের সামনে। সানভি কিছু না বললেও আলি কিছুক্ষণ কপাল কুঁচকে তাকিয়ে রইল প্রিয় বন্ধুসম ভাইয়ের দিকে।

"মুখটা অমন চিতল মাছের মতো চ্যাপটা করে রাখছিস কেন? দেখে মনে হচ্ছে কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছিস। বাথরুম ঠিকঠাক হচ্ছে তো, মামা?"

শেষের কথাটা খুব চিন্তিত মুখে বলল সে। সানভি হাসতে গিয়েও নিজের হাসিটুকু গিলে ফেলল। এই মুহূর্তে আশমিন তার দিকেই তাকিয়ে আছে। স্যারের মন-মেজাজ খুব একটা সুবিধার মনে হচ্ছে না তার। আশমিনের এই

দৃষ্টির মানে বোঝে সে। তাই কিছুটা করুণ চোখে আলির দিকে তাকিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। আলির অবশ্য সেদিকে তেমন কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে আশমিনের কোষ্ঠকাঠিন্য নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছে। সানভি চলে যেতেই আশমিন আলির মাথায় সজোড়ে এক চড় বসাল। আলি আর্তনাদ করে বলল, "আরে, মারছিস কেন?"

"কার সামনে কী বলতে হয়, সেই জ্ঞানটা এই জীবনে হবে না তোর? ছোটোদের সামনে এভাবে হেনস্তা না করলেই নয়?"

"আচ্ছা আর করব না।"

চোখমুখ কুঁচকে আলি আঘাতের জায়গায় মালিশ করতে লাগল। আশমিন খুব একটা পাত্তা দিলো না। থমথমে গলায় বলল, "মুন্সিগঞ্জ যাব। অমিকে পেয়েছিস?"

"না, ছেলেটা তো বাসায় নেই। কোথাও ট্যুরে গেছে হয়তো। খোঁজ লাগিয়েছি। দেখি, পাওয়া যায় কিনা?"

"পাওয়া যায় কি না বলে কোনো কথা নেই, আলি। আমি ওকে আমার চোখের সামনে চাই।"

আলি সন্দিহান চোখে তাকাল। আশমিনের গম্ভীর ভঙ্গি দেখে থতমত খেয়ে বলল, "আরে কী হয়েছে, বলবি তো? হুট করেই অমির খোঁজ করছিস কেন?"

আশমিন কিছু বলল না। চুপচাপ ফোনের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা করতে লাগল। আলি চোখ ছোটো ছোটো করে তাকিয়ে বলল, "অমি কি কিছু করেছে? আমাদের সাথে বেইমানি করেনি তো?"

আলির কথা শেষ হওয়ার আগেই সানভি দ্রুত পায়ে সেখানে উপস্থিত হলো।

"স্যার, অমির খোঁজ পাওয়া গেছে। তার এক বন্ধুর বোনের বিয়ে উপলক্ষ্যে বন্ধুর বাড়ি গাজীপুর গিয়েছে। সেখানেই আছে। আমি লোক পাঠিয়েছি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওকে নিয়ে চলে আসবে।"

আশমিন ছোটো করে বলল, "হুম।"

আলি চরম বিরক্ত চোখে তাকিয়ে আছে আশমিনের দিকে। সানভি আবহাওয়া বুঝতে পেরে কেটে পড়ল। আলি গলায় তেজ এনে বলল, "কী হয়েছে এমনি এমনি বলবি? নাকি কোলে নিয়ে আদর করে জিজ্ঞেস করতে হবে?"

"কিছু হয়নি। মাথাব্যথা করছে।"

"মাথাব্যথা তো আগেও করেছে। তখন তো এমন অভিমানী প্রেমিকার মতো মুখ ফুলিয়ে বসে থাকতে দেখিনি। আজ কী হলো?"

আশমিন কিছুটা ইতস্তত গলায় বলল, "নুর কল করেছিল।"

আলি ভূত দেখার মতো চমকে উঠে বলল, "অমির বোন নুর?"

আশমিন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "হুম।"

"কী বলল?"

আশমিন শুধু অমির ব্যাপারটা বলল। আলি দুষ্ট চোখে তাকিয়ে মিটমিট করে হেসে বলল, "মন কি আনচান আনচান করেনি, মামা? তোমার যে অশ্লীল মন! দেখা গেল ফোনের মধ্যেই বখাটেদের মতো ইভটিজিং করে বসছিস। জনগণ কিন্তু এসব মেনে নেবে না, মামা।"

"পিঠে কি আরেকটা দিতে হবে?"

আলি দাঁড়িয়ে গেল। পরনের শার্ট টানতে টানতে বিদ্রোহী গলায় বলল, "তুমি আমাকে ঘুসি দিয়ে মেরে ফেললেও আমি এটাই বলব, তুমি একটা মেয়ের দিকে লালসার দৃষ্টিতে তাকাও। তাকে দেখলে তোমার চোখ চরিত্রহীন হয়ে যায়। আমি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দিচ্ছি, আশমিন জায়িন চৌধুরী একজন নষ্ট প্রেমিক।"

কথা বলতে বলতে আলি নিজের জুতা খুলে দুহাতে নিয়েছে। আশমিনের বাঁকা দৃষ্টি দেখে জুতা জোড়া শক্ত করে ধরল সে। আশমিন সোজা হয়ে দাঁড়াতেই সে জুতা হাতে এক দৌড়ে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। আশমিন দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

আলি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বাগানে সানভির সামনে দাঁড়াল। সানভি বিরস মুখে বলল, "কোনো একদিন আপনি স্যারের হাতে খুন হবেন নিশ্চিত।"

আলি পায়ে জুতা পরতে পরতে বলল, "তাহলে আমার চল্লিশায় বিরিয়ানির আয়োজন কোরো, সান।"

নিজের কথা শেষ করে আলি পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখী মানুষের মতো মুখ ফুলিয়ে শ্বাস নিল। সানভি দুঃখী দুঃখী চোখে তাকিয়ে রইল আলির দিকে। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা বিশালদেহী দেহরক্ষী বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে আলি কষ্ট পাওয়ার ভান করে বলল, "তুমি দুই প্লেট বেশি খেয়ো, বাহাদুর। তোমার তো বউ নেই। থাকলে তার জন্যও নিয়ে যেতে বলতাম।"

বাহাদুর নিজের জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে। আশমিন বুকে হাত গুঁজে বাহাদুরের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। আলি সেদিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসল। আশমিন আলির কাছে গিয়ে এক হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে গম্ভীর গলায়, "চিন্তা করিস না, তোর চল্লিশায় আমি পুরো শহরবাসীকে খাওয়াব। আর তা খুব শীঘ্রই হতে যাচ্ছে।"

"আরে ধুর! আমি আরও অনেক বছর বেঁচে থাকব। কারণ আমার নিরাপত্তা স্বয়ং আমার ভাই দেয়।"

আলি নিজেও আশমিনের গলা জাপটে ধরল। দুই ভাইয়ের গলায় গলায় ভাব দেখে সানভির ইচ্ছে হলো নিজেই নিজের নাক চেপে মরে যেতে। কিছুক্ষণ আগে দুঃখ পাওয়ার জন্য নিজেকে ভর্ৎসনা দিতেও ভুলল না সে। আশমিন সানভির দিকে তাকিয়ে বলল, "ওরা আর কতদূর, সান?"

"আরও দুই ঘণ্টা লাগবে, স্যার।"

"ঠিক আছে। তুমি গাড়ি বের করতে বলো। শপিংমলে যাব।"

আলি ভ্রু কুচকে বলল, "এখন আবার এসব কেন?"

"লুবানার জন্য কিছু কেনাকাটা করতে হবে।"

আশমিনের এ কথার জবাবে দ্বিতীয় কোনো কথা বলল না আলি। শুধু মিনমিনে গলায় বলল, "আমি শপিংয়ে যাব না। আংকেলের সাথে আমার কাজ আছে।"

আশমিন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "আমি চাই না আজ তুই এখানে থাকিস। তাই তুই আমার সাথেই যাবি। মৌরিও আসছে আমাদের সাথে।"

"আবার ও কেন? এই মহিলা পার্টি মানেই ঝামেলা। নির্ঘাত কোনো বিপদে ফেলবে। এই মহিলার ভেতরে ঘসেটি বেগমের আত্মা বাস করে, আমি নিশ্চিত।"

আশমিনের সামনে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। আশমিন আলিকে টেনে গাড়িতে তুলে নিজেও উঠে বসল। আলি চোখমুখ কুঁচকে বিরক্ত মুখে বসে রইল। আশমিন আলির দিকে না তাকিয়ে ওর কাঁধে হাত রেখে শান্ত গলায় বলল, "আজ আব্বুর সাথে পরিবার সমেত মিজু আংকেল আসছেন।"

মুহূর্তেই আলির মুখভঙ্গি বদলে গেল। শান্ত দৃষ্টিতে তাকাল আশমিনের দিকে। আশমিন আলির চোখে চোখ রাখতে পারল না। তাই জানালার বাইরে দৃষ্টি রেখে বলল, "আমি চাই না তুই ওই লোকের মুখোমুখি হোস।"

আলি চোয়াল শক্ত করে চুপ করে বসে রইল। সানভি বুঝতে পেরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মিজু সিদ্দিক হলেন আলির জন্মদাতা পিতা। আলির বয়স

যখন দুবছর তখন তাঁর অফিসের সুন্দরী অ্যাসিস্ট্যান্টের প্রেমে পড়েন তিনি। আলির মা মিসেস আয়েশা খুব ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন। স্বামীর এ অনৈতিক পাপ তাকে মুষড়ে দিয়েছিল। মনে পাথর রেখে তিনি মিজু সিদ্দিককে বলেছিলেন, ওই মেয়েকে বিয়ে করে আনতে, কিন্তু তার প্রেমিকা সতিনের সাথে সংসার করতে রাজি নয়। তাই ছেলে আর স্ত্রীর কথা না ভেবেই আলির মাকে ডিভোর্স দিয়ে দেন তিনি। স্বামীর এই কদর্যরূপ দেখে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন মিসেস আয়েশা। ছেলেকে নিয়ে বাবার বাড়িতে ওঠেন। আলি তখন কিছু না বুঝলেও এখন মনেপ্রাণে এই নিকৃষ্ট লোকটাকে ঘৃণা করে। তাকে দেখলেই অভিব্যক্তি পালটে যায় তার। বছর খানেক আগে আলির মা মারা গেছেন। মরার আগ পর্যন্ত কী নিদারুণ কষ্টেই না ছিলেন তিনি! যে নারী প্রিয়তম স্বামী দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন, একমাত্র তিনিই জানেন, পৃথিবীতে শ্বাস নেওয়া কত কষ্টের! বুকের ভেতর লুকিয়ে থাকা হৃৎপিণ্ডটা সারাক্ষণ সেই পাষণ্ড মানুষটাকে মনে করেই ফালাফালা হতে থাকে। কেন যে তার মা মরার আগ পর্যন্ত এই কুৎসিত মানুষটাকেই ভালোবাসেছেন, তা আজও বুঝতে পারে না সে। সেই কদাকার লোক তো তার অবৈধ প্রেমিকাকে বিয়ে করে দুই বাচ্চার বাপও হয়ে গেছেন। তাকে আর তার মাকে তো দ্বিতীয়বার মনেও করেননি। আসলে চরিত্রহীন পুরুষের সাথে চরিত্রহীন নারীই মানায়। যে মহিলা বিবাহিত পুরুষের সাথে সম্পর্কে জড়ায় সে কোনো চরিত্রবান নারী হতে পারে না। তার মা আয়েশার মতো নারীর জীবনসঙ্গী হওয়ার ভাগ্য হলেও তার সাথে জীবন কাটানোর সৌভাগ্য এই দুশ্চরিত্র লোকের হয়নি। তার জন্য ওই নারীই পারফেক্ট। সম্পর্কে মিজু সিদ্দিক কামিনী চৌধুরীর মামাতো ভাই। তাই চৌধুরী-বাড়িতে আনাগোনা আছে তার।

আনমনে বাইরে তাকিয়ে থাকা আলির দিকে তাকাল আশমিন। আলির ফরসা মুখটা হালকা লাল হয়ে আছে। আশমিন আর ঘাঁটাল না তাকে। প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত কিছু ব্যথা থাকে, যা তার একান্ত নিজের। তাই তাকে সেই ব্যথা একাই ভোগ করতে হয়। সেখানে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে তার ব্যক্তিগত স্পেসে ঢুকে পড়ার কোনো মানে হয় না।

আশমিনের গাড়িটা বসুন্ধরা সিটির সামনে থামতেই আলি দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে গেল। আশমিনের গাড়ির পিছনেই বাহাদুরের গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। আশমিনের ছায়া হচ্ছে বাহাদুর। আশমিন গাড়ি থেকে নামার আগেই বাহাদুর গাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গেল। সানভি ফোনে অমির খবর নিচ্ছে। আশমিন গাড়ি থেকে বের হতেই মৌরি তেড়ে এলো। তার

উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গিনী মুখটা রোদের দাপটে লাল হয়ে গেছে। বাহাদুরকে টপকে আশমিনের সামনে গিয়ে চ্যাঁচিয়ে বলল, "কতক্ষণ এই রোদে দাঁড়িয়ে আছি সেই হিসেব কি রেখেছিস? সবার কি তোর বাপের মতো এসি লাগানো গাড়ি আছে যে, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরবে?"

"এটা আমার নিজের টাকায় কেনা গাড়ি।"

আশমিনের শান্ত গলায় আরও দ্বিগুণ রেগে গেল মৌরি, "আমাকে টাকার গরম দেখাস, এই মৌরিকে? তোর টাকার ধার ধারি আমি? নিজেকে কী ভাবিস তুই? মন্ত্রী মিনিস্টারের ছেলে?"

"ভাবার কিছু নেই। এটাই সত্যি।"

আলির ত্যাড়া জবাবে মৌরি তেড়ে গেল তার দিকে। আশমিন এক হাতে তাকে আটকে আশেপাশে চোখ বুলিয়ে বলল, "আশেপাশের মানুষ তাকিয়ে আছে। বাকি ঝগড়া রাস্তায় করিস। এখন যে কাজে এসেছি তা শেষ করি।"

মৌরি কিছুটা শান্ত হলো। ঘনঘন শ্বাস ফেলে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করে চোখে শাসাল আলিকে। আলি তা মোটেও পাত্তা দিলো না। আশমিন বাহাদুরকে ইশারা করে আলির দিকে খেয়াল রাখতে বলে মৌরিকে টেনে নিয়ে চলে গেল।

বেশ কয়েকটা দোকান ঘুরে আশমিন লুবানার জন্য ড্রেস কিনেছে। মৌরিও তাকে পছন্দ করতে সাহায্য করছে। বার কয়েক আশমিনের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেছে সে। আশমিন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল, "কিছু বলবি?"

হাঁসফাঁস করতে থাকা মৌরি সহসাই মুখ খুলল। কৌতূহলী গলায় জিজ্ঞেস করল, "ওই বান্দরের কি হইছে, দোস্ত? বেলুনের মতো মুখ ফুলায় রাখছে কেন? কেউ ছ্যাঁচানি দিছেনি?"

"ওর হারামি বাপ তার কচি বউ নিয়ে আমাদের বাসায় হাজির হয়েছে। তাই ও চটে আছে। বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে যাইস না। তাহলে কয়েক ঘা খেয়ে পরে আমাকে নালিশ করতে পারবি না।"

মৌরি আশমিনের হাত ধরে তার পাশ ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে ফিসফিস করে বলল, "ওই চামড়া ছিলা বেডিরে তোর কচি মাল কেমনে মনে হইল, ভাই? আমি বাজি ধইরা কইতে পারি, ওই মহিলার হাড্ডি সুদ্ধা পাইকা গেছে। বারো ঘাটের পানি খাওয়া মাল এইডা। বুঝছস?"

আশমিন তপ্ত শ্বাস ফেলল। এই মেয়ে যে এখন ওদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করবে তা সে ভালো করেই জানে।



হাত ভরতি শপিংব্যাগ নিয়ে ফিরে এলো আশমিন আর মৌরি। আলি গাড়ির সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাহাদুরের হাতে নিজের অবশিষ্ট ব্যাগগুলো দিয়ে মৌরি বলল, "আমি তাহলে যাই, দোস্ত। দেরি হলেই আব্বা চিল্লাচিল্লি করব।"

"যা, তোরে ধইরা রাখছে কে?"

আলির বাঁকা উত্তরে শুধু কটমট করে তাকাল মৌরি। মুখে কিছুই বলল না। আশমিন সানভিকে কল করতেই সে দ্রুত পায়ে সেখানে হাজির হলো। আশমিন কান থেকে ফোন নামিয়ে মৌরিকে বলল, "তুই আমাদের সাথে মুন্সিগঞ্জ যাচ্ছিস।"

মৌরি আঁতকে উঠে বলল, "মাথা খারাপ নাকি? আমার কাল অফিস আছে। অফিস কামাই দিলে বস খুব রাগারাগি করবে। আস্ত বজ্জাত একটা! আমি যেতে পারব না, দোস্ত।"

আশমিন চোখ ছোটো ছোটো করে তাকিয়ে আছে মৌরির দিকে। আলি নিজের কপাল চাপড়ে হতাশার নিঃশ্বাস ফেলল। সানভি বোকা বোকা চোখে তাকিয়ে বলল, "আপনি তো স্যারের অফিসেই চাকরি করেন, ম্যাডাম।"

মৌরি বোকার মতো হাসল। আশমিন গাড়িতে উঠে বসেছে। আলি ড্রাইভিং সিটে বসে ড্রাইভারকে বলল, "আপনি চলে যান। আমরা নিজেরাই ড্রাইভ করে যাব।"

ড্রাইভার চলে গেল। মৌরি এসে আশমিনের পাশে বসে বলল, "ভাই, ড্রেস তো চেইঞ্জ করতে দিতি! এমন ফকিন্নির মতো কেউ বেড়াতে যায়? আমার কি কোনো মান-সম্মান নেই?"

"না।"

আশমিনের জবাবে মৌরি প্রায় লাফিয়ে উঠল। সানভি আলির পাশে উঠে বসেছে। আলি শব্দ করে হাসছে। মৌরি তেড়ে গিয়ে পিছন থেকে কয়েক ঘা লাগিয়ে দিলো তাকে। গাড়ি স্টার্ট দিতেই আশমিন বলল, "অমিকে নিয়ে পৌঁছে গেছে, সান?"

"জি, স্যার। গার্ড গাড়ি নিয়ে এগিয়ে গেছে। মুক্তারপুর ব্রিজে ওঠার আগে আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছি।"

"ঠিক আছে।"

"অমির আবার কী হইছে?"

মৌরির প্রশ্নে মিটমিট করে হাসছে আলি। আশমিন চোখ রাঙাল। মৌরি দুজনের অভিব্যক্তি খেয়াল করে সন্দিহান গলায় বলল, "কী কাহিনি বল তো, মামা। চারিদিকে রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি। ঘটনা কী?"

"ঘটনা কিছু না। আজ সকালে অমির ছোটো বোন আমাদের আশু বেবিকে কল করেছিল। ভাই নিখোঁজের জন্য রীতিমতো ধমকেছে তাকে।"

মৌরি হতভম্ব চোখে তাকাল আশমিনের দিকে। আশমিন নির্বিকার হয়ে বসে আছে। মৌরি অবিশ্বাস্য গলায় বলল, "আমি বিশ্বাস করি না। আশমিন, তুই বল তো ঘটনা কী?"

আশমিন নীরবতা পালন করল। এদের সামনে মুখ খোলা মানে নিজের ইজ্জত গুন্ডাদের হাতে তুলে দিয়ে কলঙ্কিত হওয়া। আশমিনের নীরবতায় আলি আরও কিছু বলার প্রস্তুতি নিতেই আশমিন ঠান্ডা গলায় বলল, "আরেকটা বেশি কথা বললে তোকে চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দেবো।"

সানভি শুকনো ঢোক গিলল। এদের দুষ্টামির ফল হিসেবে না তাকেই নিজের কচি জীবনটা দিয়ে দিতে হয়! আশমিনের ঠান্ডা ধমকে দমল না আলি। মুখে কিছু না বললেও মিটমিটিয়ে হাসতে লাগল। মৌরি আশমিনের চটে যাওয়া মেজাজ দেখে বুঝল কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। বন্ধুর মন খারাপের কারণ জানতেই তার দিকে হালকা চেপে বসল। ফিসফিসে গলায় বলল, "দোস্ত, মাইয়া কি তোরে রিজেক্ট করছে? উলটা-পালটা কিছু করস নাই তো?"

আশমিন ভ্রু কুঁচকে বলল, "উলটা-পালটা মানে?"

মৌরি খুকখুক করে গলা পরিস্কার করল। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলল, "এই ধর, ফোনের মধ্যেই চুমু-টুমু খেতে চাস নাই তো?"

"ফোনে চুমু খেয়ে মজা নেই। চুমু খেতে হয় সামনাসামনি। ঠোঁটের সাথে ঠোঁটের সংঘর্ষ না হলে তাকে চুমু বলা যায় না। তাই ফোনে চুমু খাইনি।"

মৌরি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বুকে হাত দিয়ে মুখ গোল করে নিঃশ্বাস ছাড়তেই আশমিনের কথায় নিঃশ্বাস টেনে নিতে ভুলে গেল। চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, "কী বললি তুই?"

"সরাসরি চুমু খেতে যাচ্ছি।"

মৌরি ছিটকে সরে এলো। অবিশ্বাস্য চোখে তাকিয়ে রইল আশমিনের দিকে। আশমিন গম্ভীর মুখে বাইরে তাকিয়ে আছে। আলি কিছুটা বিরক্ত গলায় বলল, "কী ফুসুরফুসুর করছিস তখন থেকে? আমাদেরও একটু বল।"

মৌরি স্তব্ধ মুখে দুই দিকে মাথা নাড়ল। আশমিন চোখ ঘুরিয়ে আলির দিকে তাকাল। সানভি চুপচাপ বসে আছে। সে আপাতত দেহ রেখে পরলোক গমন করতে চাইছে। এদের কথায় কান দেওয়া মানে নিজের পায়ে কুড়াল মারা।

"বাচ্চা ছেলেদের এসব শুনতে নেই। চুপচাপ গাড়ি চালা।"

আলি সামনে দৃষ্টি রেখে হালকা হাসল। আশমিনের মেজাজ ভালো না, সে আন্দাজ করতে পারছে। তার মনও খুব একটা ভালো নেই। ওদের সাথে কথা বলে বুকের জমানো পাথরটা হালকা করতে চাইছে সে। চোখের সামনে মায়ের মুখটা বারবার ভেসে উঠছে। পুরো পৃথিবীতে তার একজন স্বার্থপর বাবা আছেন। যিনি নিজেকে মানুষের কাতারে রাখার প্রয়োজন মনে করেননি। নিজের সন্তানকে তিনি খুব সহজেই ছুড়ে ফেলতে পেরেছেন। জন্ম দিলেই কি বাবা হওয়া যায়? বাবা বড়ো পবিত্র একটা সম্বোধন। তার কাছে মিজু সিদ্দিক মানেই একরাশ ঘৃণা। যে ঘৃণার কোনো কমতি নেই। দিন দিন শুধু চক্রাকারে বেড়েই চলেছে।

আশমিনের ফোনের রিংটোনে ধ্যান ভাঙল আলির। আশমিন শান্ত চোখে স্ক্রিনে তাকিয়ে আছে। ফোনের শব্দে মৌরি বিরক্ত গলায় বলল, "ওই, ফোন ধরস না ক্যা? কানের জন্ডিস বানাবি নাকি?"

ফোন কেটে যাওয়ার কয়েক সেকেন্ড আগে রিসিভ করল সে। ফোনের ওপাশে আমজাদ চৌধুরী রাগী গলায় ছেলেকে শাসাচ্ছেন, "কোন সাহসে তুমি এই মুহূর্তে গ্রামে যাচ্ছ? একবারও বলেছ আমাকে? আমাদের শত্রুর অভাব নেই, আশমিন। ওরা সবসময় ওত পেতে থাকে। সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। এভাবে হুটহাট বেরিয়ে পড়া কতটা বিপদজনক তা কি বলে বলে বোঝাতে হবে তোমাকে? দিনদিন তুমি খুব অবাধ্য হয়ে যাচ্ছ, আশমিন। যেখানেই থাকো, বাসায় এই মুহূর্তে ফিরে আসো। আমি অপেক্ষা করছি।"

"সম্ভব নয়, আব্বু। আমার যাওয়াটা জরুরি।"

"তর্ক করবে না। এই মুহূর্তে তুমি ব্যাক করবে। এটাই আমার শেষ কথা।"

"এভাবে অল্পতেই কথা শেষ করা ভালো, আব্বু। শুনে ভালো লাগে। আমরা মুক্তারপুরের কাছাকাছি চলে এসেছি। এখন রাখছি। কাল দেখা হচ্ছে। আল্লাহ হাফেজ।"

আশমিন কল কেটে দিলো। আমজাদ চৌধুরীর প্রেশার হাই হয়ে গেছে। বাসায় পায়চারি করতে করতে আবারো কল করলেন আশমিনের নাম্বারে। আশমিন এবারও কেটে যাওয়ার আগ মুহূর্তে কল রিসিভ করল। আমজাদ চৌধুরী কিছুটা নরম হলেন। নমনীয় গলায় বললেন, "তুমি যাবে ভালো কথা, গার্ড কেন নিয়ে যাওনি? এভাবে আমাকে টেনশন না দিলে হচ্ছে না? যাওয়াটা কি খুব জরুরি ছিল?"

"খুব জরুরি ছিল, আব্বু।"

"কী এমন জরুরি কাজ, আমিও একটু শুনি?"

"আমার বলতে লজ্জা লাগছে।"

গাড়িতে উপস্থিত তিনজনেরই একসাথে বিষম লেগে গেল। আলি আচমকা ব্রেক করায় কেউ নিজেকে সামলাতে পারল না। সানভি ধাক্কা খেয়ে হাতে ব্যথা পেল। মৌরির কপাল সামনের সিটের সাথে ধাক্কা খাওয়া থেকে এক হাতে বাঁচাল আশমিন। তাকে টেনে সোজা করে বসিয়ে দিলো। বিরাক্ত হয়ে আলিকে কিছু বলতে নিতেই দেখল সবাই তার দিকে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে আছে। আশমিন ভ্রু কুঁচকে ফেলল। এভাবে তাকানোর কী আছে? সে আচমকা ছেলে থেকে মেয়ে হয়ে গেছে নাকি? আশ্চর্য!

আমজাদ চৌধুরী ফোন কানে নিয়ে চুপ করে আছেন। ছেলের এই সহজ-সরল কথাটা তাঁর হজম হয়নি, তা তাঁর চেহারায় স্পষ্ট। তিনি গলার স্বর গম্ভীর করে বললেন, "এমন কথা বলে তুমি আমার হার্টফেল করানোর চেষ্টা করো না, আশমিন। আমাদের পুরো বংশের একমাত্র নির্লজ্জ ছেলে তুমি। শুধু শুধু ঢং না করে আসল কথাটা বলে ফেলো।"

আশমিন আড়চোখে সবার দিকে তাকাল। আলি আর মৌরি বুকে হাত গুঁজে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সানভি কী প্রতিক্রিয়া দেবে, সেই চিন্তায় ব্যস্ত। আশমিন গলা ঝেড়ে বলল, "আমি আমার বাবার মতো হয়েছি, আব্বু। অন্তত আমার পরিচিত সবাই এ কথাই বলে। তাহলে তুমি বলতে চাইছ, তুমি নির্লজ্জ?"

আমজাদ চৌধুরী চ্যাঁচিয়ে উঠলেন। হালকা গলায় ধমক দিয়ে বললেন, "একদম কথা ঘোরানোর চেষ্টা করবে না। আসল কথাটা বলো। কারও সাথে ঝামেলা করতে যাচ্ছ না তো?"

এ পর্যায়ে আশমিন দ্বিধান্বিত হলো। সকাল সকাল মনের ভেতর ঘাপটি মেরে বসে থাকা রমণী তার প্রেমের মৌচাকে খোঁচা দিয়ে গিয়েছে। তাই সে খ্যাপা মৌমাছির মতো তাকে কামড়ে দিতে যাচ্ছে। এটা বাবাকে বললে বাবা আবার তাকে অসভ্য, নির্লজ্জ বলে আখ্যায়িত করবেন।

আশমিন হালকা নিভল। গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলল, "প্রেম করতে যাচ্ছি, আব্বু। চাইলে তুমিও আসতে পারো। তবে একজন ভালো সন্তান হিসেবে আমি আম্মুকে সবটা বলে দেবো। এই বয়সে তোমার প্রেম করার শখ হয়েছে তা অবশ্য আমি এখনই ম্যাসেজ করে বলে দিচ্ছি। বাকিটা তুমি বুঝে নাও।"

আমজাদ চৌধুরী হতভম্ব হয়ে গেলেন। কয়েক সেকেন্ড বলার মতো কিছুই খুঁজে পেলেন না। আশমিনের ফোন কাটার কোনো তাড়া নেই। সে বাধ্য ছেলের মতো ফোন কানে চেপে বসে আছে। গাড়িতে বসে থাকা বাকি সদস্যদের পাংশুবর্ণ মুখের দিকে দুই আনার পাত্তাও দিলো না সে। আমজাদ চৌধুরী নিজের বিস্ময় কাটিয়ে আঙুল তুলে কাঁপা কাঁপা গলায় ছেলেকে শাসালেন, "একদম বেয়াদবি করবে না। অসভ্য হচ্ছ দিনদিন। স্কুলে এসব শেখো?"

আশমিন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "আমি স্কুল অনেক বছর আগে পার করে এসেছি, আব্বু।"

আমজাদ চৌধুরী নিজের গুলিয়ে ফেলা স্বভাবের জন্য বিরক্ত হলেন। মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করে বললেন, "তবুও তো মানুষ হলে না। বাবার সাথে কথা বলার কোনো আদব নেই। হতচ্ছাড়া ব্যবহার তোমার! আমি তোমাকে সাবধান করছি, আশমিন। আমার অবাধ্য হওয়ার চেষ্টা করবে না। যা বলছি শোন, গাড়ি ঘুরিয়ে চলে এসো। তোমার মিজু আংকেল এসেছে তার পরিবার সমেত। তোমার সাথে দেখা করতে চায়। তুমি এলে একসাথে ডিনার করব।"

"তোমার হিসেব মতো আমি বরাবরই তোমার অবাধ্য, আব্বু। তাই নিজেকে পরিবর্তন করার বৃথা চেষ্টা বাদ দিয়েছি। আর বাকি রইল মিজু আংকেলের কথা, সে বা অন্য কেউ আমার কাছে ম্যাটার করে না। কারণ তার একমাত্র পরিবার আমার সাথেই আছে। আর বাকি যারা আগাছার মতো আছে, তাদের তুমি সামলে নিয়ো। কারণ তারা তোমার গেস্ট।"

আশমিনের নরম অথচ দৃঢ় গলায় কিছুটা দমে গেলেন আমজাদ চৌধুরী। আশমিন ছোটোবেলা থেকেই মিজু সিদ্দিককে পছন্দ করে না সেই বিষয়ে অবগত তিনি। মিজুর দোষটাও কম কিছু নয়, কিন্তু রাজনীতির ময়দানে টিকে

থাকতে হলে মুচি থেকে মাস্তান সবার সাথেই সম্পর্ক রাখতে হয়। আশমিন কি তা জানে না? আবেগ দিয়ে তো আর জীবন চলে না। টিকে থাকার লড়াইয়ে আবেগ সবচেয়ে বড়ো বাধা। ছেলেকে নিয়ে তার চিন্তাভাবনা অনেক সুদূরপ্রসারী, কিন্তু ছেলের কর্মকাণ্ড দেখে তার আশার আলো নিভু নিভু প্রায়। বাবার বিরোধিতা করাই যেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য। বিরোধী দলের চেয়েও আশমিনকে তার বড়ো প্রতিপক্ষ মনে হয়।

"আমরা প্রায় চলে এসেছি, আব্বু। এখন রাখছি। কাল কথা হবে।"

আমজাদ চৌধুরীকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই কল কেটে দিলো আশমিন। আমজাদ চৌধুরী ফুঁসে উঠতে গিয়েও যেন নিভে গেলেন। আনমনা দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে কিছু একটা ভাবলেন। ছেলের প্রেম করার বিষয়টা খতিয়ে দেখতে হবে। যাকে-তাকে তো আর নিজের ছেলের বউ করে ঘরে তোলা যায় না। কামিনী চৌধুরীকে বিষয়টা হালকা জানিয়ে রাখার পরিকল্পনা করে ফেললেন তিনি। মহিলা মানুষ এই বিষয়গুলো একদম হজম করতে পারে না। ছেলে কোনো মেয়েকে নিয়ে ভেবেছে শুনলেই পাড়া মাথায় তুলবে। নাওয়াখাওয়া বন্ধ করে ছেলেকে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করে সেই রাক্ষসীর হাত থেকে বাঁচাতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে। অধর বাঁকিয়ে হাসলেন তিনি। মনে মনে নিজের কুবুদ্ধির প্রশংসা করে নিজের পিঠ চাপড়াতে ইচ্ছে হলো তাঁর।

"এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? মিজু ভাই ডাকছে আপনাকে।"

কামিনী চৌধুরীর কথায় ভাবনা থেকে বেরিয়ে এলেন আমজাদ চৌধুরী। ছেলের প্রেমের ব্যাপারটা কি ফাঁস করে দেবেন? আনমনে হাসলেন আমজাদ চৌধুরী। স্ত্রীর তেজি রূপের ব্যাপারে তিনি আগাগোড়া অবগত। মমতাময়ী নারীর পিছনে এক কঠিন হৃদয়ের লুকিয়ে থাকা মানুষটাকে আমজাদ চৌধুরীর চেয়ে ভালো আর কে চিনে?

আশমিনের কথা শেষে আলি আবার ড্রাইভিং-এ মন দিয়েছে। কারোর মুখে কোনো কথা নেই। মুক্তারপুর ব্রিজের ওঠার আগে টোল দেওয়ার জন্য গাড়ি দাঁড় করাল আলি। আশমিন মনোযোগ দিয়ে মোবাইল দেখছে। সানভি সবার দিকে চোখ বুলিয়ে ধীর গলায় বলল, "স্যার, একটা গাড়ি ফতুল্লা থেকে আমাদের ফলো করছে।"

আশমিন চোখ তুলে তাকাল। তার কপালে ভাঁজ পড়েছে। আলি টোলের টাকা দিয়ে নিজের হাতটা গাড়ির বাইরে রেখেছে। টোল আদায়কারী বাকি টাকা ফেরত দিতেই সে রিসিট নিয়ে সানভির দিকে তাকিয়ে বলল,

"অনেকক্ষণ আগেই দেখেছি, সান। আসতে দাও। এটা আমাদের এলাকা। প্রত্যেকের কলিজা বের করে ফুটবল খেলব। টেনশনের কিছু নেই।"

আতঙ্কে শুকিয়ে যাওয়া মুখ নিয়ে চ্যাঁচিয়ে উঠল মৌরি, "অসভ্যের দল! তোরা কি আমাকে মেরে ফেলার জন্য সাথে করে নিয়ে এসেছিস? আমার কিছু হলে আমি এই ব্রিজ থেকে লাফিয়ে নিজের জান দিয়ে দেবো বলে দিলাম!"

"তোর কিছু হলে ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দেওয়ার প্রয়োজন হবে না, পাগল মহিলা। তারা নিজ দায়িত্বে তোকে ফেলে দিয়ে যাবে।"

আলি রাগী গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলল মৌরিকে। মৌরির রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে আশমিন শান্ত গলায় বলল, "কিচ্ছু হবে না, আমি আছি তো।"

"সেটাই তো ভয়!"

আলির গাড়ি ব্রিজের মাঝবরাবর আসতেই সানভি চিন্তিত চোখে পিছনে থাকা বাহাদুরের গাড়িতে নজর দিলো। বাহাদুরের গাড়ি সমানতালে তাদের গাড়ি অনুসরণ করছে।

"অমির খবর নাও, সান। ওরা ঠিক আছে তো?"

"ওরা ঠিক আছে, স্যার। মুন্সিগঞ্জ পৌঁছে গেছে।"

"গাড়ি সরাসরি চৌধুরী-বাড়িতে নিয়ে যেতে বলো। যা-ই হয়ে যাক না কেন, রাস্তায় যেন কোনোভাবেই গাড়ি না থামায়।"

"ওকে, স্যার।"

সানভি কল করায় ব্যস্ত হয়ে গেল। আলি খুব সাবধানে গাড়িটা একটা গলির ভেতর ঢুকিয়ে দিলো। গাড়ি থামিয়ে বাহাদুরকে কল করে বলল, "ওদের ঘুরিয়ে এলাকায় নিয়ে যাও, বাহাদুর। আমরা আসছি।"

কথা শেষ করে ফোন কেটে আশমিনের দিকে তাকাল আলি। মৌরি বিড়বিড় করে দোয়া ইউনুস পড়ে যাচ্ছে। আলি সেদিকে চোখ ফিরিয়ে তপ্ত শ্বাস ফেলল।

"এমনে চাইয়া রইছস ক্যা? তগো লগে আইয়া আমার এত সাধের জানটা রাস্তায় লুটাইয়া দেওয়া লাগতাছে। ভালো মাইনসের মতো আমারে বাড়িতে দিয়া আয়, হারামির দল।"

আশমিন বিরক্ত গলায় বলল, "ভাষা ঠিক কর।"

"এর চেয়ে ভালো ভাষা বাইর হইতাছে না, দোস্ত। আমি কি আইজকা মারা যাইমু?"

আলি থমথমে গলায় বলল, "হুম, সেজন্যই তো তোকে এখানে সাথে করে নিয়ে এসেছি। আমরা মরব আর তুই পৃথিবীতে ফুর্তি করবি, তা তো হতে পারে না, তাই না?"

মৌরি নিজের কান্না আটকে বলল, "তোরা কী পাষাণ! এমন ফুলের মতো নিষ্পাপ একটা মেয়েকে মেরে ফেলতে তোদের কলিজা কাঁপবে না?"

"আমরা মারব না তো। মারবে ওরা।"

"আহ থাম তোরা। মৌরি, চিন্তা করিস না। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়িতে পৌঁছে যাব। ভয়ের কিছু নেই।"

মৌরি দুহাত উপরে তুলে বলল, "আল্লাহ, এবারের মতো তোমার পাপী বান্দাকে বাঁচিয়ে দাও। একবার বেঁচে ফিরলে এই দুই বান্দরের মুখ দেখব না কোনোদিন, সত্যি বলছি।"

আলি আর আশমিন আড়ালে হাসল। সানভির জান গলায় এসে আটকে আছে। সে এমন বিশ্রী মৃত্যু চায় না। আশমিনের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস আছে তার। সে যেহেতু এমন শান্তভাবে বসে আছে, সেহেতু সবকিছু তাদের কন্ট্রোলে আছে। কিন্তু অসভ্য কলিজাটা কিছুতেই সান্ত্বনা পাচ্ছে না।

অন্ধকার গলিতে চুপচাপ বসে আছে চারজন। মৌরি ভীতু হরিণীর মতো অন্ধকারে এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে।

"ওদিকে সব আমাদের কন্ট্রোলে আছে। গাড়ি বাড়ির দিকে নিচ্ছি।"

আলির কথায় সাথে সাথে চ্যাঁচিয়ে উঠল মৌরি, "কোনো দরকার নেই। রাতটা এখানে কাটিয়ে সকালে ঢাকায় ফিরে যাব।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে। তুই গাড়ি থেকে নেমে যা। রাতটা এখানে কাটিয়ে সকালে ঢাকায় ফিরে যাস।"

মৌরি অভিমানী গলায় আশমিনকে বলল, "দেখলি? দেখলি কী বলল?"

"ওর কথা কানে নিস না তো। বাসায় গিয়ে লম্বা একটা ঘুম দিবি। দেখবি মন একদম ভালো হয়ে গেছে।"

মৌরি আল্লাহর নাম জপতে জপতে চোখ বন্ধ করে ফেলল। এই চোখ পৌঁছানোর আগে আর খুলবে না সে। গুন্ডারা তার গলা কেটে ফেললেও সে চোখ খুলে দেখবে না।

গাড়ি চৌধুরী-বাড়ির মূল ফটকে পৌঁছাতেই সানভির শুকিয়ে যাওয়া কলিজায় প্রাণ ফিরে এলো। বুকে হাত রেখে দম টানতে গিয়ে খেয়াল করল বুকে চিনচিন ব্যথা করছে। গাড়ি থামামাত্রই মৌরি গাড়ি থেকে নেমে এক দৌড়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা লতিফা চৌধুরী হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আশমিনের বন্ধু হওয়ার সুবাদে মৌরিকে তিনি খুব ভালো করেই চেনেন। মেয়েটা এমন পাংশুবর্ণ মুখে দৌড়ে ভেতরে চলে গেল কেন? মনে মনে প্রশ্ন সাজালেন তিনি। আশমিন নামতেই সমস্ত ভাবনা ফেলে হাসিমুখে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। আশমিন সালাম দিয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এলো লতিফা চৌধুরীর দিকে। "কেমন আছ, আব্বু? আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো?"

"আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, ছোটোমা। তুমি ভালো আছ তো?"

"রাস্তায় কোনো অসুবিধা হয়নি, ছোটোমা।"

আলির উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন লতিফা চৌধুরী। সানভির মলিন মুখ দেখে ভ্রু কুঁচকে বললেন, "কী হয়েছে, সানভি বাবা? চেহারাটা অমন শুকনো শুকনো লাগছে কেন?"

আলি হেসে ফেলল। সানভির মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তেমন কিছু নয়, আন্টি। কাজের ধকলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রেস্ট নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। তাই না সান?

"হ্যাঁ।"

লতিফা চৌধুরী আর কথা বাড়ালেন না। আশমিনকে ভেতরে আসতে বলতেই আশমিন বলল, "তুমি ভেতরে যাও, ছোটোমা। আমরা একটু পরেই আসছি।"

"ঠিক আছে। বেশি দেরি কোরো না, বাবা। গ্রামে রাত-বিরেতে বাইরে বিপদ হতে পারে।"

জবাবে আশমিন মুচকি হাসল। লতিফা চৌধুরী মাথায় ঘোমটা টেনে ভেতরে চলে গেলেন। আশমিন দারোয়ানকে বলল ব্যাগগুলো ভেতরে পাঠিয়ে দিতে। এরপর আলি আর সানভিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

"গাড়ি নিয়ে গেলে হতো না?"

"প্রয়োজন নেই।"

আলি আর কথা বাড়াল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা খেজুর বাগানে ঢুকে গেল তারা। পায়ের তলে শুকনো পাতার মচমচ করে উঠতেই গা শিউরে

উঠল সানভির। এই চাকরি একদিন তার প্রাণটা নিয়েই ক্ষান্ত হবে। রাত প্রায় দশটা। এতেই মধ্যরাতের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। গ্রামের মানুষ শহরের মানুষের মতো নিশাচর নয়। তারা রাতে ঘুমায় তারাতাড়ি, আর সকালে জেগেও ওঠে তারাতাড়ি। চারদিকের কোলাহলহীন স্তব্ধ পরিবেশ জানান দিচ্ছে এতক্ষণে প্রায় মানুষই ঘুমের দেশে তলিয়ে গেছে। আশমিন ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে পুরোনো ঘরের দরজায় টোকা দিতেই ভেতর থেকে দরজা খুলে বাহাদুর বেরিয়ে এলো।

"কোথায় ওরা?"

"ভেতরেই আছে, স্যার।"

আশমিন আর আলি ভেতরে ঢুকল। সানভি বাইরে দাঁড়িয়ে ভীতু চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, "বাহাদুর ভাই, এখানে কি মানুষ খুন করা হয়?" বাহাদুর ভাবলেশহীন গলায় বলল, "হুম"

সানভি তড়িৎ গতিতে তাকাল তার দিকে। হুম মানে কী? এখানে খুন-খারাবি করে আবার বুক ফুলিয়ে বলছে! আজও কি কেউ খুন হবে? কে? ওই লোকগুলো? সে আজ এতগুলো খুনের সাক্ষী হবে? নাকি সেও এই অনাচারের সাথে জড়িত? বাহাদুরের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে অগোছালো প্রশ্নের জবাব নিজ মনেই খুঁজে যাচ্ছিল সানভি। বাহাদুর আড়চোখে একবার তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। সানভি নিজেকে সামলে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ভেতরে যাবেন না?"

স্বল্পভাষী বাহাদুর কোনো উত্তর দিলো না। সে আপাতত ভেতরে যাবে না। আশমিন আর আলি একাই যথেষ্ট। অনেকেই প্রথম দর্শনে নির্দ্বিধায় তাদের পৃথিবীর সবচেয়ে নরম মানুষ উপাধি দিয়ে দেবে; কিন্তু তাদের আলাভোলা সুদর্শন চেহারার পিছনের ভয়ংকর রূপটি সম্পর্কে খুব কম মানুষই অবগত। আশমিনের হিংস্রতা বাহাদুরের পাথরের মতো বুকেও কাঁপন ধরাতে সক্ষম। তবে সেই হিংস্রতা দেখার দুর্ভাগ্য খুব কমই হয়েছে তার।

অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করতেই ভ্যাপসা গন্ধ নাকে ধাক্কা দিয়ে গেল। মেঝেতে কয়েকটা ছেলে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। আশমিন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে সামনে গিয়ে তাদের সামনে দাঁড়াল। আলির এসব উটকো গন্ধে মাথা ধরে যায়। তাই সে নাক-মুখ কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেগুলো ব্যথায় গোঙাচ্ছে। দুলতে থাকা মোমবাতির আলোতে সবার মুখে দৃষ্টি বুলাল আশমিন।

"তোরা আমাদের ফলো করছিলি, কেন?"

আশমিন বিরক্ত চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল। ছেলেগুলো ব্যথায় কাতর হয়ে শুধু ছটফট করছে। আলি বিরক্ত গলায় বলল, "আমাদের এত খারাপ দিন এসে গেছে, ভাই? এখন এদের মেরে হাত নষ্ট করতে হবে?"

আশমিনের সবচেয়ে অপছন্দ হচ্ছে চ্যাঁচামেচি করা। জোর গলায় বাহাদুরকে ডাকতেও তার মেজাজ খারাপ হচ্ছে। আলি বুঝতে পেরে নিজেই গিয়ে বাহাদুরকে ডেকে নিয়ে এলো। ছোটো ছোটো কদমে পিছনে সানভিও এসে দাঁড়িয়েছে।

"কিছু বলেছে? উদ্দেশ্য কী ছিল?"

"আপনাকে মেরে ফেলা।"

আশমিন এবার শান্ত চোখে ছেলেগুলোকে দেখল। প্রত্যেকের বয়স আঠারোর নিচে। কিশোর বলা যায়। বেশির ভাগ জায়গায় এরা কিশোর গ্যাং নামেই পরিচিত। দেখতে ছোটো হলেও এদের হাতের কাজ কসাইয়ের থেকে কম নয়। মানুষ মারতে এরা খুব পারদর্শী। পকেটমার থেকে শুরু করে মসজিদের স্যান্ডেল চুরি, সব কাজই তাদের দ্বারা সম্ভব। আশমিন গায়ে লেপটে থাকা শুভ্র পাঞ্জাবির হাতা সযত্নে গুটিয়ে নিল। আলি চিন্তিত চোখে তাকিয়ে আছে। বুকের দুটো বোতাম খুলে চোখ তুলে একবার দেখে নিল ছেলেগুলোকে। কয়েক কদম এগিয়ে পায়ে ভর দিয়ে বসল তাদের সামনে। ধারালো দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে পাঠিয়েছে?"

"কায়সার কামাল।"

একজন কাঁপা কাঁপা গলায় উত্তর দিলো।

"ওদের বাঁধন খুলে দাও।"

বাহাদুরের সাথে থাকা কয়েকজন এসে ওদের বাঁধন খুলে দিলো। আশমিন ভয়ে গুটিয়ে যাওয়া ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোদের নাম বল। লিডার কে?"

একজন হাত তুলল। হালকা-পাতলা গড়নের রোগা চেহারার একটা ছেলে।

"ভাই, আমার নাম মিলন। ওরা আমার লগেই থাকে। সালাম, রাজু, বাবলু, কবির।"

"হুম, তোদের ছেড়ে দেবো। তবে আমার হয়ে কাজ করতে হবে।"

মিলন চোখ বড়ো বড়ো করে তাকাল। সে জানত না কাকে মারতে তাকে টাকা দেওয়া হয়েছিল। বাহাদুরের হাতে ধরা পড়ার পর উত্তমমধ্যম খাওয়ার সময় সব জানতে পেরেছে। সবটা জেনে নিজেকেই জুতাপেটা করতে ইচ্ছে

করছিল তার। সে তো ভেবেছিল গাড়ির সবাইকে মারতে হবে। এ আর এমন কী? গাড়িতে কে আছে জানার প্রয়োজন বোধ করেনি। তাদের জগতে আতঙ্কের নাম হচ্ছে আশমিন। দৈনিক দু-চারটা খুন করে হজম করে ফেলবে। ঢেঁকুরও তুলবে না। আমজাদ চৌধুরীর এই সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার পিছনে তার অবদান কিছু কম নেই। শত্রুপক্ষকে চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাবু করে ফেলার ক্ষমতা রাখে সে। যদিও সরাসরি রাজনীতিতে জড়ায় না নিজেকে। তবে তার বাবার শেল্টার সে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

"কাজটা ঠিক হবে না। ওদের বিশ্বাস করলে চরম মূল্য দিতে হতে পারে।"

"ধোঁকা দিয়ে যাবে কোথায়? যেই গর্তেই লুকাক না কেন, ছাঁকনি দিয়ে খুঁজে বের করে আনব।"

আশমিনের ঠান্ডা হুমকিতে বাকি সবার ঘাম ছুটে গেল।

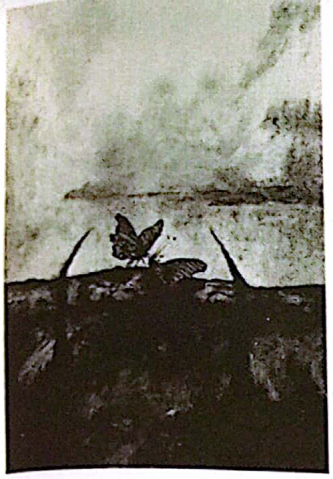
"বাহাদুর, ওদের খাইয়ে কিছু টাকা দিয়ে বিদায় করে দাও। প্রত্যেকের বায়োডাটা আর সাথে একটা করে ছবি তুলে রাখবে।"

"ঠিক আছে, স্যার।"

আশমিন বের হতে হতে সানভিকে বলল, "অমি কোথায়?"

"শিকদার বাড়ি থেকে একটু দূরে ওদের গাড়ি দাঁড় করানো আছে।"

"আচ্ছা।"



আশমিন যখন অমিকে নিয়ে শিকদার বাড়িতে পৌঁছল তখন ঘড়ির কাঁটা এগারোটা বিয়াল্লিশে। প্রচণ্ড কুয়াশায় এক হাত দূরের কিছুও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। বৃষ্টির মতো ফোঁটা ফোঁটা শিশির বিন্দু গায়ের উপরে নৃত্য করে যাচ্ছে। শিকদার বাড়ির উঠানে দাঁড়ানো আশমিনের গায়ে পাতলা পাঞ্জাবির উপরের অংশ অনেকটাই ভিজে গেছে। ফরসা মুখটা শীতের দাপটে রক্তশূন্য ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। সানভি ভারী জ্যাকেট পরেও শীতে কাঁপছে। আলি একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে আরেকটা হাতে রেখেছে আশমিনের জন্য। অমি থ্রি-কোয়ার্টার প্যান্ট আর পাতলা গেঞ্জি গায়ে শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। আশমিন সানভিকে বলল, "দরজায় নক করো।"

সানভি এগিয়ে গেল। অমি ভীত চোখে তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "আমি কি কোনো ভুল করেছি, ভাইয়া?

আশমিন বুকে দুহাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে থমথমে গলায় বলল, "হ্যাঁ।"

অমি বিভ্রান্ত হয়ে গেল। আনমনে নিজের ভুল খোঁজায় ব্যস্ত হতেই সানভির দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ কানে এলো। বাড়ির সবাই হয়তো জেগেই ছিল। দরজায় কড়াঘাতের শব্দে তড়িঘড়ি করে দরজা খুলল নুর। স্বল্প পরিচিত মুখটা দেখে তার বুক কাঁপতে লাগল। তাকে কি সত্যিই ধরে নিয়ে যাবে? আল্লাহ! এবারের মতো ঝামেলাটা কেটে গেলেই দুরাকাত শুকরিয়ার নামাজ আদায় করবে সে। মনে মনে আল্লাহর নাম জপতে জপতে দরজা ছেড়ে দাঁড়াল সে। মেয়ের পিছনে রাফসান শিকদারও এসে দাঁড়িয়েছেন। সানভিকে দেখেই চিনে ফেলেছেন তিনি। অজানা আতঙ্কে বুক কেঁপে উঠতেই সানভির পিছনে আশমিন, আলি আর অমিকে দেখে বিস্ময়ের সমস্ত সীমা পার করে ফেললেন। নুরের অস্বাভাবিকভাবে হাঁটু কাঁপছে। শরীরের কাঁপুনি নিয়ন্ত্রণ করতে নিজের হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রেখেছে সে। আশমিন তার দিকেই তাকিয়ে আছে। সে কি তার শরীরের কাঁপন বুঝে ফেলল?

"আসসালামু আলাইকুম, আংকেল। কেমন আছেন?"

"আশমিন বাবা, আপনি এত রাতে এভাবে?"

"অমিকে নিয়ে এসেছি। শুনলাম ও নাকি নিখোঁজ। ছোটো ভাই, একটা দায়িত্ব আছে তো।"

রাফসান শিকদার ব্যস্ত হয়ে বললেন, "আপনার এত কষ্ট করার দরকার ছিল না, বাবা। আসুন, ভেতরে আসুন। বাইরে খুব ঠান্ডা।"

আশমিন ইশারায় সানভি আর আলিকে ভেতরে যেতে বলল। অমি ঠান্ডায় বরফখণ্ডে পরিণত হয়েছে। ঘরে ঢুকতেই ছেলেকে দেখে নাফিজা শিকদার ছুটে এলেন। ছোটো শিশুর মতো জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন তিনি। অমি হাসিমুখে আগলে নিল মাকে। নুর দরজায় দাঁড়িয়ে সেই সুন্দর দৃশ্যটুকু উপভোগ করল। আশমিন এখনো আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। নুর তা ভালো করেই উপলব্ধি করতে পারছে। ঘরের সবাই অমিকে নিয়ে ব্যস্ত। নাফিজা শিকদার অমির সারামুখে হাত বুলিয়ে ভেজা গলায় বললেন, "ফোন বন্ধ করে রেখেছিলি কেন, বাবা? আমরা কত চিন্তায় ছিলাম, জানিস?"

"আমি গাজীপুর গিয়েছিলাম, আম্মু। সেখানে নেটওয়ার্ক পাওয়া যাচ্ছিল না। আমি জানতাম না এমন কিছু হবে। সরি, আম্মু।"

অমির মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে সে খুব অনুতপ্ত। নাফিজা শিকদার দ্রুত তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে ঠান্ডায় অসুস্থ হয়ে পড়বে সে। আশিয়ান ভাইয়ের হাত ধরে এতক্ষন আশমিনকে দেখছিল। নুরের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হেসে অমির সাথে ভেতরে চলে গেল সে। আশমিন এসে নুরের পাশে দাঁড়াল। তার গায়ের মিষ্টি সুবাস নাকে লাগতেই নুরের বেহায়া মন লাফিয়ে নিজের বেহায়াপনা জানান দিতে শুরু করল।

"তোমার ভাইকে দিয়ে গেলাম। আশা করি তাকে আমার থেকে দূরে রাখতে পারবে।"

নুর চকিত নজরে তাকাল। আশমিনের গম্ভীর ভঙ্গি তাকে অনেকটা দমিয়ে দিলো। সকালে কথাগুলো সে এভাবে বলতে চায়নি। ভাইয়ের দুশ্চিন্তায় মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। নুর আলাভোলা চোখে তাকাল আশমিনের দিকে। আশমিন মোটেও গলে গেল না। ভ্রু কুঁচকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে রইল। রাফসান শিকদার ব্যস্ত হয়ে আশমিনের কাছে এসে বললেন, "আসুন বাবা, ভেতরে আসুন। আসলে ছেলেকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। তাই আপনার দিকে খেয়াল করতে দেরি হয়ে গেল। ভেতরে এসে বসুন।"

"ব্যাস্ত হবেন না, আংকেল। আমরা বসব না। ছোটোমা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। দ্রুত ফিরতে হবে।"

"তা বললে তো হবে না, বাবা। আপনি তো এদিকে তেমন একটা আসেন না। খালি মুখে যেতে দিই কী করে? কিছু মুখে না দিয়ে যেতেই দেবো না আমি।"

রাফসান শিকদারের জোরাজুরিতে ভেতরে গিয়ে বসল সে। এমনিতেও সে এখান থেকে সহজে উঠবে না। অদূরে দাঁড়ানো ছোটো সাইজের রমণীর জন্য তার বুকে অসম্ভব প্রেমের জোয়ার এসেছে। যা সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে উপচে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আশমিন চাপা শ্বাস ছাড়ল। আলি তার পাশের সোফায় আরাম করে বসে আছে। আশমিন নুরের অস্বস্তি ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে তার চুপসে যাওয়া মুখটা উপভোগ করায় ব্যস্ত। রাফসান শিকদার আর নাফিজা শিকদার আপ্যায়নের তোড়জোড়ে লেগে গেছেন। নুর চাইলেও জায়গা থেকে নড়তে পারছে না। মাথার কাপড়টা টেনে এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে আশিয়ানকে খোঁজার চেষ্টা করল। বাঁদরটা নিশ্চয়ই ভাইয়ার গায়ে ঝুলে আছে। এদের সামনে দিয়ে তো যেতেও অস্বস্তি হচ্ছে। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এগিয়ে যেতে নিলেই আশমিন থমথমে গলায় বলল, "সামনে এসে বসো। ঠিক আমার চোখের সামনে।"

আশমিন আঙুলের সাহায্যে সামনের সোফাটা দেখিয়ে দিলো। খুকখুক করে কেশে উঠল আলি। সানভি এক কোনায় বরাবরের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। নুর চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে আছে। আশমিন দৃঢ় চোখে তাকিয়ে জানান দিলো সে সিরিয়াস। কথা না শুনলে থাপ্পড় দিয়ে বসতেও পিছ পা হবে না। আলি বিষয়টা সহজ করতে আমতা আমতা করে বলল, "বসো, নুর। এভাবে একা বসে থাকতে অদ্ভুত লাগছে। তুমি বরং আমাদের কোম্পানি দাও।"

আশমিন আগের মতোই দৃষ্টি তার ওপরে নিবদ্ধ রেখেছে। দেখে মনে হচ্ছে সে খুবই রেগে আছে। অথচ এই থমথমে মুখের আড়ালে এক প্রেমিকসত্তা তাকে অনবরত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করছে। ইচ্ছে করছে সামনের এই ছোটোখাটো মেয়েটাকে বুকের মাঝে পিষে ফেলতে। অসভ্য মেয়েটা এভাবে চুলগুলো খুলে রেখেছে কেন? তাকে কি শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলতে চায়? আশমিন নিচের দিকে দৃষ্টি দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ল। এই মেয়ের সামনে বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়। হাঁসফাঁস লাগছে তার। আলি আশমিনের পাংশুবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বিচলিত হলো। আশমিনের হাতে হাত রেখে চিন্তিত গলায় বলল, "তুই ঠিক আছিস? মুখটা এমন দেখাচ্ছে কেন?"

আশমিন কিছু বলল না। চোখ তুলে নুরের দিকে তাকাল। নুরও কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে।

"একটু ওয়াশরুমে যাব।"

নুরের দিকে চোখ রেখে কথাটা বলতেই আলি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, "ওহ, পেটের প্রেশার এসেছে? এভাবে চেপে বসে ছিলি কেন? আগে বললেই তো পারতি।"

আশমিন বিরক্ত হলো খুব। বিরক্ত মুখেই নুরের দিকে পুনরায় তাকাল। নুর আলির কথা শুনে মুখ টিপে হাসছিল। আশমিন তাকাতেই হাসি বন্ধ হয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, "আসুন আমার সাথে। আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

আশমিন উঠে দাঁড়াল। নুর পথ দেখিয়ে এগিয়ে যেতেই আলিকে চোখ দিয়ে শাসাল সে। আলি সেসব পাত্তা দিলো না। দাঁড়িয়ে থাকা সানভিকে বলল, "তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? এসে বসো।"

আশমিন নুরের পিছু পিছু এসে একটা রুমের সামনে দাঁড়িয়েছে। নুর ওয়াশরুম দেখিয়ে দিতেই সে নুরের মুখোমুখি দাঁড়াল। বুকের কাছে দুহাত ভাঁজ করে হিম শীতল কণ্ঠে বলল, "বড়ো হচ্ছ না কেন? এত ছোটো মেয়ে আমার ভালোবাসা সহ্য করতে পারবে না।"

আশমিনের অসংলগ্ন কথাবার্তায় নুরের ভ্রু কুঁচকে গেল। সে দ্বিধান্বিত চোখে তাকাল আশমিনের দিকে। আর কত বড়ো হবে সে? নাকি খাটো বলে তাকে টিপ্পনী কাটল? সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বলিষ্ঠ পুরুষের চোখে চোখ পড়তেই দৃষ্টি থেমে গেল তার। বুকের ভেতর ঢিপঢিপ বেড়েই চলল পাল্লা দিয়ে। আশমিন সুন্দর করে হাসল। নুর বুকে হাত চেপে দেওয়াল ধরে নিজেকে সামলাল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "হাসবেন না, প্লিজ!"

আশমিন এক কদম এগিয়ে এলো। একটু ঝুঁকে নুরের সারা মুখে চোখ বুলিয়ে মোহনীয় গলায় বলল, "আমি তো শুধু তোমার সামনেই হাসব। যাতে এক মুহূর্তের জন্য হলেও তোমারও এমন দমবন্ধ অনুভূতি হয়। আমার জন্য বুকের মাঝে হাঁসফাঁস করে। ইচ্ছে করে পোড়াচ্ছ আমাকে? এর শোধ তুলব না ভেবেছ?"

আশমিনের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। এই পাঁচ ফিট সাইজের একরত্তি মেয়েটা তাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে! ব্যাপারটা তার শান্ত মেজাজ খারাপ করার জন্য যথেষ্ট। তবুও সে মুখ বুজে সবটা সহ্য করছে। কারণ একটাই, এই মেয়েটাকে সে অসম্ভব ভালোবাসে। এই বেয়াদব মেয়েটাকে সে পাগলের মতো চায়। এমনই এক শীতের সকালে অষ্টাদশী নুরের প্রেমে পড়েছিল সে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে তার প্রেম গাঢ় হচ্ছে, কিন্তু এই বেয়াড়া মেয়ে তাকে

সমানে ইগনোর করে যাচ্ছে। তার অনুভূতির সাথে লুকোচুরি খেলছে। একবার বাগে পেলে সব সুদে আসলে উসুল করবে সে।

নুর অবুঝ চোখে তাকাল। নুরের এই অবলা দৃষ্টি আশমিনের মেজাজ আরও খারাপ করে দিলো। মুখের ভাবভঙ্গি গম্ভীর করে বলল, "এভাবে তাকাবে না। আমার কামড়ে দিতে ইচ্ছে করে।"

নুর চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রইল। আশমিন গভীর চোখে দেখল তাকে। এভাবেই পেরিয়ে গেলে কয়েক সেকেন্ড। রাফসান শিকদারের গলার স্বরে ঘোর থেকে বেরিয়ে এলো সে। দূরত্ব বজায় রেখে শীতল কণ্ঠে

বলল, "খুব শীঘ্রই আমার করে নিয়ে যাব। তৈরি থেকো। আমি এক কথার মানুষ। আমাকে হালকাভাবে নেওয়ার ভুল করো না। ওহ, আরেকটা কথা, আমার সাথে কখনো চিৎকার করবে না। আমি পছন্দ করি না। বেশি রাগ হলে আমাকে টুপ করে চুমু দিয়ে দেবে।"

নিজের গাল দেখিয়ে বলল, "এখানে দিতে পারো। চাইলে কামড়েও দিতে পারো। এই শাস্তি হবে আমার জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর শাস্তি। শিখিয়ে দিয়ে গেলাম। কথাগুলো সবসময় মাথায় রাখবে।"

আশমিন হনহন করে চলে গেল। নুর হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মনে মনে অসভ্য বলতেও ভুলে গেল সে। বসার ঘরে এসে দেখল রাফসান শিকদার এলাহি কাণ্ড করে ফেলেছেন। নানান রকম পিঠায় টেবিল ভরতি। আশমিন কিছু বলল না। মিষ্টি খাবার সে খেতে পছন্দ করে না। তবুও চুপচাপ গিয়ে টেবিলে বসল। আলি আর সানভি আগে থেকেই বসে পড়েছে। আলি গপাগপ পিঠা গিলছে আর প্রশংসায় ভাসিয়ে দিচ্ছে। আশমিন চোখ বুলিয়ে মিষ্টি কম এমন পিঠা খোঁজায় ব্যস্ত, কিন্তু তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। তাই বাধ্য হয়েই একটা পাটিসাপটা হাতে তুলে নিয়ে নরম গলায় বলল, "এসবের দরকার ছিল না, আন্টি। শুধু শুধু কষ্ট করলেন।"

নাফিজা শিকদার সস্নেহে হাসলেন। মমতা মাখানো গলায় বললেন, "তা বললে কী হয়, বাবা? আপনি এসেছেন, আমি খালি মুখে যেতে দিই কী করে?"

"ওর কথা বাদ দেন তো, আন্টি। আমার তো এই পিঠাপুলি বেশ লাগে। শহরে হাজারবার খেলেও এই স্বাদ পাওয়া যায় না। আহা, মন একেবারে ভরে গেল!"

আলির মাথায় পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দিলেন নাফিজা শিকদার। ছেলেটাকে ছোটোবেলা থেকেই চিনেন তিনি। বাপের মতো ধূর্ততা তার স্বভাবে নেই। মনটা একেবারেই মায়ের মতো পবিত্র। নাফিজা শিকদারের

মমতাগুলো মন থেকে অনুভব করল আলি। রাফসান শিকদার আশমিনের পাশে দাঁড়িয়ে এটা-ওটা এগিয়ে দিচ্ছেন। নুর দূর থেকে একবার উঁকি দিয়ে দেখে গেছে।

"অমিকে একটু ডেকে দিন, আন্টি। একটু কথা আছে।"

আশমিনের কথায় সায় জানিয়ে ভেতরে চলে গেলেন নাফিজা শিকদার। অমিকে সাথে নিয়েই ড্রয়িংরুমে হাজির হলেন। আশমিন নিজের পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, "বসো, অমি।"

অমি বসল। আশমিনের বাবার দলের হয়ে কাজ করলেও আশমিনের এত কাছে যাওয়ার সুযোগ বেশি হয়নি তার। কারণটা আশমিন নিজেই। সে সরাসরি রাজনীতির সাথে জড়িত নয়। নিজের গার্মেন্টস বিজনেস নিয়ে ব্যস্ত। বিভিন্ন শহরে তার অনেকগুলো ফ্যাশন হাউজ আছে। সেগুলোর দেখাশোনা সে নিজেই করে। তবে রাজনীতি তার রক্তে। তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে বড়ো বড়ো রাঘববোয়ালদেরও নাস্তানাবুদ হতে হয়। ভবনাগুলো এলোমেলোভাবে মাথায় আসতেই শুকনো ঢোক গিলল সে। ভীতু চোখে তাকাল আশমিনের দিকে। আশমিন পিঠা একটু খেয়ে রেখে দিলো।

"অমি, তুমি কিন্তু এটা অন্যায় করেছ। বাবা-মাকে এভাবে চিন্তায় রাখা তোমার মোটেও উচিত হয়নি। অন্তত তোমার কাছ থেকে আমি এমন কিছু আশা করিনি। একটা কল তো করতে পারতে?"

অমি মাথা নিচু করে নিল। অপরাধী গলায় বলল, "সরি, ভাইয়া। আমি আসলে এত গভীরভাবে ভেবে দেখিনি।"

"এখন থেকে ভাবতে হবে। তুমি বড়ো ছেলে। তোমাকে বিচক্ষণ হতে হবে। আর কখনো এমন ছেলেমানুষি করবে না।"

আশমিনের কঠিন স্বরে অমি মিইয়ে গেল। আলি কিছু বলতে নিলেই আশমিন তাকে ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বলল, "তোমার পরিবার রাজনীতি পছন্দ করে না, অমি। তাদের সারাক্ষণ তোমাকে নিয়ে চিন্তা হয়। হওয়াটাই স্বাভাবিক। তোমার উচিত তাদের চাওয়াকে সম্মান জানানো। আশা করি, আমার কথাগুলো তুমি বিবেচনা করে দেখবে।"

ছেলের অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে রাফসান শিকদার মুখ খুললেন। নরম গলায় বললেন, "এভাবে বলে আমাদের লজ্জা দেবেন না, বাবা। আমজাদ আমার পুরোনো বন্ধু। এখন সে ঢাকা থাকে তাই আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ কম। তবে বন্ধুত্বটা কিন্তু একটুও মলিন হয়নি। আপনি সবই জানেন। নতুন করে আর কী বলব? বাবা হিসেবে একটু তো টেনশন হয়ই। আপনার

সাথে থাকলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। শুধু একটাই অনুরোধ, ওকে নিজের ভাইয়ের মতো দেখে রাখবেন।"

নুর আর আশিয়ান আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনছিল। আশমিনের কথায় আবার নিজেকে অসহায় মনে হলো তার। লোকটা কি তার কথায় কষ্ট পেয়েছে? আশিয়ান ইশারায় গলায় হাত চালিয়ে বোঝাল—তুমি শেষ।

"আমি আপনাদের কথা ভেবেই বলেছি, আংকেল। রাজনীতির ময়দান এখন আর আগের মতো নেই। মানুষের মাঝে রেষারেষি, হিংসা দিনদিন বেড়েই চলেছে। অমির মতো নরম মনের মানুষের জন্য রাজনীতি নয়। ও ব্যাবসায় মনোযোগ দিক। সবে শুরু করেছে। সংসারের বড়ো ছেলেদের অনেক দায়িত্ব থাকে। একটা সময় ওকেও দায়িত্ব নিতে হবে। রাজনীতিতে জড়িয়ে গেলে ব্যাবসায় ঠিকঠাক মনোযোগী হতে পারবে না। পথ হারিয়ে ফেলবে। তাছাড়া অহেতুক শত্রু তৈরি হবে। অমি আমার ছোটো ভাইয়ের মতো। আমি চাই ও লাইফে এগিয়ে যাক। আর ওর পথটা যেন মসৃণ হয়।"

সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনল আশমিনের কথা। আশমিন এক গ্লাস পানি খেয়ে উঠে পড়ল। আলি আর সানভিও যাওয়ার জন্য তৈরি। আশমিন হাসিমুখে রাফসান শিকদারকে জড়িয়ে ধরল। বরাবরের মতো অভিযোগ করে বলল, "আপনি কিন্তু আমাকে তুমি সম্বোধন করেননি, আংকেল। পরেরবার রাগ করব কিন্তু!"

রাফসান শিকদার হাসলেন। আশমিনের পিঠে হাত বুলিয়ে মমতা মাখানো গলায় বললেন, "বাবাকে কেউ তুমি করে বলে? আপনি তো আমার বাবা। এই আপনি সম্বোধনেই আমি আনন্দ পাই।"

আশমিন হাসল। সকলের থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো। দরজার বাইরে বাহাদুর দাঁড়িয়ে আছে। আলি বাহাদুরকে দেখে দ্রুত পায়ে আবার ভেতরে চলে গেল। নাফিজা শিকদার টেবিল গোছাচ্ছিলেন। তাকে দেখে অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল, "ভুলে কি কিছু রেখে গিয়েছ, বাবা?"

আলি নির্মল হাসি দিয়ে বলল, "আসলে আন্টি, দুটো পিঠা নিতে এসেছি। আমাদের সাথে আরেকজন আছে। সে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে আপনার হাতের পিঠা না খাওয়াতে পারলে মনে শান্তি পাব না।"

নাফিজা শিকদারের চোখ ভরে এলো। ছেলেটা সবার কথা ভাবে। তিনি নিজ হাতে সব পিঠা প্যাকিং করে দিলেন। আলি হেসে পিঠাগুলো নিয়ে বাইরে এলো। আশমিন-সহ বাকি সবাই দাঁড়িয়ে আছে। আলি স্বভাবসুলভ হেসে পিঠাগুলো বাহাদুরের হাতে দিলো।

"তুমি বাইরে ছিলে আমরা জানতাম না, বাহাদুর। এখানে আন্টির হাতে বানানো খুব মজার পিঠা আছে। খেয়ে দেখো। তুমিও খাও, সান। তখন তো তেমন খেতেই পারলে না।"

বাহাদুর মনে মনে আপ্লুত হলো। তার মতো সামান্য বডিগার্ডকে নিয়ে আলি ভেবেছে এতেই তার মুখে হালকা হাসি দেখা গেল। সানভি অবাক হয়ে বাহাদুরের হাসি মুখটা দেখল। সবসময় কঠোর মুখে একঝলক হাসি যেন পরিবেশটাই বদলে দিলো। আশমিনের মুখেও হালকা হাসি। সে বাহাদুরের পিঠে চাপড় দিয়ে বলল, "তুমি শুধু একজন গার্ড নও, বাহাদুর। তুমি আমাদের পরিবারের একজন। নিজেকে আমাদের থেকে কখনো আলাদা ভাববে না।"

পরিস্থিতি কিছুটা আবেগঘন হয়ে উঠেছে। আশমিন ঘড়িতে সময় দেখে ওদের তাড়া দিলো।

"বাসায় যেতে হবে। একটা বাজতে চলল।"

সবাই বাসার দিকে রওনা হলো। আশমিন বাদে সবাই মনোযোগ দিয়ে পিঠা খাচ্ছে। প্রয়োজনীয় কথা বলতে বলতে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল তারা। নুর একদৃষ্টে দেখল সব। আশমিনের চোখের দৃষ্টি সে বোঝে। তবে ভয় হয় খুব। তেলে-জলে কখনো মিশ্রণ ঘটে না। তাদের আর্থিক অবস্থা ভালো হলেও আশমিন আর সে সমকক্ষ নয়। তাছাড়া আশমিনের মা কামিনী চৌধুরী প্রচণ্ড নাকউঁচু মহিলা। স্ট্যাটাস মেনটেইন করে চলেন। তাছাড়া কোনো এক অজানা কারণে কামিনী চৌধুরী তাদের পছন্দ করেন না। যখনই দেখা হয় মুখ কুঁচকে ফেলেন। রাফসান শিকদারও কামিনী চৌধুরীকে পছন্দ করেন না। তার কথা উঠলেই অজানা বিতৃষ্ণা ভেসে উঠে রাফসান শিকদারের চোখেমুখে। বাবাও যে তাদের সম্পর্ক নিয়ে এগুবেন না, তা অজানা নয় নুরের। তাদের অনুভূতির কোনো ভবিষ্যৎ নেই। থাকলেও সেটা খুব একটা সুখকর হবে না। নুর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সমস্ত অনুভূতি চাপা দিতে চাইল। বারবার নিজের মনকে বোঝাতে চাইল—এ সম্ভব নয়; কিন্তু মনের মাঝে অনুভূতি চাপা দেওয়া মানে জ্বলন্ত কয়লা বুকে রেখে স্বাভাবিক থাকার অভিনয় করা। নুর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল খালি উঠোনের দিকে। বুকটা এমন ব্যথা করছে কেন? আশমিনের প্রস্থান কি বুকের ব্যথা বাড়িয়ে দিলো?



আশমিন যখন বাসায় ফিরল তখন ঘড়ির কাঁটা রাত একটা বিশ মিনিটে। লতিফা চৌধুরী-সহ সবাই তাদের অপেক্ষায় ছিলেন। মৌরি চোখ দুটো জোর করে খুলে রেখেছে। আশমিনকে দেখতেই তার প্রথম অভিযোগ, "ভাই, তোদের বাসায় নেট নেই কেন? আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটিভ হতে পারছি না।"

মৌরির গলা খুব অসহায় শোনাল। আশমিন কিছু বলল না। সোজা গিয়ে লুবানার পাশে বসে পড়ল। লুবানা অসহায় গলায় বলল, "সন্ধ্যা থেকে ওয়াইফাই নেই। হয়তো সার্ভারে সমস্যা হয়েছে।"

"যা বলেছ সব পেয়েছ তো? কিছু কি বাদ পড়েছে?"

লুবানা উৎফুল্ল গলায় বলল, "কিচ্ছু বাদ পড়েনি, ভাইয়া। সব পেয়েছি।"

আশমিন মুচকি হাসল। লতিফা চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে অপরাধী গলায় বলল, "দুঃখিত, ছোটোমা। আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। আমার জন্য কষ্ট করে এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে হলো তোমাকে।"

"আরে ধুর, কী যে বলো না তুমি! তোমরা বসো। আমি খাবার গরম করছি।"

লতিফা চৌধুরী উঠে চলে গেলেন। মৌরি তুড়ি মেরে আশমিনের ধ্যান নিজের দিকে নিল। গলায় আশ্চর্য ভাব এনে বলল, "ভাই, আমরাও জেগে আছি। আমাদেরও একটু সরি বল।"

"সরি।"

মৌরি জামার কলার টেনে ভাব নিল। আলি বিরক্ত গলায় বলল, "এভাবে ভাব নেওয়ার কিছু নেই। তোর সাথে তর্কে যেতে চায় না বলেই সরি বলে মামলা এখানেই শেষ করেছে। নাহলে তো ঝগড়া করে মাথার তার ছিঁড়ে দিবি।"

মৌরি রাগী চোখে তাকাল। আলি সেদিকে পাত্তা দিলো না।

"তোর কী খবর? সারাদিন নাকি পড়ে পড়ে ঘুমাস?"

"মিথ্যা কথা! কে বলল তোমাকে?"

"বলতে হবে কেন? সব খবর আমাদের কানে অটোমেটিক চলে যায়।"

আলির কথা শুনে লুবানা মুখ কুঁচকে ফেলল। সে মোটেও সারাদিন ঘুমায় না। মাঝেমধ্যে শুধু ক্লাসে ঘুমিয়ে পড়ে। নিশ্চয়ই প্রফেসর তার বিরুদ্ধে কলকাঠি নেড়েছেন।

আশমিনের মনোযোগ এদিকে নেই। সে ফোনের স্ক্রিনে শান্ত চোখে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ আগেই নুরের নাম্বার থেকে একটা ছোটো বার্তা এসেছে। মেসেজটি দেখে আশমিনের বুকে চিনচিন ব্যথা হচ্ছে। মেয়েটা কি তাকে একটুও ভরসা করে না? তাকে কি একটুও বিশ্বাস করা যায় না? আশমিন আরেকবার চোখ বুলাল ছোটো বার্তাটির দিকে—

"আমরা দুজন সম্পূর্ণ দুই মেরুর মানুষ। আপনার পৃথিবীতে আমি মানানসই নই। অমিলের মিলন কখনোই সুখের হয় না। অনুভূতি কাছে আসলে যদি তিক্ততায় মিলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে তাকে দূর থেকেই বাঁচিয়ে রাখা শ্রেয়।"

আশমিন ঠান্ডা মাথার মানুষ। রেগে গেলেও খেই হারিয়ে ফেলা তার ধাতে নেই। কষ্ট পেলেও সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখতে জানে। তবে আজ সব নিয়ম যেন ভেঙে গেল। নুরের কথাগুলো তার মনে সুপ্ত জেদ তৈরি করল। নুরের এই ভাবনা তাকে অনেকটা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। এই মেয়ের ঘটে বুদ্ধি। নিশ্চয়ই কিছু একটা ফন্দি করে তার নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করাবে। আর দেরি করা সম্ভব নয়। বাকিদের কথার মাঝে থেকে উঠে সে আমজাদ চৌধুরীকে কল করল।

"হ্যাঁ, বলো।"

আমজাদ চৌধুরীর গম্ভীর গলা। আশমিন কোনোরকম ভণিতা না করে সরাসরি বলল, "বিয়ে করব, আব্বু।"

আমজাদ চৌধুরী অবাক হয়ে বললেন, "এই মাঝরাতে বিয়ের শখ হলো কেন?"

আশমিন গম্ভীর গলায় বলল, "বিয়ের শখ মাঝরাতেই হয়, আব্বু। তুমি ছোটো, তাই বুঝবে না।"

"আমি ছোটো?"

"অবশ্যই তুমি ছোটো। যখন তোমার বিয়ের বয়স হবে, তখন তোমাকে মুখ ফুটে বলতে হবে না। আমি নিজ দায়িত্বে একটা সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে করিয়ে দেবো।"

আমজাদ চৌধুরীর রেগে গেলেন। পাশে ঘুমিয়ে থাকা স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে গলার স্বর নিচু করে ছেলেকে ধমকে বললেন, "অসভ্যের মতো কথা বলবে না! বাবা হই তোমার! ছেলে হয়ে বাবাকে সরাসরি বিয়ের কথা বলতে লজ্জা করছে না?"

"লজ্জা করবে কেন? এটাই তো বয়স বউ বউ করার। এখন বিয়ের কথা সরাসরি না বলে কি তোমার বরাবর দরখাস্ত লিখতে হবে? এমপি হয়েছ বলে এত দাম দেখাবে? ছেলে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে সেদিকে ধ্যান দেবে না? তুমি একজন ইরেস্পন্সিবল বাবা। আমি এই মুহূর্তে একজন নতুন বাবা এনে দেওয়ার জোর দাবি জানাচ্ছি।"

আমজাদ চৌধুরী হতভম্ব হয়ে গেলেন। হাল ছাড়া মাঝির মতো ক্লান্ত গলায় বললেন, "ওখান থেকে ফিরে আসো। পরে কথা বলব।"

আশমিন থমথমে গলায় বলল, "দেখো আব্বু, ভালো ছেলের মতো বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবো। আমি তো আর এমপি নই যে, সুন্দরী মেয়ে হাত বাড়ালেই পেয়ে যাব। ব্যাপারটা বুঝতে হবে।"

ছেলের সূক্ষ্ম খোঁচাটা আমজাদ চৌধুরী বুঝতে পারলেন। খট করে কল কেটে বিড়বিড় করে বললেন, "একজন হয়েছে এতেই আল্লাহর রক্ষা। এমন আরেকজন পৃথিবীতে আসলে আমার আর বেঁচে থাকা হতো না।"

আমজাদ চৌধুরী মিজু সিদ্দিকের সাথে তার স্টাডি রুমে আলোচনায় ব্যস্ত। আশমিনের হাবভাব খুব একটা সুবিধার মনে হচ্ছে না। ছেলের যদি অন্য কাউকে পছন্দ হয়ে থাকে তাতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। ছেলের সুখে থাকাটাই তাঁর কাছে মুখ্য। তবে কামিনী চৌধুরী তা মোটেও মেনে নেবেন না। অনেক আগে থেকেই তিনি মিজু সিদ্দিকের বড়ো মেয়ে লারাকে পুত্রবধূ করার পরিকল্পনা করে রেখেছেন। ভেতরে ভেতরে মামাতো ভাইয়ের সাথে আলোচনাও এগিয়ে নিয়েছেন, তা তিনি জানেন। নিজের স্ত্রীকে তিনি ভালো করেই চেনেন। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু না বললেও ভেতরে ভেতরে কলকাঠি নেড়ে দুজনকে আলাদা করেই দম নেবেন। রাজনীতি করে লোক তো আর কম চেনা হলো না! লোক চড়িয়ে খান তিনি। নিজের স্ত্রীর রোষানলে ছেলের জীবনটা তছনছ হয়ে যাবে। আশমিন মায়ের এই রূপ সম্পর্কে ধারণা রাখে না। তার কাছে তার আম্মু মানেই মমতায় ঘেরা এক নমনীয় নারী।

আমজাদ চৌধুরী দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। মিজু সিদ্দিকের সাথে ব্যবসায়িক আলোচনা করতে করতে হঠাৎ করেই বললেন, "মেয়ে তো বড়ো হয়ে গেছে, মিজু। বিয়ের কথা কিছু ভাবলে?"

মিজু সিদ্দিক মুখ ভরে হাসলেন। কামিনী চৌধুরীর সাথে করা গোপন শলাপরামর্শ বেমালুম লুকিয়ে গিয়ে কাঁচুমাচু গলায় বললেন, "এত তাড়া কীসের, দুলাভাই? মাত্রই তো পড়াশোনা শেষ করল। কিছু দিন থাক নিজের মতো। তারপর নাহয় ভেবে দেখব। মেয়েকে তো আর যার তার হাতে তুলে দিতে পারি না। আগে যোগ্য পাত্রটা তো পেতে হবে।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসলেন আমজাদ চৌধুরী। মিজু সিদ্দিকের মতো ধূর্ত শিয়াল তিনি জীবনে বহু দেখেছেন। তাদের সামলানোর উপায়ও তাঁর কাছে তৈরি। তাই সুযোগ বুঝে নিজের চাল দিলেন তিনি, "তা অবশ্য ঠিক বলেছ। লারা বিদেশে থেকে লেখাপড়া করেছে। তার জন্য যেনতেন ছেলে তো আর চলবে না। আমি মনে করি লারার জন্য আমেরিকার পাত্রই বেস্ট হবে। দুজনের চিন্তাধারাও মিলবে। তুমি কী বলো?"

মিজু সিদ্দিকের মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। আগের হাসিখুশি মুখটা হঠাৎ করেই যেন চুপসে গেছে। তিনি হুট করেই আমজাদ চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করলেন, "তা আশমিনের বিয়ের কথা কিছু ভেবেছেন, দুলাভাই? এখনই তো বিয়ে করানোর উপযুক্ত সময়।"

আমজাদ চৌধুরী যেন এই প্রশ্নেরই অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি যথেষ্ট খোশ মেজাজে বললেন, "ছেলে বড়ো হয়েছে। সে নিজেই নিজেরটা বুঝে নেবে। তবে আমি চাই একটা শান্তশিষ্ট নরম স্বভাবের মেয়ে। যে আমার ঘর আলো করে থাকবে। পুরো বাঙালি সংস্কৃতির মেয়েই আমার ছেলের বউ হবে। আমার ছেলে কোহিনুরের হীরা। তার জন্য একজন রাজকুমারী আনব। যাকে দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যাবে।"

মিজু সিদ্দিক বিরক্ত হলেন। তার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। আমজাদ চৌধুরীর কথায় স্পষ্ট, তিনি লারাকে ছেলের বউ হিসেবে পছন্দ করেন না। এভাবে চললে তার সমস্ত প্ল্যান নষ্ট হয়ে যাবে।

কামিনী চৌধুরী স্তব্ধ চোখে তাকিয়ে আছে স্বামী আর ছেলের দিকে। মুন্সিগঞ্জ থেকে ফিরেই আশমিন বিয়ের কথা তুলেছে। ছেলের বিয়ের কথা শুনে তিনি প্রথমে খুশিই হয়েছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে চান, লারা তাঁর ঘরের বউ হয়ে আসুক। শিক্ষিত, ভদ্র, সুন্দরী মেয়ে লারা। লস অ্যাঞ্জেলসের ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নিজের পড়াশোনা শেষ করেছে। এই

মেয়েই তাঁর ছেলের জন্য সব দিক থেকে পারফেক্ট। মিজু সিদ্দিকও সমাজে প্রতিষ্ঠিত। ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের বিজনেস তার। কয়েক বছরে ব্যাবসা ফুলেফেঁপে উঠেছে। অথচ তাঁর ছেলে কি না শিকদার-বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করতে চায়! তিনি এই মেয়েকে কিছুতেই মেনে নিতে পারবেন না। স্বামীর মুখের ওপর কখনো কিছু না বললেও আজ আর চুপ থাকলেন না, "আপনি এমন একটা প্রস্তাবে কীভাবে সম্মতি দিচ্ছেন? ওই মেয়ে কোন দিক দিয়ে আমার ছেলের যোগ্য? শিকদার-বাড়ির মেয়ে এ বাড়িতে বউ হয়ে আসবে না।"

ড্রয়িংরুমে এই মুহূর্তে সবাই উপস্থিত। মিজু সিদ্দিক–তার স্ত্রী ও দুই মেয়ে নিয়ে এক পাশে বসে আছেন। চেহারায় তার রাগী ভাব। আশমিন চুপচাপ কফিতে চুমুক দিচ্ছে। আমজাদ চৌধুরী অবশ্য স্ত্রীর কথায় কান দিলেন না। তিনি মনোযোগ দিয়ে ফাইলে চোখ বুলাচ্ছেন।

"আমার কথা কি আপনি শুনতে পাচ্ছেন না? উত্তর দেন। আপনি একা একা ছেলের বিয়ে ঠিক করে ফেললেন? মা হিসেবে একবারও আমার মতামত নেওয়ার প্রয়োজন মনে করলেন না?"

কামিনী চৌধুরী রাগে কাঁপছেন। মিজু সিদ্দিকের বর্তমান স্ত্রী সুমা মুখ বাঁকালেন। তীর্যক ব্যঙ্গ করে বললেন, "বুঝলেন না আপা, আসলে ওই মেয়ে আমাদের আশমিনকে ফাঁসিয়েছে। গ্রামের মেয়েরা আবার এসব গুণ ভালোই রপ্ত করতে পারে। শুনলাম মেয়ের হাইটও কম। খাটো মেয়েদের ঘটে বুদ্ধি থাকে। এসব মেয়ের চরিত্রের ঠিক থাকে না। রূপ দেখিয়ে বড়োলোক ছেলেদের ফাঁসানোই এদের একমাত্র কাজ। মোটা টাকা দিলেই দেখবেন রাস্তা থেকে সরে গেছে।"

আশমিন চোয়াল শক্ত করে চুপচাপ নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। সুমা সিদ্দিক কথাগুলো বলার পরই পরিবেশ কিছুটা থমথমে হয়ে গেছে। আমজাদ চৌধুরী বিরক্ত চোখে তাকালেন তার দিকে। ছেলে রেগে গেলে এই অসভ্য মহিলার ইজ্জতের ধুলো উড়িয়ে দেবে। গর্দভ মেয়েমানুষ! নিজে মনে মনে গালি দিলেন তিনি।

আশমিনের পাশে বসে থাকা আলি শব্দ করেই হেসে ফেলল। সুমা সিদ্দিক ভ্রু কুঁচকে তাকালেন তার দিকে। লারা কামুক চোখে আশমিনকে দেখছে। বাকি কোনো কিছুই তার কানে যাচ্ছে না। সুমা সিদ্দিক আলিকে একদমই সহ্য করতে পারেন না। এই আপদ তার জীবনে সবসময় দুর্ভোগ নিয়ে আসে। রাগে তার গা পিত্তি জ্বলে উঠল, "এভাবে অসভ্যের মতো হাসছ কেন?"

আলি খুব কষ্টে নিজের হাসি থামাল। হাসতে হাসতে চোখের কোণে পানি এসে ভিড় করেছে। সে এক আঙুলে তা মুছতে মুছতে বলল, "কিছু মনে করবেন না, মিসেস অবৈধ সিদ্দিক। আসলে আপনার কথা শুনে মনে হলো আপনি নিজের চরিত্রের বিশ্লেষণ করছেন। আমার মনে হয়, আপনি আরেকজনের নিন্দা করতে গিয়ে ভুল করে নিজের ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ করে ফেলেছেন। আপনি বরং নিজের ভুল শুধরে নিন। আবার প্রথম থেকে নুরের নিন্দা করুন। দেখবেন, এবারও আবার ভুল করে নিজেরটা বলে ফেলবেন না যেন!"

সুমা সিদ্দিক কটমট করে তাকিয়ে আছেন আলির দিকে। আলির কথায় আশমিন অধর বাঁকিয়ে হাসল। চোখ তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলল সুমা সিদ্দিকের দিকে। আশমিনের ধারালো দৃষ্টিতে কিছুটা দমে গেলেন তিনি। লারার ছোটো বোন লিনা অবশ্য অপমানিত বোধ করল। আলিকে সে বড়ো ভাই হিসেবে খুব সম্মান করে। যদিও আলি কখনো তাদের সাথে কথা বলে না, কিন্তু তবুও সে তাকে ভালোবাসে। নিজের মা-বাবার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যখন থেকে জেনেছে, তখন থেকেই সে আলিকে দেখে অপরাধবোধে ভোগে। তবে আলির বলা কথাগুলো শুনে তার খারাপ লাগছে। নিকৃষ্ট হলেও মা তো। তার সম্পর্কে এভাবে বললে কষ্ট হয়। লিনার মুখ মলিন হয়ে গেল। মিজু সিদ্দিক ধমকে উঠলেন আলিকে, "ঠিক করে কথা বলো, বেয়াদব ছেলে। তোমার মা তোমাকে এই শিক্ষা দিয়েছে? খুব তো বড়ো বড়ো কথা বলত। সারাক্ষণ নীতিবাক্য ঝাড়তে থাকত। তা ছেলেকে এমন বেয়াড়া বানিয়েছে কেন?"

আলি হেসে বলল, "আমার মায়ের শিক্ষার জন্যই আপনি আর আপনার এই পরকীয়া প্রেমিকা এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। নাহলে কবেই উপরের টিকেট কেটে দিতাম। মায়ের শিক্ষার জন্যই এভাবে বেঁচে থেকে গায়ে চর্বি বাড়াচ্ছেন। আর বাকি রইল বেয়াদবি, ওটা আমার নির্লজ্জ বাপের থেকে পাওয়া। তার রক্তও তো শরীরে আছে। তাই চাইলেও এই ব্যাপারটা ছাড়তে পারছি না।"

আলির হাসতে হাসতে বলা কথাগুলো মিজু সিদ্দিকের-সহ বাকি সবার মুখ বন্ধ করে দিলো। তাদের তর্কে কামিনী চৌধুরী বিরক্ত গলায় বললেন, "থামবে তোমরা? এখানে আশমিনের বিয়ে নিয়ে কথা হচ্ছে। আমি পুরোনো কোনো কথা এখন টানতে চাইছি না। আমজাদ, আমি এই বিয়ে আর এই মেয়েকে কিছুতেই মেনে নেব না। কথাটা মাথায় রাখবে।"

কামিনী চৌধুরীর দৃঢ় গলায় মিজু সিদ্দিক সন্তুষ্ট হলেন। আমজাদ চৌধুরী ফাইলে চোখ রেখে গম্ভীর গলায় বললেন, "বিয়ে এখনো ঠিক হয়নি, কামিনী। নুর ভালো মেয়ে। রাফসান আমার ছোটোবেলার বন্ধু। দ্বিমত করার কোনো

কারণ নেই। তাছাড়া নুরকে ছেলের পছন্দ। সংসার যেহেতু সে করবে সেহেতু আমাদের বাধা দেওয়ার কারণ দেখছি না। এ নিয়ে আমরা পরে কথা বলব, কামিনী। এখন আমি জরুরি কাজ করছি। পার্টি অফিস থেকে কিছু লোকজন আসবে। তোমরা ভেতরে যাও।"

কামিনী চৌধুরী দমে গেলেন। স্বামীর সাথে এর চেয়ে শক্ত আচরণ করা সম্ভব নয়। তবে যা-ই হোক না কেন, এই মেয়ে চৌধুরী-বাড়ির বউ কিছুতেই হবে না। এর জন্য যা যা করা দরকার সবই তিনি করবেন।

মিজু সিদ্দিক রুমের মধ্যে অনবরত পায়চারি করছেন। রুমে এসে সুমা সিদ্দিক রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন, "তোমার গুন্ডা ছেলে আমাকে এতগুলো কথা শোনাল, তুমি কিছু করবে না? ওই বেয়াড়া ছেলে আমাদের হুমকি দিচ্ছে। আর তুমি হাত গুটিয়ে বসে আছ। দেখা যাবে একদিন আমাদের সবাইকে খুন করে ফেলেছে। তখনও এভাবে চুপচাপ বসে থেকো।"

মিজু সিদ্দিক প্রচণ্ড বিরক্ত হলেন। পায়চারি থামিয়ে স্ত্রীকে ধমকে বললেন, "আহ, এত ঘ্যানঘ্যান করো না তো! আশমিন অন্য কাউকে বিয়ে করতে চাইছে। বুঝতে পারছ তুমি? আমাদের মেয়ের কী হবে সে কথা না ভেবে তুমি ওই ছেলে কী বলল তা নিয়ে পড়ে আছ। বুদ্ধিহীন মহিলা!"

সুমা সিদ্দিক তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন, "একদম বাজে কথা বলবে না। আশমিন বললেই তো আর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে না। তোমার বোনেরও মতামত লাগবে। আর সে কখনোই এই বিয়েতে সম্মতি দেবে না। শিকদার-বাড়ির মেয়ে সে কিছুতেই এই বাড়ির বউ করে আনবে না। আশমিন তার মায়ের বাধ্য ছেলে। মায়ের সিদ্ধান্তের বাইরে সে যাবে না। তাই চিন্তা করার কিছু নেই। তুমি তোমার প্রথম পক্ষের ছেলের ব্যবস্থা করো। নইলে এর ফল ভালো হবে না। সাপ ফণা তোলার আগেই তাকে থেতলে দিতে হয়। একবার ফণা তুললে সে কামড়েই দম নেবে। তাই আগেই তার বিষদাঁত ভাঙা উচিত।"

সুমা সিদ্দিক হনহন করে বেরিয়ে গেলেন। তিনি চলে যেতেই দরজার আড়াল থেকে একটা ছায়া সরে গেল। মিজু সিদ্দিকের কপালে ভাঁজ পড়েছে। তিনি কিছু একটা মনোযোগ দিয়ে ভাবছেন। এভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকা যাবে না। কিছু একটা করতেই হবে। তবে সুমা সিদ্দিকের কথাও ফেলে দেওয়ার মতো নয়। আলির মনে তাদের জন্য অনেক ক্ষোভ আর ঘৃণা জমে আছে। কোনো না কোনো দিন তা বেরিয়েই আসবে। রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে না। তবে কিছু করার আগে একবার বুঝিয়ে দেখবেন। কথায় কাজ হলে

রক্তারক্তিতে যাবেন না তিনি। নিজের সন্তানকে হত্যা করতে তার পাষণ্ড হৃদয়ে একটু খারাপ লাগছে।

সকাল সকাল তৈরি হয়ে রুম থেকে বেরিয়েছেন কামিনী চৌধুরী। কালকের রাগ এখনো ঠান্ডা হয়নি তা তাঁর মুখে স্পষ্ট ফুটে আছে। ফুলি কিচেন থেকে উঁকি দিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করল। কামিনী চৌধুরী অবশ্য সেদিকে ধ্যান দিলেন না। কয়েক মিনিট পরেই সেখানে সুমা সিদ্দিক আর লারা উপস্থিত হলো। তিনজন কিছু একটা আলোচনা করে একসাথে বেরিয়ে পড়লেন।

আশমিন আর আমজাদ চৌধুরী খুব সকালে বেরিয়ে গেছেন। তাই তাদের কেউই এ বিষয়ে অবগত নয়। ফুলিও বিষয়টা তেমন গুরুত্ব দিলো না। তারা মাঝে মাঝেই এভাবে বেরিয়ে পড়ে। তাই সে নিজের কাজে মন দিলো। ফুলি ছাড়াও চৌধুরী-বাড়িতে আরও কয়েকজন স্টাফ আছে। রান্নার জন্য বাবুর্চি রাখা আছে। ফুলি বাদে সবাই আউট হাউজে স্টাফ কোয়ার্টারে থাকে। ফুলি ঘুণাক্ষরেও টের পেল না আজকের দিনটা তাদের জীবনে কতটা ঝড় বয়ে আনবে।

জার্মানির একটা কোম্পানির সাথে আজ সকাল সকাল মিটিং ছিল আশমিনের। সেখানে একটা আউটলেট খুলতে চাইছে সে। আপাতত পণ্যের মার্কেটিং করতে হবে। সে বিষয় নিয়েই আজকের মিটিং ছিল। মিটিং শেষ করতে করতে বারোটা বেজে গেছে। সানভি একটু পর পর ফোন দেখছে আর বিচলিত চোখে আশমিনের দিকে তাকাচ্ছে। আলি খেয়াল করে ইশারায় "কী হয়েছে" জিজ্ঞেস করল। সানভির কপালের ঘাম মুছে কিছু না বলে কাটিয়ে দিলো। আলির সন্দেহ গেল না। সে একটা ছোটো ব্রেক রাখার প্রস্তাব রাখল। আশমিন ভ্রু কুঁচকে তাকাল আলির দিকে। আলি হাসার চেষ্টা করে বলল, "একটানা মিটিং করতে একঘেয়েমি লাগছে। একটু ফ্রেশ অক্সিজেন প্রয়োজন।"

আশমিন দ্বিমত করল না। সে মিটিং স্থগিত রেখে বেরিয়ে এলো। একে একে সবাই বেরিয়ে যেতেই আলি সানভির কাঁধ জড়িয়ে ধরে বলল, "সত্যিটা বলে ফেলো, সান। কিচ্ছু লুকাবে না।"

সানভি কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছে ভয়ার্ত স্বরে বলল, "বড়ো ম্যাডাম মুন্সিগঞ্জ গিয়েছেন, স্যার।"

আলির কপাল কুঁচকে গেল, "হঠাৎ কী মনে করে?"

"শিকদার-বাড়িতে তাঁদের ঢুকতে দেখা গিয়েছে।"

আলি সানভিকে ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। গম্ভীর গলায় বলল, "সাথে আর কে গেছে?"

"সুমা সিদ্দিক আর লারা ম্যাডাম।"

আলির অভিজ্ঞ মস্তিষ্ক সব বুঝে নিল। সে শান্ত গলায় বলল, "আশমিনকে এখনই কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তারা কেন গিয়েছে তার সঠিক ইনফরমেশন নিয়ে আমাকে জানাবে। ওখানে কী কী হয়েছে তার একটা ঘটনাও যেন বাদ না যায়।"

সানভি ঘাড় নাড়িয়ে সায় জানাল। তবে এর জন্য তাকে খুব ভুগতে হবে। এই কথা লুকানোর অপরাধে আশমিন আদর-মহব্বতের সাথে তাকে গুলি করে দেবে।

আলি সানভির শুকিয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। তার কাঁধে চাপড় মেরে বলল, "ভয় পেয়ো না। আমরা কয়েকটা সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড দুর্বল। এর মধ্যে মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্ক অন্যতম। এখানে বিশ্বাস, ভরসা, আবেগ, ভালোবাসা সব একত্রে মিশে থাকে। তাই আমরা বিশ্বাস করতে পারি না তারা আমাদের সাথে খারাপ কিছু করতে পারে। তুমি চাইলে আশমিনকে জানাতেই পারো। তবে এতে সমস্যা গোড়া থেকে নির্মূল হবে না। কারণ কামিনী চৌধুরী সাবধান হয়ে যাবেন। তার প্ল্যানটা আগে জানতে হবে। তারপর পদক্ষেপ। আশমিনকেও বোঝাতে হবে, তার মমতাময়ী মা সবার জন্য মমতাময়ী নয়।"

কথাটা বলে আলি একটু বিষণ্ণ হয়ে গেল। সানভি বুঝল। তাই আর কথা বাড়াল না। আলি আশমিনের ক্ষতি হতে দেবে না। এটাই তার বিশ্বাস।

"কী হচ্ছে এখানে?"

আলির দেরি দেখে আশমিন আবার ফিরে এসেছে। দুজনকে একসাথে দেখে প্রশ্নটা করেছে সে।

"আরে তেমন কিছু নয়, মৌরি কল দিয়ে অত্যন্ত অসভ্য ভাষায় গালি দিচ্ছে। তার অভিযোগ হচ্ছে আমরা তাকে মানসিক অত্যাচার করছি। তাকে গাধার মতো এখানে–সেখানে টেনে নিয়ে তার জীবন নিয়ে টানাটানি করছি। এখন সে বিয়ে করে শান্তিতে সংসার করতে চায়। তাই আমাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে না। সে কথাই বলছিলাম।"

"কোত্থেকে কল করেছে?

"পাশের কেবিন থেকে।"

আশমিন মুচকি হাসল। সানভি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। একজন অবলা মেয়ের নামে এমন মিথ্যাচার সহ্য করার মতো নয়। মনে মনে ওই দিনটাকে সে সবচেয়ে বেশি অভিশাপ দেয় যেদিন সে এখানে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল। অসভ্য রবিবার! গালি দিয়েও মন ভরল না তার। তাই মলিন মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

আশমিন ঘড়ি দেখে তাড়া দিয়ে বলল, "বাসায় যেতে হবে। বাবার সাথে জরুরি কথা আছে।"

"মিটিংয়ের কী হবে?"

"আজকে এই পর্যন্তই। বাকিটা মৌরি সামলে নেবে। তুইও ওর সাথে থাক। প্রয়োজন হলে আমাকে কল করিস।"

"ঠিক আছে।"

আশমিন বাহাদুরকে কল করে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে দ্রুত বেরিয়ে গেল। আলি সন্দিহান চোখে তাকিয়ে রইল সেদিকে। আশমিন কি কিছু বুঝে ফেলল?



লতিফা চৌধুরীর মন-মেজাজ ভালো নেই। সকাল সকাল কামিনী চৌধুরী এসে তাকে অনেক কথা শুনিয়েছেন। কামিনী চৌধুরীর এই অহংকার বোধই তার পছন্দ নয়। অহংকার একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার সাজে। তিনিই সর্বেসর্বা। মানুষের আবার কীসের অহংকার? অহংকারের জন্যই আজাজিল আজ শয়তান। নিজ মনেই বিরক্তি ঝাড়ছেন লতিফা চৌধুরী। আবার সাথে করে কতগুলো কালনাগিনী নিয়ে এসেছেন। আসার পর থেকে লুবানাকে একের পর এক টিপ্পনী কেটে যাচ্ছেন। যেন তাঁরা লুবানাদের বাড়িতে নয়, লুবানারাই তাঁদের বাড়িতে গেড়ে বসেছে। লুবানা রান্নাঘরে এসে রাগী গলায় বলল, "মা, এরা কখন যাবে? আমার কিন্তু ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। এরপর আমি উলটা-পালটা কিছু বলে ফেললে আমাকে দোষ দিতে পারবে না।"

"ওরা আমাদের অতিথি। ওরা যা-ই করুক না কেন তুমি কোনো অসভ্যতামি করবে না। ওদের আচরণ যেমন ওদের ব্যক্তিত্ব বহন করে, তেমনি তোমার আচরণ তোমার ব্যক্তিত্ব বহন করবে। যাও, চুপচাপ নিজের রুমে যাও। ওরা যাওয়ার আগ পর্যন্ত বের হবে না।"

লুবানা আর কিছু বলার সাহস পেল না। ধুপধাপ পা ফেলে সেখান থেকে চলে গেল। লতিফা চৌধুরী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মেয়ের মনের অবস্থা তিনি বোঝেন। তবে সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগছে কামিনী চৌধুরীর নির্লিপ্ততা দেখে। লুবানার গায়ের রং নিয়ে এতকিছু বলার পরও তিনি কোনো প্রতিবাদ করলেন না। লুবানা তো তাদের পরিবারেরই মেয়ে। কামিনী চৌধুরী যে তাদের প্রতি এতটা ক্ষোভ পুষে রেখেছেন তা আজকের দিন না আসলে তিনি বুঝতেই পারতেন না। করিডোরে লারার সাথে দেখা হলো লুবানার। লুবানা কিছু না বলে নিজের রুমে যেতে নিলেই বাধ সাধল সে। তীর্যক গলায় বলল, "দাঁড়াও, দাঁড়াও। এত তাড়া কীসের?"

লুবানা দাঁড়িয়ে অত্যন্ত শান্ত গলায় বলল, "কিছু বলবেন, আপু?"

"তেমন কিছুই বলার নেই। আসলে একটা কথা জানতে চাই।"

লুবানার ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কী কথা?"

লারা লুবানার মুখোমুখি দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "যা বলব তার ঠিকঠাক উত্তর দেবে।"

লারা থামল। চোখেমুখে তার অজানা ক্ষোভ। রুক্ষমূর্তি ধারণ করে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "ওই মেয়েটা কী দিয়ে ভুলিয়েছে আশমিনকে? শরীর দেখিয়ে? হ্যাভ দে হ্যাড ফিজিক্যাল ইন্টারকোর্স?"

লুবানার কান ঝালাপাকা করে উঠল। অসম্ভব গা গোলাতে লাগল। একটা মেয়ে এতটা নীচু মানসিকতার কীভাবে হতে পারে! কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "এসব কী বলছেন আপনি? ছি!"

"একদম নাটক করবে না, মেয়ে। তোমাদের মতো মেয়েদের আমার ভালো করেই জানা আছে। তুমিই তো মনে হচ্ছে আশমিনের মাথাটা খেয়েছ। ওই মেয়েকে আশমিনের পিছনে লেলিয়ে দিয়েছ।"

লুবানার চোখ ভিজে উঠল। লারা থামল না। সে কথার আঘাতে জর্জরিত করতে লাগল তাকে।

"আসলে তুমিই হয়তো আশমিনকে হাত করতে চেয়েছিলে। তোমাকে পাত্তা দেয়নি, তাই আরেকজনকে লেলিয়ে দিয়েছ। আর কিছু পারো বা না পারো, ছেলে পটাতে ভালোই পারো। তোমার তো বাবা নেই। তা সংসার চলে কীভাবে? এই যে এত আভিজাত্যপূর্ণ জীবন যাপন করছ, কোথায় পাচ্ছ এত সব? কিছু বুঝি না ভেবেছ? আশমিন পুরুষ মানুষ। তার চাহিদা থাকতেই পারে। সেটা কি ওই মেয়ে আর তুমি ভাগাভাগি করে মেটাও নাকি?"

লুবানার স্তব্ধ চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। সে বাকরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই ঘৃণ্য মেয়েটার দিকে। লুবানা কিছু বলতে যাবে তার আগেই লারার গালে শক্ত হাতের এক চড় পড়ল। চকিত লারা হতভম্ব হয়ে গালে হাত দিয়ে সামনে তাকাতেই রাগে তার চোখমুখ লাল হয়ে গেল। তার সামনে অগ্নিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নুর। গাল থেকে হাত নামিয়ে তেড়ে যেতেই আরেকটা চড় পড়ল তার গালে। এভাবে পরপর কয়েকটা দিতেই লুবানা ধরে ফেলল নুরকে। লারার ফরসা গালে আঙুলের ছাপ স্পষ্ট। সে কিছুক্ষণের জন্য বাকহারা হয়ে গেছে। মাথা সম্পূর্ণ খালি খালি লাগছে তার। ডান কানটা কেমন ঝাঁ ঝাঁ শব্দ করছে।

রাগে কাঁপতে থাকা নুরকে আঁকড়ে ধরে শান্ত করার চেষ্টা করছে লুবানা। পারে না তো এখনই এই মেয়েকে মেরে হাড়গোড় ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে।

"শান্ত হও, আপু। আবর্জনায় হাত দিয়ে নিজের হাত নোংরা করো না।"

লারার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল লুবানা। নুর কাঁপতে থাকা হাতের আঙুল তুলে লারাকে দেখিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "এই অসভ্য মেয়ে আজ আমার মায়ের গায়ে হাত তুলেছে। আমার মাকে অপমান করেছে। এত বড়ো সাহস ওর! আমি ওর হাত ভেঙে দেবো, লুবানা। এই হাত নিয়ে ও মুন্সিগঞ্জের বাইরে যেতে পারবে না। এটা এই নুরের ওয়াদা।"

লুবানা থমকে গেল। আসন্ন ঝড়ের আভাস পেয়ে গলা শুকিয়ে গেল তার। নুর এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে লারার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নুরের এই রূপ দেখে মনে মনে কুঁকড়ে গেছে লারা। নুর ভয়ংকরভাবে হাসল। লারার গাল শক্ত করে চেপে ধরে হিংস্র গলায় বলল, "তুই কী ভুল করেছিস তুই নিজেও জানিস না। কসম আমার রবের, আমি তোর জবান সারাজীবনের মতো বন্ধ করে দেবো। তোর এমন হাল করব যে, কুকুরও তোর দিকে ফিরে তাকাবে না। আমার বাবা-মায়ের সাথে তোরা আজ যা করেছিস, তার ফল তোদের যদি সারা জীবন ভোগ না করিয়েছি তো আমার নামও তেহজিব নুর নয়।"

লারা সমস্ত শক্তি দিয়ে নুরকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। লুবানা আবারও এসে নুরকে টেনে সরিয়ে নিল। লারা হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়েছে। হঠাৎ আক্রমণে খেই হারিয়ে ফেলেছে সে। লারার অবস্থা দেখে লুবানা পৈশাচিক আনন্দ পেল। আহারে বেচারি! কিছুক্ষণ আগেই কেমন নাগিনির রূপে ছিল। এখন কেমন মুষড়ে পড়েছে। লারা কয়েক সেকেন্ড নিয়ে সামলে নিল নিজেকে। সেভাবেই চিৎকার করে ডাকল, "মম।"

কামিনী চৌধুরী আর সুমা সিদ্দিক রুমে বসে কথা বলছিলেন। লারার চিৎকারে তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে এলেন তাঁরা। লতিফা চৌধুরীও রান্নাঘর থেকে ছুটে এসেছেন। মেয়েকে এই অবস্থায় দেখে ছুটে গিয়ে আগলে নিলেন সুমা সিদ্দিক। রাগী চোখে তাকালেন নুর আর লুবানার দিকে। নুর কিছুটা শান্ত হয়েছে। লারাকে কয়েক ঘা লাগিয়ে মনের ক্ষোভ কিছুটা কমেছে তার। কামিনী চৌধুরী তেড়ে এসে দুজনের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "কী হয়েছে এখানে? লারার এই অবস্থা হলো কী করে? উত্তর দাও।"

চিৎকার করে উঠলেন কামিনী চৌধুরী। লুবানা মাথা নিচু করে চুপ রইল। নুর কামিনী চৌধুরীর সামনে দাঁড়িয়ে শান্ত গলায় বলল, "আমি করেছি। থাপ্পড় মেরে গাল লাল করে দিয়েছি। শুধু হাত ভাঙাটা বাকি আছে। সেটা হলেই এখান থেকে চলে যাব।"

কামিনী চৌধুরী হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ আগেই তারা শিকদার-বাড়ি থেকে এসেছেন। এই মেয়ে তখন নানার বাড়ি গিয়েছিল। না-হলে একেও শায়েস্তা করে আসতেন।

সুমা সিদ্দিক লারাকে রেখে নুরের দিকে তেড়ে যেতেই নুর হুংকার দিয়ে বলল, "ভুল করেও এমন কিছু করবেন না যাতে আমি বড়ো ছোটোর পার্থক্য ভুলে যাই। যেখানে আছেন সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন।"

কামিনী চৌধুরী রণমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। নুর তার দিকে এগিয়ে গেল। সুমা সিদ্দিক আর এগোতে সাহস পেল না। পাছে না আবার এই পুঁচকে মেয়ের দ্বারা অপমানিত হতে হয়। তাই তিনি পুনরায় লারাকে আগলে ধরে রাগী চোখে তাকালেন নুরের দিকে। নুর কামিনী চৌধুরীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, "আপনি আমার বাবা-মাকে অপমান করেছেন কেন? কে দিয়েছে আপনাকে সেই অধিকার?"

"ছোটোলোকের পরিচয় দিয়েই দিলে তাহলে। আমার বিশ্বাস কখনো মিথ্যা হয় না। আমি আগে থেকেই জানতাম তোমাদের মতো মেয়েদের স্বভাব কেমন হয়। ছেলে পচা শামুকে পা কাটতে চাইছে, মা হয়ে তো আর তা হতে দিতে পারি না। তাই পচা শামুকটাকে ছেলের রাস্তা থেকে সরাতে চাইছি। সিম্পল!"

নুর ব্যঙ্গাত্মক হাসল। খুব মজা পেয়েছে এমন ভাব ধরে বলল, "তা আপনি বুঝি খুব বড়োলোক! তা কী কী আছে আপনার? শুনেছি আপনি খুব অজ-পাড়াগাঁ থেকে উঠে এসেছেন। আপনার বাবার তো একসময় মুদির দোকান ছিল। ভাড়ায় চালাতেন। আপনি তো টাকার জন্য মাধ্যমিকের পর আর পড়াশোনাই করতে পারেননি। আমজাদ আংকেলের আপনাকে পছন্দ হওয়ায় ফ্যামিলির বিপক্ষে গিয়ে আপনাকে বিয়ে করে এনেছেন। আমজাদ আংকেলের বাবার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আপনাকে মেনে নেননি। নিজের বলতে অহংকার করার মতো কী আছে আপনার, বলুন তো? আসলে হয় হয়, অল্প পানির মাছ বেশি পানিতে গেলে এভাবেই লাফালাফি করে।"

কামিনী চৌধুরী রাগে কাঁপছেন। বহু বছর আগের অতীত চোখের সামনে ভেসে উঠেছে তাঁর। ভয়ংকর চোখে তাকিয়ে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে থাপ্পড় দিলেন নুরের গালে। নুর গালে হাত দিয়ে মুচকি হাসল। লতিফা চৌধুরী আর লুবানা মুখ হাত চেপে দাঁড়িয়ে আছেন। মুহূর্তের মাঝে কী ঘটে যাচ্ছে তা তাদের মস্তিষ্ক স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারছে না। সুমা সিদ্দিক আর লারার মুখে প্রসন্ন হাসি। নুর রাগে কাঁপতে থাকা কামিনী চৌধুরীকে বলল, "কী, খুব রাগ হচ্ছে বুঝি? কেউ অপমান করলে কেমন ফিল হয় তা বোঝাতে

চেয়েছিলাম। আশা করি সফল হয়েছি। আর বাকি রইল আপনার ছেলের কথা, তার কপালে বড়ো করে একটা কালো টিপ পরিয়ে তাতে পাউডার মেখে শোকেসে সাজিয়ে রাখুন। আমার তার ওপর কোনো ইন্টারেস্ট নেই। আই হেইট মাম্মি'স বয়।"

নুর যেভাবে এসেছিল সেভাবেই বেরিয়ে গেল। কামিনী চৌধুরী রক্তচক্ষু নিয়ে তার চলে যাওয়া দেখলেন। এই একরত্তি মেয়েটা তাকে এতগুলো কথা শুনিয়ে গেল! আর তাঁর ছেলে কি না এই মেয়েকে বিয়ে করতে চায়! তিনি বেঁচে থাকতে এই মেয়ে কিছুতেই চৌধুরী-বাড়ির বউ হয়ে আসবে না। যে করেই হোক, লারার সাথে আশমিনের বিয়েটা দিয়ে দিতে হবে। মনে মনে ছক কষতে লাগলেন তিনি। সুমা সিদ্দিক ও লারাকে নিয়ে রুমে আসতে বলে এগিয়ে গেলেন তিনি। লতিফা চৌধুরী নিজের হতভম্ব ভাব কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। মুহূর্তের মাঝে যেন সুনামি বয়ে গেল! কামিনী চৌধুরীর এই ইতিহাস তো তিনি জানতেনই না। নুর কীভাবে জানল? তিনি লুবানাকে আগলে ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। লুবানা কী রিয়্যাক্ট করবে বুঝতে পারছে না। হাতের ফোনের দিকে তাকিয়ে তার চোখগুলো বেরিয়ে আসার উপক্রম। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে সে আশমিনের অনেকগুলো মিসডকল দেখে তাকে কল দিয়েছিল। মাঝপথে লারার এমন অতর্কিত আগমনে সে ফোন কাটতে ভুলে গিয়েছে। এখানে কল ডিউরেশন ৪৮ : ২৩ সেকেন্ড দেখাচ্ছে। লুবানা ঝটপট লাইন কেটে দিলো। লতিফা চৌধুরী জানলে তাকে মেরে ভর্তা বানিয়ে দেবেন!



আশমিন তার বাবার অফিস রুমে বসে আছে। আমজাদ চৌধুরী বিরক্ত চোখে তাকিয়ে আছেন ছেলের দিকে। কিছুক্ষণ আগে গ্রামের বাড়ির কার্যক্রমে তাঁরা ফোনের মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন। নিজের স্ত্রী আর হবু পুত্রবধূর এমন বাকযুদ্ধ শুনে তিনি হতভম্ব হয়ে গেছেন। তবে লারার গালে থাপ্পড় পড়ার ব্যাপরটা বেশ ভালো লেগেছে তাঁর। বুকের ভেতর শান্তি শান্তি লাগছে। কত বড়ো সাহস! তার মৃত ভাইয়ের মেয়েকে এমন নোংরা ভাষায় অপমান করে! এই মেয়ের পরিবারকে তাদের সঠিক জায়গা দেখাতে হবে। আশমিনের অবশ্য সেদিকে ধ্যান নেই। সে তার মায়ের নতুন রূপের সাথে পরিচিত হয়ে কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে। সেটা কথা নয়, আমজাদ চৌধুরীর বিরক্তির কারণটা ভিন্ন। আশমিন খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে জানতে চেয়েছে, আজকের ইনিংসে কে বিজয়ী হয়েছে? তাঁর বউ, নাকি তাঁর ছেলের হবু বউ? এত ভয়ংকর পরিস্থিতিতে তার এমন দুষ্টু প্রশ্নের মানে কী? এখানে কি টি-টোয়েন্টি খেলা হচ্ছে? ফাজলামোর একটা লিমিট থাকা উচিত।

"কথা বলছ না কেন?"

আমজাদ চৌধুরী বিরক্ত চোখে তাকালেন ছেলের দিকে। হাতের কলমটা শব্দ করে টেবিলে রেখে বিরক্ত গলায় বললেন, "কী বলব? এখানে বলার কী আছে?"

"কিছুই বলার নেই? আমার বিরুদ্ধে এমন ষড়যন্ত্র করে এখন ভালো সাজা হচ্ছে? তুমি ইচ্ছে করে এমন করেছ। আসলে আমার প্রেমে পড়া তোমার সহ্য হয় না। তাই তুমি পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক সব করেছ। পেটে পেটে কত কুটিল তুমি, আব্বু!"

আশমিন অবাক হওয়ার ভান ধরল। আমজাদ চৌধুরীর ইচ্ছে করল দৌড়ে গিয়ে বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়তে। ছেলের কাছ থেকে এমন ভিত্তিহীন অভিযোগ পেয়ে তাঁর বেঁচে থাকার সাধ চলে গেছে। এত বড়ো অপবাদ তো বিরোধী দলের নেতাও কখনো করেনি! অথচ তাঁর নিজের ছেলে তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে! এদিকে তিনি জানেনই না তিনি কী এমন অন্যায় করেছেন। ও প্রেমে পড়ুক না-হয় ম্যানহোলে পড়ুক তাতে তাঁর সহ্য

না করার কী আছে? আমজাদ চৌধুরী নিজেকে সামলে নিলেন। ছেলেকে কষে ধমক দিতে গিয়েও চুপ হয়ে গেলেন। আশ্চর্য গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "আমি আবার কী করলাম? করল তো তোমার আম্মু। যা বলার তাকে গিয়ে বলো।"

"আমি কেন বলব? আমার জন্য আম্মু হিসেবে তুমি তাকে পছন্দ করেছিলে। সব দোষ তোমার। তাই সমস্যার সমাধানও তুমি করবে। আমি কিন্তু কোনোভাবেই বউ সেক্রিফাইস করব না। তোমার ভুল তুমি শোধরাও।"

আমজাদ চৌধুরী হাল ছেড়ে দিলেন। এই ছেলের সাথে তর্ক করে নিজের বাকি মানসম্মানটুকু খোয়ানোর ইচ্ছে নেই। তাই মৌন রইলেন। তবে কামিনী চৌধুরী কাজটা ঠিক করেননি। রাফসান শিকদারের কাছে তাঁকে অনেক ছোটো করে দিয়েছেন। ছোটোবেলার বন্ধুত্ব তাঁদের। কামিনী চৌধুরীর এই ব্যবহারের জন্য তাঁর সাথে চোখ মেলাতে পারবেন না তিনি। এর জন্য কামিনী চৌধুরীর সাথে তাঁর একটা আলাদা বোঝাপড়া হবে। নুর মেয়েটাকে তার অসম্ভব ভালো লেগেছে। একেবারে পারফেক্ট। এই মেয়েকে চৌধুরী-বাড়ির বউ করে আনলে আর কষ্ট করে টিভি দেখতে হবে না। টি-টোয়েন্টি ম্যাচ থেকে শুরু করে শাশুড়ি-বউয়ের সিরিয়াল সব তাদের সামলে লাইভ চলবে। মাঝেমধ্যে খুনোখুনির ব্যাপারও ঘটে যেতে পারে। এ ব্যাপারটা বাদে বাকি সব ঠিক আছে।

"আমি এখন যাচ্ছি। পরে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। এই বিষয়গুলো আমি আর বাড়াতে চাইছি না। নুর আর দশটা সাধারণ মেয়ের মতো ভীতু আর সহনশীল নয়। আম্মুকে সামলানোর দায়িত্ব তোমার। আম্মু ইদানীং ভিন্ন আচরণ করছে। আমার আর নুরের সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো বাধা আম্মুর ইগো। আমি আমার আম্মুকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুল বুঝতে চাই না। আমি নুরকেও হারাতে চাই না, আব্বু। আমি সহজ আর সাধারণ একটা জীবন চাই। আম্মুকে বোঝাও।"

আশমিনের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ালেন আমজাদ চৌধুরী। ব্যাপরটা গুরুতর রূপ নেওয়ার আগেই সামলাতে হবে। কামিনী চৌধুরী আজকাল তাঁর কথার কোনো পরোয়া করছেন না। পিছন থেকে কেউ কলকাঠি নাড়ছে তা তিনি ভালো করেই বুঝতে পারছেন। তাদের আসল উদ্দেশ্য বোঝার আগে কোনো ঝামেলা করতে চাইছেন না তিনি। নিজের মনে কিছু একটা ভাবলেন তিনি।

আশমিন লুবানাকে কল করছে। লুবানা তার কল রিসিভ করছে না। লারার এমন অসভ্য ব্যবহারের পরিণতি কী হবে লুবানা জানলে এখনই লাফিয়ে ফোন রিসিভ করত। আশমিন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বিরক্ত গলায়

আমজাদ চৌধুরীকে বলল, "এই মেয়ে লারার হাত না ভেঙে চলে গেল কেন? কমিটমেন্ট বলে কিছু নেই? মেয়েটা তো বড্ড ফাঁকিবাজ! এভাবে ধমক দিয়ে ঝুলিয়ে রাখার মানে কী?"

আমজাদ চৌধুরী ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আশমিনকে দেখে মনে হচ্ছে লারার হাত না ভাঙায় সে খুব অসন্তুষ্ট। পাটকাঠির মতো ফট করে হাতটা ভেঙে দিলেই ল্যাঠা চুকে যেত।

আমজাদ চৌধুরী ছেলেকে আর ঘাঁটাতে চাইলেন না। ছেলের হ্যাঁ-তে হ্যাঁ মেলালেন। আশমিন চোখমুখ কুঁচকে উঠে পড়ল। এভাবে বসে সময় নষ্ট করার কোনো মানে নেই। বিয়ে করে বউ আনবে ভাবতে না ভাবতেই তার আম্মু তার ভাবনায় বালতি ভরে ঠান্ডা পানি ঢেলে দিয়ে এসেছেন। হতাশায় তার নাক চুলকাচ্ছে। এই এক সমস্যা। অতিরিক্ত হতাশ হলেই তার নাক চুলকায়। বিশ্রী রোগ যত্তসব! তার কি বউ আছে যে, যখন–তখন আদর করে নাক চুলকে দেবে? এভাবে তাকে বিরক্ত করার মানে কী? আশমিন ফোন বের করে আজকের তারিখটা দেখে নিল। ১৭ই সেপ্টেম্বর। এটাই এ বছরের সেরা বাজে তারিখ। বাসায় গিয়ে দাগ কেটে রাখবে সে।

আশমিন অফিসে ফিরে এসেছে। নুরকে নিয়ে এলোমেলো ভাবনা তার মাথায় জট পাকিয়ে দিচ্ছে। নুরকে কল করবে ভেবেও কী মনে করে ফোন নামিয়ে রাখল। এই মেয়েকে বিশ্বাস নেই। দেখা যাবে ফোন রিসিভ করে বলবে, কী দোকানদারের নাতি, পেঁয়াজের দাম কত? বিতৃষ্ণায় মেজাজ বিগ্রে গেল তার। অত্যন্ত বিরক্ত মুখে নিজের কেবিনে এসে বসেছে সে। এই সানভি বাঁদরটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। কত বড়ো সাহস! তার কাছে কথা লুকায়! এই বেয়াদবটাকে আজ খালি পায়ে বাড়ি পাঠাবে সে। ছাগলটা সবার কথায় প্রভাবিত হয়ে যায়। এত সহজ-সরল অ্যাসিস্ট্যান্ট তার কপালেই পড়তে হলো কেন? আশমিন আসার কয়েক মিনিট পরেই সানভি ছুটে এসেছে। টেনশনের প্রভাব সরাসরি তার পেটে গিয়ে পড়েছে। ফলস্বরূপ বারবার ওয়াশরুমে যেতে হচ্ছে। তাকে দেখতে বিধ্বস্ত লাগছে। আশমিন রাগ ভুলে ছুটে গেল সানভির কাছে। চিন্তিত গলায় বলল, "এমন দেখাচ্ছে কেন? কী হয়েছে তোমার?"

সানভি শার্টের স্লিভ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। দুর্বল গলায় বলল, "আসলে একটু অসুস্থ ফিল করছি, স্যার। বাসায় চলে গেলে ভালো হতো। এই অবস্থায় অফিস করা পসিবল না।"

"বাসায় যাওয়া যাবে না, সান। আজ অফিসে তোমার কাজ করতে হবে না। তুমি বরং গাজীপুর বাগানবাড়িতে চলে যাও। বাড়িটায় অনেক আগাছা হয়েছে। নিজ হাতে পরিস্কার করবে।"

সানভি বাধ্য ছেলের মতো মাথা নাড়ল। আশমিন যে সবটা জেনে গেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অসহায়বোধ করল সে। এদিকে বারবার পেট মোচড় দিচ্ছে। অসহায়ত্ববোধ সাইডে রেখে সে আবার বাথরুমে ছুটল। মন খারাপ পরেও করা যাবে। কাপড় নষ্ট হলে সর্বনাশ! আশমিন চোখ বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। নুরের দেওয়া ম্যাসেজটি বারবার মাথায় ঘুরছে। মেয়েটার আশংকাই সত্যি হলো। কামিনী চৌধুরীকে তার দিকটা বোঝাতে হবে। নুর ভালো পরিবারের মেয়ে। কোনো দিক থেকেই তার অনুপযুক্ত নয়। বিয়ে সমানে সমানে হতে হবে এমন কোনো নিয়ম তো নেই। কামিনী চৌধুরীর এ মিথ্যা অহং হয়তো তার জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত ঝড় তুলে দেবে।

আলি এসে তার সামনের চেয়ারে ধপ করে বসল। আশমিন তবুও চোখ খুলল না। আগের মতো চুপ করে বসে রইল। আলি সতর্ক চোখে দেখল সবটা।

"এভাবে বসে আছিস কেন?"

"ভালো লাগছে না।"

"তাহলে বাসায় চলে যা।"

আশমিন উত্তর দিলো না। সোজা হয়ে চোখ খুলে শান্ত দৃষ্টিতে তাকাল আলির দিকে। আলি বিভ্রান্ত হলো। কপাল কুঁচকে বলল, "কী? এভাবে তাকাচ্ছিস কেন?"

"তোর অসৎ বোনকে একটু আদর সোহাগ করা হবে। তোর কোনো সমস্যা আছে?"

আলি শক্ত গলায় বলল, "আমার কোনো বোন নেই। ওরা মিজু সিদ্দিকের মেয়ে। এটাই ওদের একমাত্র পরিচয়। বোন শব্দটা আর কখনো ব্যবহার না করলে খুশি হব।"

অনুভূতিহীনের মতো কথাগুলো বলে দিলেও মনের ভিতর খচখচ করছে। আশমিন সবই বুঝল। আলির অস্বস্তি না বাড়িয়ে ধীর গলায় বলল, "আজ একটু রাজশাহী যেতে হবে তোর। গার্মেন্টসের কাঁচামাল নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে। ওরা কাপড় মানসম্পন্ন ব্যবহার করছে না। ম্যানেজারকে তার দেনাপাওনা মিটিয়ে টার্মিনেট করবি। এখনই বেরিয়ে পড়।"

আলি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। লারাকে তার কখনোই পছন্দ ছিল না। মেয়েটা একদম মিজু সিদ্দিক আর সুমা সিদ্দিকের গুণে গুণান্বিত হয়েছে। কিন্তু লিনা, সে যথেষ্ট শান্ত একটা মেয়ে। পুরোপুরি ঢেউয়ের বিপরীত সে। এখন আশমিন কার কথা বলেছে ব্যাপরটা পরিষ্কার নয়। লিনা এমন কিছু করবে বলে মনে হয় না। তবুও একবার জানতে ইচ্ছে করছে।

"যাচ্ছিস না কেন?"

আলি ইতস্তত গলায় বলল, "কার কথা বলছিলি?"

"আমার দিকে লালসার দৃষ্টিতে তাকানো অসভ্য মেয়ের কথা বলছি। যে আমাকে চোখ দিয়েই গিলে খেতে চায়। অস..."

আশমিনকে আর শেষ করতে দিলো না। তড়িঘড়ি করে উঠে বেরিয়ে গেল। আশমিন মনে মনে মুখ বাঁকাল। এত লজ্জা পাওয়ার কী আছে! আশ্চর্য!



নুর বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে দেখল গ্রামের কয়েকজন প্রতিবেশী উঠানে দাঁড়ানো। নাফিজা শিকদার হয়তো ঘর থেকে বের হননি। তাই তারা উঠোনেই দাঁড়িয়ে নানান ধরনের কথা বলছে। কথার বিষয়বস্তু যে সে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নুর মাথার ঘোমটাটা আরেকটু টেনে দিলো। তার পা আর চলতে চাইছে না। হাত-পা ভেঙে আসছে বারবার। মহিলাগুলো তাকে দেখে এগিয়ে এলো। সবার মুখে চাপা উত্তেজনা। প্রতিবেশী এক চাচি নুরকে দেখে ব্যঙ্গাত্মক হাসল। নুরদের বাড়ি থেকে দুই বাড়ি পরে তার বাড়ি। শ্লেষাত্মক গলায় বলল, "কিলো নুর, হুনলাম এমপির পোলার লগে লাইন করছ। কাহিনি সত্য নি?"

নুর কিছু বলল না। চুপচাপ ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে উদ্যত হতেই একজন তার হাত ধরে থামিয়ে দিলো। মুখ বাঁকিয়ে আরেকজনকে বলল, "দেমাগ দেখছেন, ভাবি? আকাম করব, আবার দেমাগও দেখাইব। মতির মায় কতা জিগাইল হের জবাব তো দিলোই না। উল্ডা দেমাগ দেহায় যাইতাছেগা।"

নুর শান্ত চোখে তাকাল তার আবদ্ধ হাতের দিকে। মহিলা কটমট করে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। নুর হিমশীতল কণ্ঠে বলল, "হাতটা ছাড়ুন।"

তাদের মধ্য থেকে করিমন নামের এক মাঝবয়েসি মহিলা এগিয়ে এলো। কামিনী চৌধুরীর এক নাম্বার চামচা এই মহিলা। এই মহিলাই সব খবরাখবর তাঁর কাছে পাচার করে। সে এসে কোমড়ে কাপড় গুঁজে বিশ্রী ভাষায় গালি দিলো নুরকে, "আত ছারব কে লো, মাগি? এমপির পোলার লগে হোওনের সোময় মনে আছিল না? শইল্লে এত কামড় ক্যা? কুটকুটানি সহ্য করতে পারোস নাই পাড়ায় যাইতি। ওই সরল পোলাডারে গিলতে গেলি ক্যা? তোর তো আর নাগরের অভাব নাই। শইল্লের জ্বালা মিডাইতে হেগো কাছেই যাইতি। বাড়িতে তো ব্যাবসা খুইল্লা বইছত। রাইত-বিরাইতে বেডা মাইনসের লাইন লাইগা যায়। এই গেরামে এই খানকিপনা চলব না। তগো এই গেরামে রাকলে গেরামের অন্য মাইয়াও নষ্ট অইয়া যাইব। গেরাম থেইকা চইলা যাবি তোরা।"

নুর গলার কাছে আসা কান্নাটুকু গিলে ফেলল। করিমন বিবির সাথে আরও কয়েকজন এসে তাল মিলাল। বিশ্রী ভাষায় নুরকে অপমান করতে লাগল। উঠোনের শোরগোল শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন নাফিজা শিকদার। মেয়ের এমন করুণ পরিণতি দেখে বাঘিনীর ন্যায় চড়াও হলেন তিনি। এক থাবায় নুরের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বুকে আগলে নিলেন মেয়েকে। মায়ের উষ্ণ পরশ পেয়ে ফুপিয়ে উঠল নুর। নাফিজা শিকদার ভয়ংকর চোখে তাকিয়ে গর্জন করে বললেন, "আমার মেয়ের দিকে হাত বাড়ালে সেই হাত আমি কেটে ফেলব। কোন সাহসে আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমার মেয়েকে হেনস্তা করছ তোমরা? এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।"

করিমন বিবি মুখ বাঁকাল। মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, "এডিরেই কয় চোরের মার বড়ো গলা। মাইয়া আকাম কুকাম কইরা বেড়াইব, আর মায় গলা পিডায় মাইনসেরে চুপ করায় রাকব।"

মায়ের পিছু পিছু আশিয়ান ও এসেছিল। বোনের অবস্থা দেখে রাগে ফেটে পড়েছে সে। দৌড়ে ঘরে ঢুকে খাটের তলা থেকে রামদা বের করে আনল। ততক্ষণে নাফিজা শিকদার করিমন বিবির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। বাকি কয়েকজন যারা করিমন বিবির সাথে এসেছিল তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। শিকদার-বাড়ির সাথে তারা কোনো দ্বন্দ্বে জড়াতে চায় না। করিমন বিবি তাদের ডেকে এনেছে বলেই তারা এসেছে। ফ্রিতে তামাশা দেখাটা মিস করতে চায়নি তারা। শিকদার-বাড়ির মেয়েকে দু-চার কথা শোনানোর সুযোগটাও হাতছাড়া করতে চায়নি। তাই এসেছিল। এখন নাফিজা শিকদারের জ্বলন্ত রূপ দেখে নিজেদের সিদ্ধান্তে আফসোস হচ্ছে তাদের। এদের প্রত্যেকের স্বামী শিকদারদের জমি বর্গা চাষ করে খায়। এমপির বউ তো বছরেও একবার এসে তাদের খোঁজখবর নেন না। বিপদে-আপদে রাফসান শিকদারকেই পাশে পেয়েছে তারা। করিমন বিবির কথায় নেচে খুব বিপদে পড়তে যাচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নাফিজা শিকদার সবার দিকে একবার চোখ বুলালেন। করিমন বিবি চোখ বড়ো বড়ো করে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। নাফিজা শিকদার তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, "আমার মেয়েকে নিয়ে কিছু বলার আগে নিজের মেয়ের দিকে নজর দাও, করিমন। শুনলাম গত মাসে তোমার মেয়ে এক ছেলের সাথে হাতেনাতে ধরা পড়েছে। অমির বাবা তো ক্লাবে তাদের বিচারও করে এসেছে। এত তাড়াতাড়ি সব ভুলে গেলে? তোমারও তো গুণের শেষ নেই। গ্রামের ছোটো বড়ো সবাই-ই কম বেশি জানে। সে কথায় আর যাচ্ছি না। পরনিন্দা আমি পছন্দ করি না। ভালোয় ভালোয় এখান থেকে চলে যাও। অমির বাবার কানে এ কথা গেলে তোমাদের কী অবস্থা হবে, একবার ভেবে দেখেছ?"

করিমন বিবি দমল না। কামিনী চৌধুরীর সাথে কথা বলেই এখানে এসেছে সে। এমপির পরিবার তার পাশে থাকলে শিকদাররা তার কিছুই করতে পারবে না। সে মুখ খোলার আগেই পাশের মহিলা বলে উঠল, "আমরা কিছু কই নাই, ভাবি। আমরা তো খালি সত্য ঘটনা জানতে আইছিলাম। নুর তো আমাগো সামনেই বড়ো অইছে। খারাপ তো দেহি নাই কোনোদিন। হের লাইগা আপনের থেকা হুনতে আইছিলাম।"

নাফিজা শিকদার নুরকে ঘরে যেতে বললেন। নুর বারান্দায় আসতেই আশিয়ানকে দা হাতে এগিয়ে যেতে দেখে সেখানেই তাকে আটকে ফেলল। আশিয়ান রাগে ফোঁসফোঁস করতে করতে বলল, "ছাড়ো, আপু। আজকে এদের একজনকেও জীবিত যেতে দেবো না। কত বড়ো কলিজা এদের তা আমিও দেখব।"

করিমন বিবি হায়-হায় করে উঠল। তার সাথের মহিলাগুলোও ভড়কে গেছে। নাফিজা শিকদার ছেলেকে শাসালেন। ধমকে ভেতরে যেতে বললেন। করিমন বিবি চিৎকার করে লোক জড়ো করতে লাগল, "দেইক্যা যাও হগলে। শিকদারের ছোড়ু পোলা আমগো কুবাইতে আইছে। মাইয়ারে তো মাগি বানাইছেই। পোলাগোও ডাকাইত বানাইতাছে। এই পোলায় আমাগো মাইরা হালাইব। কে আছ, আমারে বাঁচাও।"

করিমন বিবি পাক্কা অভিনেত্রীর মতো আহাজারি করতে লাগল। আশেপাশে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেছে। নুর আশিয়ানকে টেনে ভেতরে নিয়ে গেছে ততক্ষণে। নাফিজা শিকদার অসহায় বোধ করছেন। রাফসান শিকদার কিছুক্ষণ আগেই অমিকে নিয়ে বেরিয়েছেন। সারা দিন তাদের ওপর অনেক ধকল গেছে। কারোরই মন-মেজাজ ভালো নেই। মেয়েকে নিয়ে যথেষ্ট চিন্তায় আছেন তাঁরা। এদিকে এই মহিলার নাটক। সব মিলিয়ে দিশেহারা লাগছে তাঁর। নাফিজা শিকদার প্রতিবেশী এক মহিলার কাছে গিয়ে বললেন, "আপনারা উনাকে নিয়ে এখন এখান থেকে যান, ভাবি। আমি আর কোনো অশান্তি চাই না।"

মহিলাগুলো করিমন বিবিকে জোর করে মাটি থেকে তুলল। করিমন বিবি আহাজারি করতে করতে বলল, "তুই তোর ডাকাইত পোলারে দিয়া আমারে মারতে চাইছিলি, আল্লায় তোর ওপরে ঠাডা হালাইব। তোর এই দেমাগ আল্লায় মাডিত মিটাইয়া দিব। দেইখ্যা লইস তুই।"

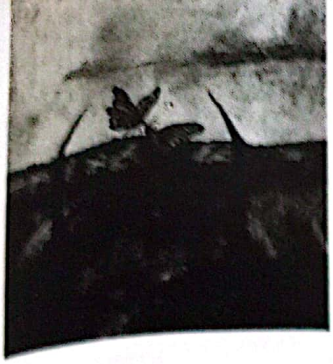
উৎসুক জনতার মাঝে চাপা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। নাফিজা শিকদারের বুক ধড়ফড় করছে। এই মহিলার অভিশাপ নাকি লেগে যায়। লোকমুখে অনেক শুনেছেন তিনি। মহিলাগুলো করিমন বিবিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যে যার মতো

ঘটনা সাজিয়ে একজন আরেকজনের সাথে বলাবলি করছে। নাফিজা শিকদার ধীর পায়ে ঘরে ঢুকলেন। বসার ঘরে নুর আর আশিয়ান দাঁড়িয়ে আছে। আশিয়ান এখনো রাগে ফুঁসছে। নুর এক হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে তাকে। নাফিজা শিকদার মেয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "আশমিন চৌধুরীর সাথে তোর কোনো সম্পর্ক আছে? সত্যি করে বল, নুর।"

মায়ের প্রশ্নে থমকে গেল নুর। বুকের ভেতরে আশমিন, আশমিন করতে থাকা হৃৎপিণ্ডটাকে বের করে পিষে ফেলতে চাইল সে। হৃদয়ে ছটফট করতে থাকা অনুভূতির পায়রাটার ডানা ভেঙে নির্দয়ের মতো বলল, "তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আম্মু।"

"এটাই যেন সত্যি হয়। এর বাইরে আমি আর কোনো সত্যি জানতে চাই না। কথাটা মাথায় থাকে যেন।"

মেয়েকে শক্ত গলায় কথাগুলো বলে নিজের রুমে চলে গেলেন নাফিজা শিকদার। আশিয়ান অসহায় চোখে তাকিয়ে রইল বোনের মলিন মুখের দিকে। নুর আস্তে আস্তে নিজের রুমে চলে গেল। আশিয়ান তার ফোনটা হাতে নিয়ে আশমিনের নাম্বারে কল দিলো। কী একটা ভেবে রিং হওয়ার আগেই কল কেটে দিলো সে। ততক্ষণে আশমিনের ফোনে রিং চলে গেছে। আশিয়ানের রাগ সব আশমিনের ওপর গিয়ে পড়েছে। মা আর বোনের রুমের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল সে। এই করিমন বিবির একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আগে রাফসান শিকদার আর অমি ফিরে আসুক। সেখানে বসেই বাবা আর ভাইয়ের জন্য চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল সে।



আশমিন যখন বাসায় ফিরল তখন ঘড়ির কাঁটা এগারোটা পার হয়েছে। কিছুক্ষণ পরেই ক্যালেন্ডারের তারিখটি আরেকটি ঘর পার করবে। কামিনী চৌধুরী আশমিনের অপেক্ষায়ই বসে ছিলেন। ক্লান্ত দেহে ডাইনিং পার হতেই কামিনী চৌধুরী তাড়া দিয়ে বললেন, "তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে এসো। আমি খাবার গরম করছি।"

আশমিন ক্লান্ত চোখে তাকাল। মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে নিজের রুমের দিকে ছুটল। আশমিনের পাশের রুমটি লারার দখলে। কামিনী চৌধুরী নিজেই তাকে দখলদারিত্ব দিয়েছেন। লারার রুম পার হওয়ার সময় আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল আশমিন। ভ্রু কুঁচকে তাকাল রুমের ভেতরে। এভাবে একটা মেয়ের রুমে তাকানো মোটেও উচিত নয়। তবুও নিজেকে আটকাতে পারল না সে। লারার হাতে সাদা কাপড়ের ব্যান্ডেজ করা। সত্যি সত্যি হাত ভেঙে দিয়েছে? এ তো দেখছি সাংঘাতিক মেয়ে! তার সংসার জীবন সাপলুডু খেলতে খেলতে পার হবে বলে মনে হচ্ছে। লারা হেলান দিয়ে বসে ছিল। আশমিনকে দেখে সোজা হয়ে বসল। মনে মনে পুলকিত হলেও চোখেমুখে কান্নার ছাপ এনে ন্যাকা স্বরে বলল, "তুমি এসেছ, বেবি? দেখো, আমার হাতের কী অবস্থা হয়েছে!"

আশমিন দরজার বাইরেই সোজা হয়ে দাঁড়াল। এক হাতে ব্লেজার রেখে আরেক হাত পকেটে গুঁজে শান্ত গলায় বলল, "কী করে হলো?"

লারা খুশিতে আত্মহারা। আশমিন তার খোঁজ নিচ্ছে! এতগুলো বছরে এই প্রথম নিজ থেকে কিছু জিজ্ঞেস করেছে। সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। দ্রুত সোজা হয়ে বসল সে। আহ্লাদী গলায় বলল, "অ্যাকসিডেন্ট করেছিলাম।"

"কোথায় গিয়েছিলে?"

আশমিনের একের পর এক প্রশ্নে ভড়কে গেল লারা। তারা যে আজ মুন্সিগঞ্জ গিয়েছিল তা আশমিনকে জানাতে নিষেধ করেছেন কামিনী চৌধুরী। তাই সূক্ষ্মভাবে এড়িয়ে গেল সে। হাসার চেষ্টা করে বলল, "শপিংয়ে গিয়েছিলাম।"

"গাড়ির কিছু হয়নি তো?"

আশমিনের প্রশ্নে লারা আহত হলো। তার কতটুকু লেগেছে তা না জিজ্ঞেস করে গাড়ির খোঁজ করছে! লারা বিষণ্ন গলায় বলল, "গাড়ি ঠিক আছে।"

আশমিন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। নিশ্চিন্ত হলো এমন ভান ধরে লারাকে বিরক্ত গলায় বলল, "আমার গাড়ি নিয়ে কখনো বের হবে না। অযাচিত কারোর আমার কিছু ব্যবহার করা আমি পছন্দ করি না।"

কথা শেষ করেই হনহন করে নিজের রুমে চলে গেল সে। মেয়েটাকে দেখেই তো হাত নিশপিশ করছে। নেহাত সে মেয়েদের গায়ে হাত তোলে না। না-হলে আজ এ মেয়ের দাঁত কপাটি খুলে ফেলত সে। বেয়াড়া মেয়ে একটা!

খাবার টেবিলে আশমিন নিজের মতো খেয়ে যাচ্ছে। কামিনী চৌধুরী উশখুশ করছেন কিছু বলার জন্য। আশমিনই প্রথমে কথা শুরু করল, "আব্বু আসেনি?"

"না, তার নাকি কোন পার্টি অ্যাটেন্ড করতে হবে। তাই আসতে লেইট হবে।"

আশমিন "আচ্ছা" বলে কথার সমাপ্তি টানল। কামিনী চৌধুরী গলা পরিস্কার করে বললেন, "আমি ঠিক করেছি আগামী মাসে তোমার বিয়েটা সেরে ফেলব। কী বলো?"

আশমিন মাছের কাঁটা মনোযোগ দিয়ে বাছতে বাছতে স্বাভাবিক গলায় বলল, "এ মাসে সমস্যা কোথায়?"

ছেলের এহেন কথায় থতমত খেলেন কামিনী চৌধুরী। তিনি আশমিনের মনোযোগ আকর্ষণ করতে আবারও বললেন, "লারা খুব ভালো মেয়ে। তোমার সাথে খুব মানাবে। একেবারে আমাদের স্ট্যান্ডার্ডের মেয়ে। তুমি সুখী হবে।"

আশমিন ভাত খাওয়া বাদ দিলো। সবকিছু কেমন তেতো লাগছে। সে এক ঢোক পানি খেয়ে শান্ত গলায় বলল, "আমি জানি আমি সুখী হব, আম্মু। তবে লারা নামের ওই মেয়েটার সাথে নয়। যাকে আমি পছন্দ করেছি তার সাথে। আর সরি, আম্মু। লারা আমাদের স্ট্যান্ডার্ডের নয়। না কখনো হতে পারবে। একটা প্লে গার্ল কখনো আমাদের স্ট্যান্ডার্ডের হতে পারে না।"

কামিনী চৌধুরী মেজাজ হারালেন না। উপচে আসা রাগটুকু গিলে নিলেন তিনি। নরম অথচ দৃঢ় গলায় বললেন, "ওই মেয়ে এ বাড়ির বউ হয়ে আসবে

না, আশমিন। লারা কোনো প্লে গার্ল নয়। মুখে যা আসে তা-ই বলো না। একটা মেয়ের চরিত্র নিয়ে কথা বলার আগে তোমার একশবার ভাবা উচিত।"

আশমিন শান্ত চোখে তাকাল। হিমশীতল কণ্ঠে বলল, "তুমি ভেবেছ, আমার অগোচরে তোমরা কী করবে তা আমার কানে আসবে না? আমি তোমার সন্তান, আম্মু। আমাকে তো সবচেয়ে ভালো তোমার চেনার কথা। একটা মেয়েকে অপমানের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছ তোমরা। যত প্রকার হেনস্তা করা যায় তার একটাও বাদ রাখোনি। তার অপরাধ, তোমার ছেলে তাকে ভালোবাসে বিয়ে করতে চেয়েছে। সে কিন্তু চায়নি, তোমার ছেলে চেয়েছে। অথচ বিনা দোষে শাস্তি পেল সে। এতটা নিচে কী করে নামলে, আম্মু? আমার উনত্রিশ বছরের জীবন তো পুরোটাই বৃথা মনে হচ্ছে। তোমার রক্ত-মাংস খেয়ে পৃথিবীতে এসে আমি তোমাকেই চিনতে পারিনি!"

কামিনী চৌধুরী স্তব্ধ চোখে তাকিয়ে আছেন ছেলের দিকে। আশমিনের চোখে কোনো রাগ, অভিমান, অভিযোগ কিছুই নেই। আছে শুধু একরাশ হতাশা। কামিনী চৌধুরী মোটেও টললেন না। তিনি নিজের সিদ্ধান্তে স্থির। শিকদার-বাড়ির মেয়ে এ বাড়ির বউ হয়ে আসবে না। আশমিন কামিনী চৌধুরীর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে তার ভাবাবেগ বোঝার চেষ্টা করল। কামিনী চৌধুরী তার কথায় কষ্ট পেয়েছেন তা স্পষ্ট। আশমিনের খারাপ লাগল। সে এভাবে বলতে চায়নি। মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। নিজের খারাপ লাগাকে প্রকাশ করল না সে। চুপচাপ খাওয়া ছেড়ে উঠে গেল। কামিনী চৌধুরী নিচের দিকে তাকিয়ে শক্ত গলায় বললেন, "তোমার কাছে কি ওই মেয়ে আমার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ?"

আশমিন থামল। নরম গলায় বলল, "তোমাদের দুজনের স্থান এক নয়, আম্মু। যে যার জায়গায় সমান গুরুত্বপূর্ণ।"

কামিনী চৌধুরী ব্যঙ্গাত্মক হেসে বললেন, "আমার তো তা মনে হয়নি। রাস্তায় যখন ওই মেয়ে আমাদের গাড়ি থামিয়ে লারার ওপর চড়াও হলো তখন তোমার গার্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। একবারও আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি।"

"কারণ সেখানে তুমি নিরাপদ ছিলে। ওরা তোমার সুরক্ষার জন্য নিয়োজিত, আম্মু। লারা ইজ নট আওয়ার কনসার্ন।"

কামিনী চৌধুরী রুষ্ট চোখে তাকালেন ছেলের দিকে। অসন্তুষ্ট গলায় বললেন, "তুমি পুরোপুরি ওই মেয়ের বশে চলে গেছ, আশমিন। আমি দ্বিতীয়বার ওই মেয়ের নাম এ বাড়িতে শুনতে চাই না। ওই মেয়ে আমাকে বাজেভাবে অপমান করেছে। কত বড়ো স্পর্ধা ওই মেয়ের! এরপরও যদি তুমি

ওকে বিয়ে করতে চাও তাহলে আমি আত্মহত্যা করব। কথাটা মাথায় রেখো।"

কামিনী চৌধুরী হনহন করে চলে গেলেন। আড়াল থেকে সুমা সিদ্দিক হেসে মিজু সিদ্দিককে বললেন, "দেখেছ, আপাকে বুদ্ধিটা দিয়েছিলাম বলেই আপা এভাবে বলতে পারল। এবার আর আশমিন আপার বিরুদ্ধে যাওয়ার চেষ্টা করবে না। আমার মেয়েই এই চৌধুরী-বাড়ির বউ হয়ে আসবে।"

মিজু সিদ্দিক খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসলেন। প্রসন্ন গলায় বললেন, "তাহলে পার্টির সাথে কথা বলি। কী বলো?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো। শুভ কাজে দেরি করতে নেই। এই মা-ছেলের নাটকের জন্য না সোনার হরিণ হাতছাড়া হয়ে যায়!"

"কিছুই হাতছাড়া হবে না। বহুদিনের সাধনা আমার। এভাবে নষ্ট হতে দেবো না। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ওই মেয়ের পুরো পরিবার পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবো।"

মিজু সিদ্দিকের চোখ মুখ শক্ত হয়ে উঠল। সুমা সিদ্দিক পৈশাচিকভাবে হাসলেন। হিংস্র গলায় বললেন, "ওই মেয়েকে একটা শিক্ষা তো দিতেই হবে। আপা অবশ্য সে ব্যবস্থা কিছুটা করে এসেছে। বাকিটা আমি করে দিয়েছি। কাল সকালেই সারা দেশে ওই মেয়ের খবর প্রচার হবে। তবে গিয়ে আমার গায়ের জ্বালা মিটবে।"

আশমিন শান্ত ভঙ্গিতে বেসিনে গিয়ে হাত ধুতে লাগল। বিয়ের কথা আর মুখেও আনবে না সে। আয়নায় একবার নিজেকে দেখে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নিজের রুমে গেল। বাইরে শৈতপ্রবাহ বইছে। ধীর পায়ে বারান্দায় গেল সে। শীতের একটা মিষ্টি সুবাস নাকে এসে বাড়ি দিয়ে যাচ্ছে। দুহাত পকেটে গুঁজে কনকনে ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। পিছনে এসে কখন আমজাদ চৌধুরী দাঁড়িয়েছেন, টের পায়নি সে। বেশিক্ষণ নীরব থাকতে পারল না। ঠান্ডায় জবুথবু হয়ে দাঁতে দাঁত সংঘর্ষ হওয়ার শব্দে আশমিন পিছু ঘুরল। গায়ে চাদর জড়িয়ে শীতে কাঁপা আমজাদ চৌধুরীকে দেখে হেসে ফেলল আশমিন। এক হাতে বাবাকে আগলে ধরে রুমে নিয়ে এলো।

"কখন এসেছ? কফি খাবে?"

আমজাদ চৌধুরী কাঁপতে কাঁপতে ডিভানে বসে বললেন, "এই তো এলাম। খাব, তাড়াতাড়ি বানাও।"

আশমিন হেসে ইলেকট্রিক কফি মেকার অন করল। রুম হিটারের টেম্পারেচার বাড়িয়ে দিয়ে আমজাদ চৌধুরীর মুখোমুখি বসল। রুম

টেম্পারেচার বাড়ায় এখন একটু আরাম লাগছে। আমজাদ চৌধুরী আরাম করে বসে ছেলের উদ্দেশে বললেন, "কী সিদ্ধান্ত নিলে?"

"আর বিয়ের কথা মুখেও আনব না। সিম্পল!"

আশমিনের গা ছাড়া জবাবে আমজাদ চৌধুরীর কপাল কুঁচকে গেল। এই ছেলের পেটে পেটে শয়তানি। এ পেটে থাকতে কামিনী চৌধুরী কেজিতে কেজিতে জিলাপি খেয়েছেন। ছেলের আর দোষ কী? সব অঘটন তো ওই ঘাড়ত্যাড়া মহিলাই ঘটিয়ে রেখেছেন। আমজাদ চৌধুরী মনে মনে হা-হুতাশ করলেন। তার এমন হ্যান্ডসাম ছেলে মায়ের মৃত্যু ঠেকাতে শেষে বৈরাগী হবে? জীবন-যৌবন বাতাসে উড়াবে! এ কী করে হয়? আমজাদ চৌধুরী ছেলেকে বোঝানোর জন্য মুখ খুলতেই আশমিন ঠান্ডা গলায় বলল, "কাল বিয়ে করতে যাচ্ছি, আব্বু। আম্মু বিয়ের কথা মুখে আনতে নিষেধ করেছে। করতে তো আর নিষেধ করেনি। তাই জরুরি কাজটা কালই সেরে ফেলব। আমার সাথে যাওয়ার জন্য রেডি থেকো।"

কথাগুলো বলতে বলতে আমজাদ চৌধুরীর দিকে কফির কাপ এগিয়ে দিলো আশমিন। আমজাদ চৌধুরীর হতভম্ব মুখে কাপ নিলেন। নিজেকে সহস্র গালি দিলেন নিজের বোকা বোকা ভাবনার জন্য। এ ছেলে হবে বৈরাগী? হুঁহ! তবেই হয়েছে। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতেও ভুললেন না তিনি।

আশমিন কফির কাপে চুমুক দিয়ে আমজাদ চৌধুরীর দিকে তাকাল। তাঁকে এভাবে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে পুনরায় বলল, "কী হলো? কিছু বলছ না যে?"

"রাফসান রাজি হবে না। তোমার আম্মু যা ঘটিয়ে এসেছে, তাতে রাফসান কখনোই তার মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দেবে না।"

"আমি নুরকে ভালোবাসি, আব্বু। ভবিষ্যতে এমন কিছু নুরের সাথে হবে না। আশমিন জায়িন চৌধুরীর স্ত্রীর দিকে চোখ তুলে কথা বলার সাহস কার আছে?"

"তুমি গ্যারান্টি দিতে পারো এমন কিছু হবে না? নুরকে হেনস্তা করেছে স্বয়ং তোমার মা। তাকে একবারও প্রশ্ন করেছ সে কোন অধিকারে নুরের পরিবারের সাথে এমন অসভ্যের মতো আচরণ করেছে? শিকদার-বাড়িতে তোমার মা নয়, তুমিই বড়ো অপরাধী। কারণ সবকিছু তোমাকে ঘিরেই হয়েছে।"

আশমিন চুপ করে গেল। আমজাদ চৌধুরী এক আনাও মিথ্যে বলেননি। এই মুহূর্তে নিজেকে দিশেহারা লাগছে তার। নুর চুপ থাকবে না। নিজের পরিবারের অপমানের জবাব সে দেবে। আশমিন তা নিয়ে তখন থেকেই

চিন্তিত। এই মেয়েকে এক আনাও বিশ্বাস নেই। একেবারে ঝাল মরিচ। আশমিন গমগমে গলায় বলল, "এখানে বসে থেকে জনগণের কী উন্নয়ন করছ তুমি? আমার মতো সাধারণ জনগণের ভবিষ্যৎ তোমার স্ত্রী নিজ হাতে নষ্ট করে দিচ্ছে। সেদিকে খেয়াল আছে তোমার? পরের নির্বাচনে আমি তোমাকে ভোট দেবো না। এই মুহূর্তে গিয়ে নিজের বউকে শাসন করো। নরম গলায় ধমক দিয়ে বলবে, কামু বেবি, কাজটা ঠিক করোনি। ছেলের বউয়ের সাথে কেউ এমন করে? আজ থেকে তোমার সাথে আড়ি। তারপর চুপচাপ পাশের রুমে শিফট হয়ে যাবে। না-হলে আমি আম্মুকে তোমার লেইট নাইট পার্টির ব্যাপরটা ফাঁস করে দেবো।"

আমজাদ চৌধুরী হতভম্ব হয়ে গেলেন। অসভ্য ছেলেকে চড়িয়ে গাল লাল করতে ইচ্ছে হলো তাঁর। তবে ছেলেকে ঘাঁটালেন না তিনি। পাছে আবার তাঁকেই হেনস্তা করে ছাড়ে। নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন শুধু।

আশমিনের ফোন বেজে উঠল। ঘড়ির কাঁটা একটার ঘরে। আশমিন ভ্রু কুঁচকে বেড সাইড টেবিলে রাখা ফোনের দিকে তাকাল। খালি কফির কাপটা রেখে ফোনের দিকে এগিয়ে গেল সে। স্ক্রিনে পরিচিত নাম্বারটা দেখে দ্রুত কল রিসিভ করল সে। ওপাশে সানভির ভয়ার্ত গলা, "স্যার, শিকদার-বাড়িতে কিছু বাইরের ছেলে ঢুকেছে। তাদের কাছে দেশি অস্ত্রও আছে।"

আশমিন বিচলিত হলো। সবসময়ের শান্ত খোলস ছেড়ে বেরিয়ে চিৎকার দিয়ে বলল, "দলের ছেলেদের খবর দাও, সান। এই মুহূর্তে শিকদার-বাড়িতে হাজির হতে বলো। আর একটা বাজে খবরও যেন আমার কানে না আসে। ওদের বলে দাও, শিকদার-বাড়ি থেকে একটা মশাও যেন বের হতে না পারে।"

রাগে আশমিনের হাত-পা কাঁপছে। এত বড়ো বুকের পাটা কার সেও দেখবে। দ্রুত ফোন কেটে মানিব্যাগ পকেটে ঢুকাল সে। আমজাদ চৌধুরী আন্দাজ করতে পারছেন কী হয়েছে। ছেলের এই রাগের সাথে তিনি পরিচিত। আশমিনের জন্য কষ্ট হলো তাঁর। কয়েক মিনিটে চৌধুরী-বাড়ি সজাগ হয়ে গেছে। আশমিনের চিৎকার শুনে বাহাদুর ছুটে এসেছে। বাড়ির কয়েকজন গার্ডও দরজার সামনে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে। কামিনী চৌধুরী হন্তদন্ত হয়ে ছেলের কাছে এলেন। বিচলিত গলায় বললেন, "কী হয়েছে, আব্বু? এভাবে রেগে আছ কেন?"

আশমিন রক্তাক্ত শীতল চোখে তাকাল মায়ের দিকে। কামিনী চৌধুরী ভড়কালেন। ছেলের গায়ে হাত বুলিয়ে নরম গলায় বললেন, "কী হয়েছে, বাবা? এমন দেখাচ্ছে কেন তোমাকে? আম্মুকে বলো।"

"শিকদার-বাড়িতে অস্ত্র হাতে কয়েকজন অপরিচিত লোক ঢুকেছে, আম্মু। এ ব্যাপারে তুমি কি কিছু জানো?"

কামিনী চৌধুরীর কপালে ভাঁজ পড়ল। এ বিষয়ে তার কোনো ধারণা নেই। তিনি তো শুধু সমাজে ওদের বদনাম করতে চেয়েছিলেন। তাই করিমন বিবিকে সব শিখিয়ে দিয়ে এসেছেন। এই অস্ত্রওয়ালা লোক আবার কারা? কামিনী চৌধুরী কপাল কুঁচকে সুমা সিদ্দিক আর লারার দিকে তাকালেন। লারা ভয়ার্ত চোখে আশমিনকে দেখছে। আশমিন সূক্ষ্মভাবে সবটা লক্ষ করল। সে গাড়ি গ্যারেজ থেকে বের হওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

আমজাদ চৌধুরী চুপচাপ বসে পেপার পড়ছেন। মুন্সিগঞ্জ সদর থানায় কল করেছেন তিনি। এতক্ষণে পুলিশ হয়তো পৌঁছে গেছে। সানভিও হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে। দুই গলি পরে আশমিনদের ছোটো একটা পুরোনো বাড়ি আছে। এ বাড়ি করার আগে সেখামেই থাকত তারা। এখন সেখানে সানভি থাকে। উত্তেজনায় শীতের কাপড় পড়ে আসতে ভুলে গেছে সে। কাঁপাকাঁপিতে দাঁড়াতে পারছে না। সামনে দণ্ডায়মান বাহাদুরকে দেখে তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল সে।

আশমিনের রাগী মুখ দেখে নতুন করে হাঁটু কাঁপুনি শুরু হলো তার। আশমিন শীতল চোখে তাকাল সুমা সিদ্দিক আর লারার দিকে। কারও শীতল দৃষ্টিও যে এভাবে ঘাম ছুটিয়ে দিতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবেননি সুমা সিদ্দিক। তিনি কাঁপা হাতে কপালের ঘাম মুছলেন। মিজু সিদ্দিকের প্রেশারের সমস্যা আছে। তিনি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাচ্ছেন। তাই এত শোরগোলেও জেগে ওঠেননি। ড্রাইভার এসে বলল, "স্যার, গাড়ি রেডি।"

আশমিন বের হওয়ার আগে বাহাদুরকে বলল, "আমার সত্যিটা চাই, বাহাদুর। কীভাবে বের করবে তুমি ভালো জানো।"

এবার আমজাদ চৌধুরী মুখ খুললেন। পেপার ভাঁজ করতে করতে বললেন, "বাহাদুর তোমার সাথেই যাবে, আশমিন। একা বের হওয়ার কথা চিন্তাও করো না।"

আশমিন কিছু বলতে গিয়েও বলল না। সুমা সিদ্দিকের দিকে তাকিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল। বাহাদুর-সহ আরও পাচজন অস্ত্রধারী গার্ডও গেল

তার সাথে। কামিনী চৌধুরী স্বামী আর ছেলের কর্মকাণ্ড দেখে বিরক্ত হলেন। আমজাদ চৌধুরীর কাছে গিয়ে রাগী গলায় বললেন, "ছেলেকে না আটকে এভাবে যেতে দিলেন কেন? ওই মেয়ের বাড়িতে কে এলো না এলো তাতে আমাদের কী? মেয়ের তো আর গুণের শেষ নেই। কোন নাগর এসে হাজির হয়েছে কে জানে।"

আমজাদ চৌধুরী পেপার রেখে উঠে দাঁড়ালেন। গায়ের পাঞ্জাবি টেনে সোজা করে হাসিমুখে বললেন, "তাহলে তো তোমারই লাভ হলো কামিনী। ছেলে সবকিছু নিজের চোখে দেখে তোমার কোলেই ফিরে আসবে।"

আমজাদ চৌধুরী হাসতে হাসতে রুমে চলে গেলেন। কামিনী চৌধুরী অস্থির হয়ে উঠলেন। তার মন বলছে আজ কোনো অনর্থ হবে!



দরজায় করাঘাতের শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে রাফসান শিকদারের। আজ সারাদিন এত কিছু ঘটে যাওয়ার পর তাঁর চোখে গভীর ঘুম ধরা দিচ্ছে না। মেয়ের জীবন নিয়ে উদ্‌বিগ্ন তিনি। তার ওপর মাঝরাতে দরজায় করাঘাতে বিচলিত হলেন তিনি। কম্বলের নিচ থেকে বের হতেই নাফিজা শিকদার ঘুমঘুম চোখে বললেন, "এত রাতে দরজায় কে এলো?"

রাফসান শিকদার গায়ে চাদর জড়াতে জড়াতে বললেন, "দেখি কে এলো, তুমি ঘুমাও।"

নাফিজা শিকদার লাফিয়ে উঠলেন। রাফসান শিকদারের সাথে পায়ে পা মিলিয়ে বাইরে এলেন তিনি। এর মধ্যেই অমি আর নুর তাদের রুম থেকে বেরিয়ে এসেছে। দরজায় করাঘাত বেড়েই চলেছে। অমি রাফসান শিকদারকে দরজা খুলতে বাধা দিয়ে ভেতরের দরজা দিয়ে বারান্দায় চলে গেল। বারান্দার এক পাশে ছোটো একটা কামরা আছে। জানালা খুললে সদর দরজার বাইরের অংশ সম্পূর্ণটা দেখা যায়। অমি হালকা পর্দা ফাঁক করল। কুয়াশার জন্য জানালার কাচ ঘোলা হয়ে আছে। ঘন কুয়াশার দরুন চারিদিকে কিছুই স্পষ্ট নয়। দরজায় আপদমস্তক ঢেকে কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। মুখগুলোও কাপড় দিয়ে ঢাকা। রাজনীতিতে যুক্ত থাকায় অমির এই সাজসজ্জা সম্পর্কে ধারণা আছে। তাদের সামনে ঘোর বিপদ তা বুঝতে অসুবিধা হলো না। পর্দা সরিয়ে দ্রুত পায়ে ভেতরে এলো সে। মা আর বোনের হাত ধরে বাবা-মায়ের রুমে নিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলো। নুর আর নাফিজা শিকদার অস্থির হয়ে বারবার দরজা ধাক্কা দিচ্ছেন।

"অমি, দরজা লাগালি কেন? দরজা খোল। কে এসেছে বাইরে? দরজা খোল, বাবা।"

নাফিজা শিকদার পাগলের মতো দরজায় করাঘাত করে অমিকে ডাকছেন। অমি বাইরে থেকে ধীর গলায় বলল, "চ্যাঁচামেচি করো না, আম্মু। ঘরে তোমার যুবতি মেয়ে আছে। একটা ভুল পদক্ষেপ সারাজীবনের জন্য বিপদ বয়ে আনতে পারে। ভেতর থেকে দরজা ভালো করে বন্ধ করে দাও। যা-ই হয়ে যাক না কেন, দরজা খুলবে না।"

নুর কেঁদে ফেলল। ভাই আর বাবার জন্য আর্তনাদ করে বলল, "দরজা খোলো, ভাইয়া। তোমাদের কিছু করে ফেলবে ওরা। দরজা খুলে দাও। মরতে হলে সবাই একসাথে মরব।"

নাফিজা শিকদার আহাজারি করতে করতে বললেন, "আমাকে বের হতে দে, বাবা। এমন পাগলামি করিস না। তোর বাবাকে বল সদর দরজা না খুলতে। অমি, বাবা, দরজা খুলে দে।"

আশিয়ান ঘুম থেকে উঠে এসেছে। সে ভয়ার্ত মুখে বাবার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অমি রাফসান শিকদারের শুকিয়ে যাওয়া পাংশুবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে অভয় দিয়ে বলল, "ভয় পেয়ো না, আব্বু। আমি আমার বন্ধুদের ম্যাসেজ করেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা চলে আসবে।"

ঘরের ভেতরের কথাবার্তা শুনে বাইরে থেকে একজন বলল, "শিকদার চাচা, আমি রামের গাঁয়ের চান মিয়াঁ। বড়ো বিপদে পইড়া আপনের বাড়ি আইছি। ইট্টু দরজাডা খোলেন।"

রাফসান শিকদার মনে করার চেষ্টা করলেন। চান মিয়াঁ নামক কাউকে তিনি চিনেন বলে মনে হচ্ছে না। তিনি শক্ত গলায় বললেন, "যে দরকারই হোক। সকালে আসবেন। এখন দরজা খোলা যাবে না।"

লোকগুলো থামল না। বারবার আকুতিমিনতি করতে লাগল। রাফসান শিকদারের মন নরম হলো। সত্যি কেউ বিপদে পড়েছে ভেবে দরজা খোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। অমির বাধা উপেক্ষা করেই দরজা খুলতে গেলেন তিনি। ভেতর থেকে নুর আর নাফিজা শিকদারের কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। আশিয়ান ভয়ার্ত চোখে বন্ধ দরজার দিকে তাকাল। অমি হাতের কাছে শক্ত কাঠের একটা লাঠি এগিয়ে রাখল। বিকেলে বের করে আনা দা-টা এখনো সোফার নিচে আছে। নুর আশিয়ানের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সেখানেই রেখেছে। আশিয়ান সেদিকে একবার চোখ বুলাল। রাফসান শিকদার ততক্ষণে দরজা খুলে দিয়েছেন। দরজা খোলার সাথে সাথেই হুড়মুড় করে একসাথে সাত-আটজন ছেলে ভেতরে ঢুকে গেল। তাদের কয়েকজনের হাতে বড়ো বড়ো দা। অমি দৌড়ে গিয়ে রাফসান শিকদারের পাশে দাঁড়াল। তাদের ভেতর থেকে একজন ধাক্কা দিয়ে অমিকে সরিয়ে দিলো রাফসান শিকদারের কাছ থেকে। দুজন সাথে আনা দড়ি দিয়ে সাথে সাথেই অমির হাত-পা বেঁধে ফেলল। আশিয়ান কাঠের লাঠি নিয়ে মারতে আসলে তাকে ধরে ফেলল একজন। হতভম্ব রাফসান শিকদার ছেলেদের এমন দশা দেখে ঘাবড়ে গেলেন। ভয়ার্ত গলায় বললেন, "কে তোমরা? কী চাও? আমার ছেলেদের

বাঁধছ কেন? দেখো, টাকা পয়সা যা লাগে নিয়ে যাও। আমার ছেলেদের কোনো ক্ষতি করো না।"

ওদের মধ্য থেকে একজন কিটকিটিয়ে হেসে উঠল। বিশ্রী ভঙ্গি করে বলল, "তোর পোলাগো এমনেও আমাগো দরকার নাই। দরকার তোর মাইয়ারে। হুনলাম মাগির খুব তেজ। হের লাইগাই তো দল বাইন্দা আইলাম। আউজকা হগলে মিল্লা মাগির তেজ কমাইম। বাইর কইরা আন মাগিরে।"

মেয়ের সম্পর্কে এমন অশোভনীয় ভাষা সহ্য হলো না রাফসান শিকদারের। তেড়ে গিয়ে ওই অসভ্যের নাক বরাবর ঘুসি মেরে বসলেন। কলার ধরে আরও কয়েক ঘা লাগাতেই ওদের সাথে থাকা কয়েকজন ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর। ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে মুহূর্তেই রক্তাক্ত করে ফেলল তাঁকে। আশিয়ানের "আব্বুকে মেরো না" বলে চিৎকার করা আহাজারি কারোর কানেই পৌঁছাল না। শক্ত হাতের বাঁধন থেকে মুক্ত হতে ছটফট করতে লাগল সে। বন্ধ রুমে নাফিজা শিকদার আর নুরের নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গেল। নুর ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অনবরত দরজা ধাক্কাতে লাগল।

"আব্বুকে ছেড়ে দাও। কে কোথায় আছ? আমার আব্বুকে বাঁচাও! ওরা আমার আব্বুকে মেরে ফেলল। ভাইয়া, আব্বুকে বাঁচাও।"

বন্ধ দরজার ভেতর থেকে একের পর এক আহাজারি ভেসে আসছে। নাফিজা শিকদার মেয়েকে টেনে সরিয়ে ভেতর থেকেও দরজা বন্ধ করে দিলেন। এদিকে অমি-আশিয়ান হাত-মুখ বাঁধা। অমি গলাকাটা মুরগির মতো ছটফট করছে। বাবার রক্তে তার পায়ের কাছটা ভেসে যাচ্ছে। এত রক্ত দেখে মাথা ঘুরে উঠল আশিয়ানের। সেখানেই ঢলে পড়ল সে। তাকে ধরে রাখা অমানুষটা হো-হো করে হেসে ছেড়ে দেওয়া দেহটা থেকে হাতের বাঁধন আলগা করল। পা দিয়ে ঠেলে তার নিথর শরীরটা দূরে সরিয়ে দিলো সে। রক্তাক্ত রাফসান শিকদারের দেহটা সদর দরজায় পড়ে আছে। অমি চিৎকার করে কাঁদছে। মুখ কাপড় দিয়ে বাঁধা থাকায় তার চিৎকার গোঙানির মতো বের হচ্ছে। কপালের শিরা-উপশিরা ফুলে উঠেছে তার।

রাফসান শিকদারের দিকে তাকিয়ে একজন চিন্তিত গলায় বলল, "খুন করার কতা আছিল না, বড়ো ভাই। হুদাই ঝামেলা বাড়াইলেন। কেস-মামলা কতকিছু অইব নে।"

লিডার গোছের লোকটা নিশ্চিন্ত গলায় বলল, "আরে ধুর, কিছুই অইব না। কেস-মামলা অইলে চৌধুরীরা সামলায় নেব। এইসব কামে দুই একটা খুন-খারাবি অয়। আমরা আইলেই তো আর মাইয়ার বাপ-ভাই আমাগো

আতে মাইয়া তুইলা দিব না। হেগো লগে আতায়াতি অইলে এমন খুনখারাবি অইবই। মাইয়া কই, হেইডা দেখ।"

নাফিজা শিকদার চুপ করে গেছেন। কান্নারত নূরের মুখ চেপে ধরে রেখেছেন তিনি। মনে মনে আল্লাহকে ডাকছেন। যাতে তার মেয়ের কোনো ক্ষতি না হয়। এতটা মনের জোর এই মুহূর্তে কোত্থেকে এসেছে জানেন না তিনি। শুধু এতটুকু জানেন, মেয়েকে বাঁচাতে হবে।

নাফিজা শিকদারের রুমে বড়ো একটা নকশা করা কাঠের বাক্স আছে। আগের দিনে এই বাক্সে কাপড় রাখত নারীরা। নাফিজা শিকদার তাঁর দাদি শাশুড়ির স্মৃতি হিসেবে এটা নিজের রুমেই রেখেছিলেন। বাক্সের উপরে বিভিন্ন ধরনের ল্যাম্প রেখেছেন তিনি। দ্রুত হাতে সেগুলো সরিয়ে কাঠের ঢাকনা খুললেন তিনি। কান্নারত নূরকে সেখানে ঢুকতে বললে নূর সাথে সাথে অসম্মতি জানাল। তিনি বললেন, "এমন করিস না, মা। মেয়েদের একমাত্র সম্পদ তাদের সম্ভ্রম। ওরা সেটাই নষ্ট করতে এসেছে। আমার কথা শোন, মা। এখানে লুকিয়ে থাক। ওরা চলে গেলেই বেরিয়ে আসিস। কথা বাড়াস না, নূর।"

নাফিজা শিকদারের আকুতি-মিনতি কিছুই শুনল না নূর। এক ছুটে ভেতর থেকে দরজা খুলে দিলো সে। তখনই বাইরে থেকে একজন দরজার ছিটকিনি খুলল। নূর এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দৌড়ে গিয়ে সোফার নিচ থেকে দা বের করল। কারও দিকে না তাকিয়ে সামনে যাকে পেল এলোপাতাড়ি কোপাতে লাগল। নাফিজা শিকদার দরজার কাছেই ধপ করে বসে পড়েছেন। খানিক দূরে রাফসান শিকদারের রক্তাক্ত দেহখানা পড়ে আছে। সেদিকেই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি।

নূরের এলোপাতাড়ি আঘাতে দুজন গুরুতর আহত হলো। একজনের ডান হাতের একটা আঙুল হাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিচে পড়ে গেছে। নূরের এমন রূপ দেখে ভড়কে গেল তারা। অতর্কিত আঘাতে কয়েক কদম পিছিয়ে গেল সবাই। বাইরেও মানুষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। নূরের বাহু আর পিঠ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। তারাও আঘাত করতে পিছ পা হয়নি নূরকে। তাদের দৌড়ে সদর দরজার দিকে যেতে দেখে নূর দ্রুত পায়ে গিয়ে অমির হাতের বাঁধন খুলল। হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে রাফসান শিকদারের মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিল সে। চিৎকার করে কেঁদে উঠল "আব্বু" বলে। কাঁপা কাঁপা রক্তাক্ত হাতটা বাবার নাকের কাছে নিয়ে দেখল শ্বাস খুব ক্ষীণভাবে পড়ছে। অমি পড়িমরি করে এসে বাবার শরীরটা বুকের সাথে চেপে ধরল। নূর চিৎকার করে তার মাকে ডেকে বলল, "আম্মু, আব্বুর শ্বাস চলছে, আব্বুর শ্বাস চলছে! আব্বুকে হাসপাতাল নিয়ে যেতে হবে, আম্মু।"

নাফিজা শিকদার শুনলেন না। তিনি আগের মতোই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাফসান শিকদারের নিথর দেহের দিকে।

কয়েকজন দ্রুত পায়ে ভেতরে ঢুকল। অমির স্কুল জীবনের বন্ধু তারা। বাসা কিছুটা দূরে হওয়ায় আসতে দেরি হয়েছে। আশেপাশের প্রতিবেশীরাও ছুটে এসেছে। যারা নুরদের বাড়িতে এসেছিল তারা আসলে ডাকাত। আহত দুজন ধরা পড়েছে। বাকিরা পালিয়ে গেছে। তাদেরকে আটক করে গণধোলাই দেওয়া হচ্ছে।

অমি তার বন্ধুদেরকে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে বলল। রাফসান শিকদারকে দ্রুত হাসপাতাল নিতে হবে। প্রতিবেশী কয়েকজন এসে আশিয়ানের চোখেমুখে পানি দিয়ে জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করছে। কয়েকজন মহিলা নাফিজা শিকদারকে দরজা থেকে তুলে এনে সোফায় বসিয়েছে। পাশের বাসার একরাম উদ্দিন দ্রুত গিয়ে গ্রামের এক ডাক্তারকে ধরে এনেছেন। তিনি এসে রাফসান শিকদারের পালস চেক করে বললেন, দ্রুত হাসপাতাল নিতে হবে। পালস রেট কম। পেটের কাছে গভীর ক্ষত দেখে তিনি নুরকে একটা ওড়না আনতে বললেন। নুর বাবার মাথাটা অমির কোলে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে ওড়না নিয়ে এলো। তিনি আঘাতের জায়গাটা শক্ত করে বেঁধে দিলেন, যাতে রক্ত পড়া আপাতত বন্ধ হয়।

কয়েক মিনিটে পুলিশও হাজির হয়েছে সেখানে। আমজাদ চৌধুরীর ফোন পেয়েই তারা ছুটে এসেছে। ডাকাত দুজনই গণপিটুনিতে মারা গেছে। পুলিশ সবাইকে সরিয়ে তাদের মরদেহ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করল। এত রাতে কোথাও গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না দেখে পুলিশের গাড়িতে করেই রাফসান শিকদারকে হাসপাতাল নেওয়া হলো। ঘটনাগুলো এত দ্রুত ঘটল যে, সবকিছু নূরের কাছে স্বপ্ন মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে ঘুম ভেঙে গেলেই সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আমজাদ চৌধুরীর দলের ছেলেরা ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছে। পুরো গ্রাম একসাথে জড়ো হয়ে গেছে। নুর রক্তাক্ত অবস্থায় সদর দরজায় বসে আছে। কেউ তার ক্ষত খেয়াল করেনি। হাঁটু সমান লম্বা চুলগুলো অবিন্যস্তভাবে ছড়িয়ে আছে। সবার উৎসুক চোখ নুরের দিকে। তার এই বিধ্বস্ত রূপ মানুষের মধ্যে গুঞ্জন তৈরি করল। বিকালে অভিশাপ দেওয়া করিমন বিবিও আসতে ভুল করেনি। মানুষের সাথে রসিয়ে রসিয়ে গল্প করছে সে, "আমার অভিশাপ বিফল অয় না। নিজের চউক্কে দেইক্কা লও বেকতে।

কইছিলাম না ঠাডা পড়ব। ঠিকই পড়ছে। ওই মাইয়ারে এমনেই ছাইড়া দিছে মনে করছ? আকাম কইরাই ছাড়ছে। হাল দেকলেইত্তো সব বোঝা যায়।"

কয়েকজন করিমন বিবির সাথে তাল মেলাল। স্বাভাবিকভাবেই নেতিবাচক কথা মানুষের মস্তিষ্ক খুব সহজে গ্রহণ করে নেয়। নুরের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হলো না। রাফসান শিকদারের চাচাতো ভাইয়েরা সবাই অন্য থানায় থাকেন। তাঁরা রওনা হয়ে গেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাবেন হয়তো। নাফিজা শিকদারের ভাইয়েরা এসেই হাসপাতাল ছুটেছেন। নূরের বড়ো মামি নুরকে ডেকে ঘরে নিতে চাইলেন। নুর এক চুলও নড়ল না। সে অবিচল সেখানেই বসে রইল। তার কানে শুধু একটা কথাই বাজছে, "চৌধুরীরা সামলায় নিব।"

ডাকাতদের মারার ঘটনা নাফিজা শিকদার আর অমি ছাড়া আর কেউ জানে না। আশিয়ানের প্যানিক অ্যাটাক হয়েছে। ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে তাকে।

আশমিনের গাড়ি শিকদার-বাড়িতে পৌঁছল ভোর রাতে। তখনও শিকদার-বাড়িতে পা ফেলার জায়গা নেই। সকাল হতে হতে লোকজনের আনাগোনা বেড়েই চলেছে। আশেপাশের গ্রাম থেকেও মানুষ ছুটে আসছে। রাফসান শিকদার সজ্জন লোক। তার ওপর হওয়া হামলায় সবাই স্তব্ধ বনে গেছে। চারদিকে ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে।

আশমিন আর সানভি দ্রুত গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। আশমিনের শ্বাস-প্রশ্বাস গলায় এসে আটকে আছে। বাহাদুর-সহ অস্ত্রধারী আরও কয়েকজন গার্ড তার পেছনে দাঁড়াতেই সবাই রাস্তা ফাঁকা করে দিলো। শীতের প্রকোপে সবার অবস্থা নাজেহাল। আশমিন সেদিকে ধ্যান দিলো না। সে একদৃষ্টিতে সদর দরজায় বসে থাকা রক্তাক্ত নুরের দিকে তাকিয়ে রইল। হালকা মেরুন রঙের জামায় রক্ত শুকিয়ে কালো রং ধারণ করেছে। নুর আশমিনকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার ধারালো দৃষ্টি আশমিনের দিকে স্থির রেখে সুদীর্ঘ লম্বা চুলগুলো দুই হাতে প্যাঁচিয়ে খোঁপা করে নিল সে। শীতের এই ভয়ংকর ভোরে আশমিন আবার প্রেমে পড়ল। তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ডাকাত রানির প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে মুহূর্তে নিজের হার্ট অ্যাটাক করিয়ে ফেলতেও পিছ পা হবে না সে। মুহূর্তেই দাঁড়িয়ে সে ঠিক করে ফেলল, নুরকে সে রানি— চৌধুরানি ডাকবে।

আশমিন সামনে এগিয়ে যেতেই সানভির হৃৎপিণ্ড থেমে গেল। এই মেয়ে নাকি ডাকাতদের কুপিয়ে জখম করে দিয়েছে। এ তো ভয়ংকর মেয়েমানুষ! তার স্যারকে আবার মেরে দেবে না তো? দিতেও পারে। সব নষ্টের গোড়া তো তার স্যারই। মেয়েটারই-বা কী দোষ? প্রত্যেকটা মানুষের দুর্বলতা হচ্ছে তাদের পরিবার। দুর্বলতায় আঘাত করলে ছেড়ে কথা বলবে কেন? সানভি ঠিক কার দলে সে নিজেও ঠিক করতে পারল না। তাই সে নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নিল। দুজন মারামারি করে হসপিটাল চলে গেলেও সে বাধা দেবে না। কারণ সে অতীব সাধারণ জনগণ। জনগণের দেখা ছাড়া আর করার কিছুই নেই। সেও না-হয় একজন দায়িত্বশীল জনগণের মতো সোশ্যাল মিডিয়ায় একটু হা-হুতাশ করে আসবে। এ আর এমন কী? নিজের চিন্তাভাবনাগুলো বগলদাবা করে আশমিনের পিছু ছুটল সে।

আশমিন সোজা এসে নুরের হাত ধরে তাকে ভেতরে নিয়ে গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সবার চোখ ছানাবড়া হয়ে বেরিয়ে আসার জোগাড়। মুখরোচক আলোচনার বিষয়বস্তু পেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলল অনেকে। তাদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল। নাফিজা শিকদার আগের মতোই স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। স্বামীর এই পরিণতি দেখে শোকে স্তব্ধ হয়ে গেছেন তিনি। কথা বলে অনেকেই তাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে। ঘরের ভেতরে মহিলারা গিজগিজ করছে। আশমিন সদর দরজা পার হয়ে দুবার দরজায় নক করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এমপির ছেলেকে অনেকেই সামনাসামনি দেখেনি। তাই তারা চিনতে পারল না। তবে যারা চিনে তারা মুহূর্তেই সেখান থেকে সরে পড়ল। বাকিরা কৌতূহলী হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। আশমিন গম্ভীর গলায় বলল, "পরিবারের সদস্য ছাড়া বাকি সবাই বাইরে যান। এখানে ভিড় করবেন না। উনি অসুস্থ।"

ব্যস, আশমিন নিজের কথার ইতি টেনে বাহাদুরকে ইশারা করল। সে জানে, এরা সহজে এখান থেকে নড়বে না। বাহাদুর-সহ কয়েকজন দূরত্ব রেখে সবাইকে বের করতে তৎপর হলো। মিনিট দুয়েকের পর ঘর মোটামুটি ফাঁকা হয়ে গেল। আশমিন সোজা গিয়ে সোফায় বসল। নুর আগের মতোই দাঁড়িয়ে আছে। ভেজা চোখে চোয়াল শক্ত করে এক দৃষ্টিতে আশমিনের দিকে তাকিয়ে আছে সে। যেন চোখ দিয়েই এই মুহূর্তে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে সামনে বসে থাকা নির্বাক এই পুরুষকে। আশমিন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। পরিস্থিতি অনেক জটিল আকার ধারণ করেছে। সময় নিজের ভাগ্যের উলটো দান দিয়ে দিয়েছে। সবকিছু যেন শুকনো বালির মতো হাত থেকে ফসকে যাচ্ছে তার।

নুরের মামিরা কপাল কুঁচকে আশমিনকে দেখছে। আশমিন জায়িন চৌধুরীর নাম লোকমুখে পরিচিত হলেও সামনাসামনি অনেকেই তাকে চিনে না। তারাও তাদের দলে। আশমিন ভণিতা না করে সোজা কথায় চলে গেল, "শিকদার আংকেল ভালো আছেন, আলহামদুলিল্লাহ। তাকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চিন্তা করবেন না আপনারা।"

সবাই যেন একটু নিশ্চিন্ত হলো। এতক্ষণ শক্ত চোখমুখ বানিয়ে রাখা নুর বাবার ভালো থাকার খবর শুনেই শরীর ছেড়ে দিলো। ধপ করে বসে পড়ল নিচে। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল সে। নাফিজা শিকদারের কোনো হেলদোল নেই। তিনি আগের মতোই শান্ত নদীর ন্যায় স্থির। ভালোবাসে বিয়ে করেছিলেন এই দম্পতি। প্রণয়ের পরিণয় এত সহজ ছিল না তাঁদের জন্য। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল তাঁদের। আত্মীয়ের মধ্যে সম্পর্ক দুই পরিবারের কেউই মেনে নিচ্ছিল না। রাফসান শিকদার তাঁর মাকে সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, "নাফিজাকে না পেলে এ জীবন রাখব না, আম্মা। পৃথিবীতে এসেছি মানুষের মতো বাঁচতে। ভালোবাসার মানুষকে হারিয়ে খড়কুটোর মতো বেঁচে থেকে জীবন নষ্ট করার কোন মানে হয় না।"

ছেলে অন্তঃপ্রাণ মাকে আর দ্বিতীয়বার কিছু বলতে হয়নি। পরের জুম্মায় নাফিজা শিকদারকে বউ করে ঘরে তুলেছেন তিনি। এত বছরের দাম্পত্য জীবনে দুজনের মধ্যে কখনো মন কষাকষি হয়নি। সেই স্বামীর রক্তাক্ত নিথর দেহ সহ্য করার ক্ষমতা হয়নি তাঁর। আশমিন মনে মনে অপরাধবোধে ভুগছে। নুরের অবস্থা দেখে তার কলিজা শুকিয়ে যাচ্ছে। বুকের ভেতর হিংস্র হায়েনারা খাবলে খাবলে রক্তাক্ত করছে অনবরত। কিন্তু সে প্রকাশ করতে ব্যর্থ। এ বাড়ির এই পরিণতি শুধু তার পরিবারের জন্য! এই একটা সত্যি তাকে হাজারবার খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খুন করছে। কীভাবে এই কলঙ্কমুক্ত হবে সে? সামনে অঝোরে কাঁদতে থাকা মেয়েটাকে কীভাবে বোঝাবে, সে কিছু করেনি? পুরোপুরি নির্দোষ সে। সে তো শুধু ভালোবাসেছিল। আনমনে চোখের কোল ভিজল তার। দাঁতে দাঁত চেপে উত্তাল ঢেউয়ের ন্যায় ধেয়ে আসা নোনাজল আটকে ফেলল নিজেকে। সানভি অসহায় চোখে শুধু আশমিনকে দেখছে। রক্তজবার মতো চক্ষুকোটরে বিষাদের অশ্রুর আনাগোনা খুব গোপনে টের পেল সে। মন খারাপের ছোঁয়াচে রোগ তাকেও গ্রাস করতে লাগল ধীরে ধীরে।

আশমিন শান্ত গলায় নুরের মামিদের উদ্দেশে বলল, "আন্টি ঠিক নেই। উনাকে রুমে নিয়ে শুইয়ে দিন। অনেক ধকল গিয়েছে উনার ওপর। কিছুক্ষণ রেস্ট নিলে আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যাবে আশা করছি।"

এমপির ছেলে নিয়ে গুঞ্জন তাদের কানেও এসেছে। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে তারা সব কিছু বুঝে নিল। আশমিনের কথামতো নাফিজা শিকদারকে রুমে নিয়ে গেল তারা। নুরের ছোটো মামি নুরকে তুলতে আসলেই আশমিন বাধা দিলো। একান্তভাবে নুরের সাথে কিছু কথা আছে বলে নাফিজা শিকদারের কাছে ভেতরে পাঠিয়ে দিলো তাকে।

আশমিন ধীর পায়ে এগিয়ে গেল নুরের দিকে। ঠান্ডা মেঝেতে জড়বস্তুর ন্যায় বসে থাকা নুরের সামনে আসন গেড়ে বসে নরম চোখে তাকাল প্রেয়সীর মুখের দিকে। সাথে সাথেই চোখ সরিয়ে চোরের মতো দৃষ্টি লুকাল। এই চেহারার মায়ায় তার হাজারবার মরণ হোক, মনে মনে প্রার্থনা করল সে। নুর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বাবার রক্ত এখনো তার হাতে লেগে আছে। এই রক্তের দাগ সারাজীবনেও মুছবে? কোন প্রায়শ্চিত্ত এই রক্তাক্ত হাত থেকে মুক্তি দেবে তাকে?

আশমিন মাথা নিচু করে শান্ত গলায় বলল, "আমি তোমাদের অপরাধী। কী শাস্তি দিতে চাও?"

নুর চোখ তুলে তাকাল। সরাসরি আশমিনের চোখে তাকিয়ে রইল কয়েক পলক। সকাল থেকে ঘটা সমস্ত ঘটনা একে একে ভেসে উঠল মানস্পটে। চোখের পলকে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটা নিল সে। স্পষ্ট গলায় আশমিনের চোখে চোখ রেখে বলল, "বিয়ে করুন আমাকে। আপতত এর চেয়ে বড়ো শাস্তি আপনার জন্য কিছুই নেই।"

আশমিন চমকাল না। ভড়কালও না। নুরের চোখে চোখ রেখে নির্মল গলায় বলল, "মেনে নিলাম। তুমি নামক শাস্তি আমি স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করলাম।"

নুর শব্দ করে হাসল। হাসতে হাসতেই তার চোখ থেকে বিষাদের অশ্রু মুক্তি পাওয়ার আনন্দে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। জোর করে বসিয়ে রাখা দেহখানা ঢলে পড়তেই খপ করে হাত ধরে আটকে দিলো আশমিন। তার ওই সুন্দর চোখে দুশ্চিন্তার আনাগোনা বড্ড আরাম দিলো নুরকে।

"আমি আপনার শাস্তির কারণ হওয়ার স্বপ্ন দেখেছি কত রাত। অথচ আপনি আমায় নিজের শাস্তি বলে কবুল করলেন? শাস্তিটা তো আমার ভাগেও সমান পড়ল। অথচ আমি একেবারেই নির্দোষ।"

কথার বিষবাণ ছুড়েই লুটিয়ে পড়ল নুর। ছোটো দেহখানা বুকে আঁকড়ে সেভাবেই বসে রইল আশমিন। অচেতন নুরের কানে ফিসফিস করে বলল, "আমার নির্দোষ হওয়ার খবর কবে তোমার কাছে পৌঁছাবে, আমার প্রাণ? আমি যে ভালোবাসার অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি। অথচ ভালোবাসা সবচেয়ে পবিত্র অনুভূতি। তোমাকে আমি প্রেমিকা হিসেবে চাওয়ার পাপটা অবধি করিনি। একেবারে পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্ত্রীর আসনে চেয়েছিলাম। আমায় বিশ্বাস করো!"

আশমিনের বুকভাঙা আকুতি সে পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রইল। কেউ জানল না, বুঝলও না। প্রচণ্ড শক্ত মনের পুরুষ এক অচেতন ললনার সামনে বুক ভরা আর্তনাদ নিয়ে নিজের নির্দোষ হওয়ার ফর্দ শুনিয়ে গেল।

হাতের তালুতে ভেজা ভেজা লাগতেই থমকে গেল আশমিন। কাঁপা কাঁপা হাতটা নুরের পিঠ থকে সরিয়ে চোখের সামনে আনতেই হৃৎপিণ্ডে হাজার হাজার বিষপিঁপড়া একসাথে কামড়ে ধরল। এতক্ষণ আটকে রাখা অশ্রুকণা এবার বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এলো। অসহায় চোখে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সানভির দিকে। সেই মুহূর্তে মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে তার। আশমিনের অসহায় চাউনি ভীত করে দিলো সানভিকে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো সে। আশমিনের রক্ত মাখা হাত দেখে চ্যাঁচিয়ে উঠল সে, "স্যার, ম্যাম আহত হয়েছেন হয়তো। দ্রুত হসপিটাল নিতে হবে তাঁকে। জলদি করুন।"

আশমিন নুরকে বুকে জড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। নুরের অচেতন দেহখানা কোলে তুলে নিয়ে ছুটল গাড়ির দিকে। পুলিশের উপস্থিতিতে মানুষের আনাগোনা বাড়ির ভেতরে কিছুটা কমেছে। আশমিনকে ছুটতে দেখে পুলিশও তার পিছনে ছুটল। বাহাদুর গাড়ির দরজা খুলেই দাঁড়িয়ে ছিল। আশমিন দ্রুত নুরকে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল। সানভি উঠতেই বাহাদুর গাড়ি স্টার্ট দিলো।

"দ্রুত চালাও, বাহাদুর।"

উৎসুক জনতা আশেপাশে ভিড় করেছে, পুলিশ ভিড় ঠেলে রাস্তা ফাঁকা করে দিলো। আশমিনের গাড়ি শিকদার-বাড়ি থেকে বের হতে নিলেই নুরের ছোটো মামি ছুটে এসে গাড়িতে উঠে বসল। তাকে দেখে আশমিন কিছুটা স্বস্তি পেল। নুরের মাথাটা তার কাঁধে রেখে অস্থির গলায় বলল, "দয়া করে একটু দেখুন, আরও কোথাও আঘাত পেয়েছে কি না?"

নুরের মামি দ্রুত চেক করল। ঘাড়ের পিছন দিকে অনেকটা কেটে গেছে। পিঠের আর হাতের ক্ষতগুলো অনেক গভীর। আশমিনকে জানাতেই আশমিন উদ্‌বিগ্ন হলো। অস্থির গলায় দ্রুত গাড়ি চালাতে বলল বাহাদুরকে।

সানভির ফোন বেজে উঠল তখনই। স্ক্রিনে অমির নাম্বার জ্বলজ্বল করছে। সানভি ঘাড় ঘুরিয়ে আশমিনের দিকে তাকাল। আশমিনের পৃথিবীর অন্য কিছুতে ধ্যান নেই। সে এক হাতে নুরকে আগলে ধরে আছে। অস্থির চোখে বারবার রাস্তায় চোখ বুলাচ্ছে। সানভি ফোনটা রিসিভ করে কানে ধরল।

"আব্বু নেই!"

সানভি থমকাল। ওপাশ থেকে অমির গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে। সানভির চোখ থেকে এক ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। বাহাদুর স্টেয়ারিং-এ হাত রেখে বারবার সানভির দিকে তাকাচ্ছে। ফোন কানে সানভিকে কাঁদতে দেখে হকচকিয়ে গেল সে। গাড়ির গতি কমিয়ে বিচলিত গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে, স্যার!"

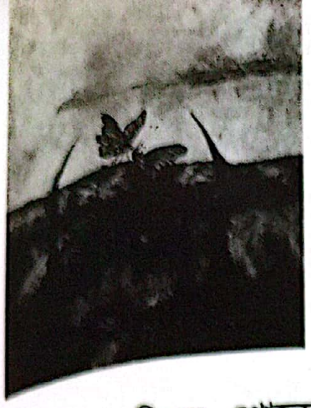
নুরের দিক থেকে চোখ সরিয়ে আশমিন সামনে তাকাল। সানভি ফোন কেটে জড়বস্তুর ন্যায় বসে আছে। সব কিছু বিষাদ লাগছে তার কাছে। প্রচণ্ড হাঁসফাঁস লাগছে তার। বুকের কাছের কয়েকটা বোতাম খুলে কাঁপা কাঁপা গলায় বাহাদুরকে বলল, "গাড়ি থামান, ভাই। আমি একটু নামব।"

আশমিন ধমকে উঠল। মেজাজ দেখিয়ে বলল, "পাগলের মতো কথা বলছ কেন, সান? নুরের অবস্থা দেখেছ? এই মুহূর্তে ওকে হসপিটাল নিতে হবে। গাড়ি দাঁড় করাবে না, বাহাদুর। চুপচাপ বসে থাকো, সান। আর একটা কথাও শুনতে চাই না।"

ছোটো মামি বিরক্ত চোখে সবাইকে দেখছেন। নিঃসন্তান এই নারী নুরকে অসম্ভব ভালোবাসেন। এমপির ছেলে বলে আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে পারছেন না। না-হলে এক থাপ্পড়ে দাঁত কপাটি খুলে নিতেন তিনি। এই ছেলেই সব নষ্টের গোড়া। এখন তাদের মেয়েটাকে নিয়ে তামাশা করছে। পাজির পা-ঝাড়া একটা! বদ বদ বদ, মনে মনে একশ গালি দিলেন তিনি। এরপর বাড়াবাড়ি কিছু দেখলে সব-কটাকে হাফপ্যান্ট পারিয়ে পুকুরে দাঁড় করিয়ে রাখবেন। দারোগার নাতনি তিনি। রক্ত বলেও একটা ব্যাপার আছে।

সানভি চুপ করে রইল। তবে অস্থিরতা কমল না তার। নিজের বাবার মুখটা বারবার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। বাবা ছাড়া জীবন, মাঝি ছাড়া নৌকার মতো। বাবার ছায়া একবার মাথার উপর থেকে সরে গেলে বোঝা যায় পৃথিবীতে টিকে থাকা কতটা কঠিন। বাবার মৃত্যুর সময় সে পাশে থাকতে পারেনি। এই কষ্ট ইহজনমে ভোলার নয়।

ইউনাইটেড হসপিটালে নূরকে আনা হয়েছে। কর্তব্যরত চিকিৎসক নূরের চিকিৎসা করছেন। আশমিন সর্বশান্ত পথিকের ন্যায় এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার সাদা পাঞ্জাবিতে রক্তের দাগ শুকিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগেই সানভি তাকে সবিস্তারে জানিয়েছে। তখন থেকেই একেবারে চুপ হয়ে গেছে সে। বাহাদুর আর সানভি তার আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। অতিরিক্ত মানসিক প্রেশারে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে যায়! ছোটো মামি গুনগুন করে কাঁদছেন। ছোটো মামা কল করে জানিয়েছেন তাকে। এক দিনের ব্যবধানে একটা হাসিখুশি পরিবারেকে ধ্বংস করে দিলো এরা! এদের কখনো ভালো হবে না। চৌধুরীদের অভিশাপ দিতে লাগল সে। নূরকে কীভাবে বলবে এই খবর? বাবা অন্তঃপ্রাণ মেয়েটা সহ্য করতে পারবে তো? চৌধুরীরা ধ্বংস হোক, ওদের অহংকারে পোকা পড়ুক। ভূমিকম্প এসে মাটির নিচে দাবিয়ে দিক ওদের। ঘৃণা ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে একের পর এক অভিশাপ দিতে লাগল আশমিনকে। আশমিন সেদিকে ধ্যান দিলো না। মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগল। নূরকে সামলাতে হবে। মেয়েটা তাকে সে সুযোগ দেবে তো? সেই তো তার বাবার খুনি। সব তো তার জন্যই হয়েছে। একটা সুখী পরিবারকে নিজ হাতে দাফন করল সে। নিজেকে অভিশপ্ত মনে হলো তার। মানুষের সংস্পর্শ থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হলো খুব। পাছে আর কেউ না তার জন্য ধ্বংস হয়ে যায়!



শিকদার-বাড়িতে শোকের মাতম চলছে। বাল্যবন্ধুর বিদায়বেলায় আমজাদ চৌধুরীও ছুটে এসেছেন। নিজ স্ত্রীর প্রতি ঘৃণায় গা গুলিয়ে আসছে তাঁর। নির্জীব দাঁড়িয়ে থাকা একমাত্র ছেলের দিকে তাকিয়ে বুকে চিনচিন ব্যথা হচ্ছে। এমপির আগমনে বাইরের মানুষের আনাগোনা খুব কম। পুরো বাড়ি পুলিশ ঘিরে রেখেছে। আত্মীয়স্বজন ছাড়া আর তেমন কাউকে আসতে দিচ্ছে না পুলিশ। রাফসান শিকদারের মরদেহ পোস্টমর্টেম করতে চেয়েছিল পুলিশ। অমির অনুরোধে তা আর হয়ে ওঠেনি। মৃত্যুর কারণ পানির মতো পরিষ্কার। নতুন করে জানার আর কিচ্ছু নেই। ভেতর থেকে ক্ষণে ক্ষণে নাফিজা শিকদারের বিলাপ ভেসে আসছে। মাটিতে শুইয়ে রাখা স্বামীর গায়ে পড়ে মাতম করে যাচ্ছেন তিনি। বিলাপ করতে করতে বারবার চেতনা হারাচ্ছেন। আশিয়ান বাবার গা ঘেঁষে বসে আছে। কাঁদতে কাঁদতে গলা ভেঙে গেছে তার। অমির অবশ্য বাবা হারানোর শোক করার সময় নেই। সে বড়ো ছেলের দায়িত্ব পালন করতে ব্যস্ত। আদরের ছোটো বোন হাসপাতালে অচেতন হয়ে পড়ে আছে। যে বাবার পৃথিবী ছাড়ার খবরটা অবধি জানে না। তাকে সেভাবে রেখেই বাবার কবর করার অনুভূতি একমাত্র সে-ই জানে। হাত-পা বারবার ভেঙে আসছে তার। স্মৃতির পাতায় আজকের দিনটা অভিশপ্ত হয়ে লেখা থাকবে।

রাফসান শিকদারকে গোসল করিয়ে কাফন পরানো হচ্ছে। আমজাদ চৌধুরী স্বয়ং সেখানে উপস্থিত। বন্ধুর গায়ের প্রত্যকটি আঘাতের চিহ্ন তার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করে দিলো। চোখের জলে বন্ধুকে শেষ সাজ নিজ হাতে সাজিয়ে দিলেন তিনি। এই হত্যার পিছনে যদি কামিনী চৌধুরীর হাত থাকে, তাহলে তিনি নিজে এর উপযুক্ত শাস্তি কামিনী চৌধুরীকে দেবেন বলে মৃত বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন। আশমিন বিধ্বস্ত মন নিয়ে রাফসান শিকদারের গোসলের জন্য টানানো সামিয়ানার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। চোখমুখ লাল হয়ে আছে তার। আলি কাল রাতেই খবর পেয়েছিল। তখনো সে রাজশাহী পৌঁছতে পারেনি। রাস্তা থেকেই ফিরে এসেছে। আশমিন ক্লান্ত আলির মুখের

দিকে তাকিয়ে অশ্রুসিক্ত চোখে হালকা হাসল। এই মুখে এমন বিষাদের হাসি এর আগে কি কখনো দেখেছে আলি? আলির বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইল তখন। দুদিন আগেই এই মানুষটা কত ভালোবেসে তাদের বুকে টেনে নিয়েছিল! আজ তিনি বুক ক্ষতবিক্ষত লাশ হয়ে নিজের শেষ যাত্রার অপেক্ষায়। একটা হাসিখুশি পরিবার মুহূর্তে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

হুট করেই আশমিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আশিয়ান। কাঁদতে কাঁদতে বলিষ্ঠ শরীরে একের পর এক আঘাত করতে লাগল সে। একবারের জন্যও কেউ বাধা দিলো না তাকে।

"আমার আব্বুকে তোরা মেরেছিস। তুই দায়ী। তুই মেরেছিস আমার আব্বুকে। আমি তোকে খুন করে ফেলব। তোর মা সব করেছে। তোরা খুনি। আমার আব্বু, আমার আব্বুকে মেরে ফেলেছিস। কেন মারলি? কেন মারলি? আমার আব্বুকে এনে দে, সব তোর জন্য হয়েছে! তুই সব করেছিস। আমার আব্বু কিচ্ছু করেনি। আমার আব্বু শুধু দাঁড়িয়ে ছিল। কেন মারল? কেন মারল? আল্লাহ, কেন মারল? তুই খুনি, আমি তোকে খুন করে ফেলব। তোরা সবাই খুনি।"

আশিয়ানের এলোমেলো বিলাপে আকাশ বাতাস ভারি হয়ে গেল। আশমিন নিজের সাথে চেপে ধরল তাকে। আশিয়ান চিৎকার করে আব্বু আব্বু বলে কাঁদছে। রাফসান শিকদার ততক্ষণে কাফনে মুড়িয়ে গেছেন। আমজাদ চৌধুরী বেরিয়ে আশিয়ানের দিকে এগিয়ে এলেন। জোর করে নিজের কাছে টেনে নিলেন তাকে। এক হাতে আশিয়ানকে জড়িয়ে ধরে কিছুটা দূরে চলে গেলেন তিনি। আশিয়ানের নখের আঁচড় লেগে আশমিনের গলায় কাছে খানিকটা কেটে গেছে। সেখান থেকে হালকা রক্ত বের হচ্ছে। আলি দেখেও কিছু বলল না। এই ব্যথা ব্যক্তিগত। মনের ঝড় থেমে গেলে এই সামান্য ব্যথাও সেরে যাবে।

রাফসান শিকদারকে খাটিয়াতে তুলতে দেখে আশমিনের নিঃশ্বাস আটকে এলো। পাশে দাঁড়ানো আলির কাঁধে ভর দিয়ে নিজেকে সামলাল সে। বিচলিত আলি চিন্তিত গলায় বলল, "তুই ঠিক আছিস, ভাই? শরীর খারাপ লাগছে?"

"আমার ভালোবাসা খাটিয়ায় উঠে গেছে, ভাই। এই যে লাশ দেখছিস, এটা শুধু একজন মানুষের মরদেহ নয়, এ একটা পরিবারের ধ্বংসাবশেষ। আমার ভালোবাসার মৃত্যুর শুরু এখান থেকেই হবে রে, ভাই। আমি কেন

ভালোবাসলাম? এই ভালোবাসাই তো আমার প্রেয়সীর কাল হলো। কী অভিশপ্ত ভালোবাসা আমার! ছুঁয়ে না দিতেই ধ্বংস করে দিলো। আজ এখানে শিকদার আংকেলের কবর হবে না। এখানে কবর হবে আমার অনুভূতির। একবার না, বারবার হবে। আমি প্রতিদিন আমার অনুভূতির খুন হতে দেখব। সাজিয়ে-গুছিয়ে কবরও দিতে দেখব, কিন্তু কিছু করতে পারব না, বলতে পারব না। কারণ একটাই, কিছু না করেও আমি দোষী।"

আশমিনের চোখ থেকে এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আলি চুপচাপ শুনল। অবাক চোখে দেখল। মুখে কিছু বলল না। কোনো সান্ত্বনার বাণী শোনাল না। শুধু এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বুঝতে পারল, অসম্ভব ভালোসতে জানা এক প্রেমিকের জীবনের সমীকরণ বদলাতে চলেছে।

রাফসান শিকদারের ভাইয়েরা এসে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করে পরিবেশ ভারী করে তুলেছেন। বারবার আমজাদ চৌধুরীর ওপর চড়াও হতে চাইছেন তারা। তারা নিশ্চিত এটা চৌধুরীদের কাজ। আমজাদ চৌধুরী বিনয়ের সাথে বারবার বোঝাতে চেয়েও ব্যর্থ হচ্ছেন। পুলিশ আর গার্ডদের জন্য তেমন একটা সুবিধা করতে পারছেন না। আশমিন একটু কবরস্থানে গিয়েছিল সবকিছু ঠিকঠাক আছে কি না দেখতে। এর মাঝেই তারা গণ্ডগোল শুরু করেছে। খবর পেয়ে আশমিন আর অমি দ্রুত ছুটে এসেছে। বাহাদুর আর সানভি তাদের সাথেই ছিল। আশমিন আসতেই পরিবেশ থমথমে হয়ে গেল। আশমিনের পিছনে দাঁড়ানো বাহাদুর। তাকে দেখেই নুরের চাচা কাসেম শিকদার চুপ হয়ে গেলেন। আমজাদ চৌধুরী তাঁদের সামনে বড়ো হয়েছেন। ছোটো বেলায় রাফসান শিকদারের সাথে রোজ বিকেলে শিকদার-বাড়ির উঠোনে খেলা করেছেন। তাঁর সাথে চোটপাট দেখাতে পারলেও সামনে দাঁড়িয়ে থাকা যুবককে কিছু বলতে পারলেন না। ভাই হারানোর কষ্টে দিশেহারা তারা। শিকদাররা কখনো কারোর ধার ধারেনি কোনোদিন। চৌধুরীদের থেকে কোনো অংশে কম নয় তারা। নেহাতই রাফসান শিকদার নরম মানুষ ছিলেন। তাই তাঁদের সাথে এই নোংরা খেলা খেলতে পেরেছে এরা। তবে এবার আর এক চুলও ছাড় নয়। শিকদারদের সাথে খেলতে আসার মজা হাড়ে মজ্জায় বুঝিয়ে দেবেন তারা। সবই হবে নীরবে।

কাসেম শিকদার আশমিনের দিকে ঠান্ডা দৃষ্টি রেখে আমজাদ চৌধুরীকে বললেন, "আমজাদ, তোর পরিবার আমার পরিবার বলতে আমাদের মাঝে কিছু ছিল না কোনোদিন। চৌধুরী আর শিকদার এক পরিবার, এটাই জেনে

এসেছি সারাজীবন। তবে আজ থেকে শিকদাররা শুধুই শিকদার। সেখানে চৌধুরী বলে আর কারোর অস্তিত্ব থাকবে না কোনোদিন। কথাটা মাথায় রাখিস!"

আমজাদ চৌধুরী কিছু বলতে পারলেন না। ভেজা চোখে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ করে।

কামিনী চৌধুরী এসে পৌঁছেছেন মাত্র। মায়ের পাশে দাঁড়ানো লুবানা নিঃশব্দে কাঁদছে। কামিনী চৌধুরীকে দেখে ঘৃণায় গা গুলিয়ে আসছে তার। এক ভয়ংকর অশুভ ছায়া মনে হচ্ছে তাঁকে। এই মানুষটার জন্যই আজ এসব ঘটেছে। দুই পরিবারের এত বছরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। আজ সে বুঝতে পারছে, কেন এতগুলো বছর দাদু এই মহিলাকে মেনে নেননি। দাদু মানুষ চিনতে ভুল করেননি ।

আশমিন আমজাদ চৌধুরীর কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখল। কাসেম শিকদার আর তার দুই ভাই ভুলু শিকদার, মিঠু শিকদার খাটিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই লাশ নিয়ে কবরস্থানের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যাবেন তাঁরা। আশমিন কাফনে মোড়ানো দেহটার দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, "বেয়াদবি নেবেন না, এই কথাগুলো বলার সঠিক সময় এটা নয়, চাচা। এটা শোকের বাড়ি। মুর্দা এখনো কবরস্থ হয়নি। এখানে দাঁড়িয়ে এই আলোচনা করার কোনো মানে হয় না। আমরা এই বিষয়ে পরে কথা বলি? প্লিজ, অনুরোধ করছি। এখন এসব বিষয়ে কথা বলে তাদের কষ্ট বাড়িয়ে দেওয়ার কোনো মানে হয় না।"

মিঠু গর্জে উঠলেন। হুংকার দিয়ে বললেন, "তোমার এসব না ভাবলেও চলবে। এসেছ, দেখেছ। এবার বাড়ি ফিরে যাও। তোমাদের উপস্থিতিই আমাদের কষ্ট বাড়িয়ে দিচ্ছে। এখানকার প্রত্যেকটা মানুষ জানে, এসব কিছু তোমাদের কারণে হয়েছে। শিকদার–বাড়িতে ডাকাতি করতে আসবে এত বড়ো বুকের পাটা এখনো কোনো ডাকাতের হয়নি। কাদের প্রশ্রয়ে এই ডাকতগুলো এ বাড়িতে ঢোকার সাহস পেয়েছে তা আর কাউকে বলে বোঝাতে হবে না। এই বাড়িতে আর এক মুহূর্তের জন্যও তোমাদের দেখতে চাই না। বিদায় হও।"

কামিনী চৌধুরী তেড়ে এলেন। ছেলের সামনে দাঁড়িয়ে তিরিক্ষি গলায় বললেন, "মুখ সামলে কথা বলুন। আপনাদের সাহস কী করে হয় আমার

ছেলের সাথে গলা উঁচু করে কথা বলার? বেশি বাড়াবাড়ি করলে জেলে পচিয়ে মারব।"

আশমিন তার মাকে থামানোর চেষ্টা করল। অমজাদ চৌধুরী চোখ রাঙিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "আর একটা কথাও বলবে না তুমি! তাহলে আমার চেয়ে খারাপ আর কেউ হবে না!"

কামিনী চৌধুরী শুনলেন না। নিজের মতো অপমান করতে লাগলেন তাদের। ছোটোলোক বলে বারবার গালি দিতেই কাসেম শিকদার সর্বশক্তি দিয়ে ধমক দিলেন তাঁকে। রক্তাক্ত চোখে তাকিয়ে হিংস্র গলায় বললেন, "মুখের লাগাম টানো, মহিলা। আমি রাফসান শিকদার নই যে, তোমার কুকুরের মতো ঘেউঘেউ শুনেও চুপচাপ সহ্য করব। আমার মুখ খুলিয়ো না। সম্মানের ছিটাফোঁটা নিয়েও ফিরে যেতে পারবে না। চৌধুরীদের চেনার আগে থেকেই তো শিকদারদের চেনো। বুঝে কথা বলো। একেবারে গায়েব করে দেবো। বহু বছরের হিসেব মিটানো বাকি। আটকানোর মানুষটা এই খাটিয়ায় শুয়ে আছে। তাই পুরনো জ্বালা মনে করিয়ে নিজের বিপদ ডেকে এনো না।"

কামিনী চৌধুরী মিইয়ে গেলেন। ভীত চোখে ছেলে আর স্বামীর দিকে তাকালেন। বহুকালের পুরোনো ইতিহাস বেরিয়ে আসার ভয়ে পিছিয়ে গেলেন কয়েক কদম। আমজাদ চৌধুরী বিতৃষ্ণা নিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সব-কটা কথা মাথায় গেঁথে নিলেও সে বিষয়ে একটা কথাও বলল না আশমিন। কামিনী চৌধুরীকে টেনে নিজের কাছে টেনে নিয়ে শক্ত গলায় বলল, "আমার মায়ের সাথে এভাবে কথা বলবেন না, চাচা। আমি সহ্য করতে পারি না। যা বলার আমাকে বলুন। তাঁকে সম্মান দিয়ে কথা বলুন।"

কাসেম শিকদার এগিয়ে এলেন। দুহাত পিছনে গুঁজে আশমিনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, "কাককে যতই ময়ূরের পেখম লাগানো হোক না কেন, কাক কাকই থেকে যাবে। যার জলজ্যান্ত প্রমাণ তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তোমাকেই বলছি, এই মহিলাকে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাও, এক্ষুনি!"

কাসেম শিকদারের তেজস্বী গলায় কেঁপে উঠলেন কামিনী চৌধুরী। ছেলের ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আর মুখ খুললেন না তিনি। আশমিন শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বলার অনেক কিছু থাকলেও সময়টা সঠিক নয়।

"আব্বু!"

আশমিন-সহ বাকি সবাই থমকে গেল। বিধ্বস্ত নুর শিকদার বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। পুতুলের মতো মেয়েটার এমন করুণ রূপ দেখে হৃদয় এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল আশমিনের। নুরের অবশ্য সেদিকে ধ্যান নেই। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কাফনে মোড়ানো তার বাবার দিকে। ছোটো মামি নুরের পিছনে দাঁড়িয়ে আচলে মুখ গুঁজে কাঁদছেন। ক্লান্ত অমি হাত-পা ছড়িয়ে বাবার লাশের পাশে বসে আছে। এতক্ষণের তর্ক-বিতর্কে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই। সে শুধু এতটুকু জানে, আজ থেকে থেকে তার বাবা ডাকার মানুষটা ফুরিয়েছে। কারোর তর্কে-বিতর্কে সে আর ফিরে আসবে না।

নুর চোখ ঘুরিয়ে সবাইকে দেখে নিল। লেপটে যাওয়া কাজল রাঙা চোখ দুটো রক্তজবার মতো লাল হয়ে আছে তার। সেই রক্তজবার দিকে তাকিয়ে আশমিনের দম আটকে এলো। গড়িয়ে যাওয়া অশ্রু নিয়ে প্রেয়সীর নির্বাক মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

নুর ধীর পায়ে এগিয়ে এলো। এলোমেলোভাবে চারদিকে তাকিয়ে কিছু একটা খুঁজল হয়তো। আলি আশমিনের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, "সব-কটা ধরা পড়েছে। আউট হাউজে রাখতে বলেছি। পরে তাদের ব্যবস্থা করা যাবে।"

আশমিন ছোটো করে "হুম" বলল। তার ভালো লাগছে না। এখান থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

নুর অমির পাশে বসে তার কাঁধে মাথা রাখল, "আব্বু কোথায়, ভাইয়া? তুমি তাকে একা রেখে এসেছ কেন? আব্বু তো অসুস্থ। একা একা কীভাবে থাকবে?"

অমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। নুরের মাথায় হাত রেখে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আব্বু আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, আলো। আমাদের আব্বু নেই। আমরা এতিম হয়ে গেছি।"

নুর বুঝদারের মতো মাথা নাড়ল শুধু। বাবা মরে যাওয়ার বিষয়টা যেন খুব স্বাভাবিক। শান্ত গলায় বলল, "আব্বুকে দেখব।"

আলি এগিয়ে এলো। কাফনের বাঁধন খুলে রাফসান শিকদারের মুখটা বের করল সে। নুরকে তার মামি তুলতে এলে সে তাকে থামিয়ে দিলো। একাই এগিয়ে গেল বাবার মরদেহর দিকে। নিথর রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল নিষ্পলক। আলতো হাতে জড়িয়ে ধরল তাঁকে। কানে

কানে ফিসফিস করে বলল, "শুকনো চোখে তোমাকে বিদায় দিচ্ছি, আব্বু। তাই বলে ভেবো না আমি তোমায় ভালোবাসি না। তুমি একদিন বলেছিলে, কান্না মানুষের কষ্ট কমিয়ে দেয়। আমি এই কষ্ট কমাতে চাই না, আব্বু। তোমাকে হারানোর ব্যথা আমি বুকের মাঝে জিইয়ে রাখব। যাদের জন্য আমি এতিম হয়েছি তাদের কঠিন মৃত্যু না দিয়ে আমি কাঁদব না। এক ফোঁটা পানিও চোখ থেকে বের হতে দেবো না।"

নুর বিড়বিড় করে আরও অনেক কিছুই বলল। এক জনমের সব কথা আজই সেরে নিচ্ছে সে। এরপর তো আর বাবার নাগাল পাওয়া যাবে না। তিনি ওই দূর আকাশের বাসিন্দা হয়ে যাবেন!

কয়েকজন মহিলা এগিয়ে এসে নুরকে টেনে সরিয়ে নিল। আশমিন শুধু দেখেই গেল নীরবে। সান্ত্বনা দেওয়ার অধিকার সে চিরতরে হারিয়েছে।

রাফসান শিকদারের খাটিয়া ওঠাতেই শিকদার-বাড়িতে আবার কান্নার রোল পড়ে গেল। নাফিজা শিকদার খাটিয়া শক্ত করে ধরে রেখেছেন। পাগলের মতো আহাজারি করতে করতে বলছেন, "নিয়ো না, উনাকে নিয়ে যেয়ো না। আরেকটু রাখো আমার কাছে। আমার কত কথা বলা বাকি! একসাথে বুড়ো হওয়া বাকি। এভাবে কি বিদায় হয়? আমি নিয়ে যেতে দেবো না!"

অমি মাকে ছাড়িয়ে নিল। নুরের বড়ো মামি শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন তাঁকে। ননদের শোকে তিনিও বিলাপ করে কাঁদছেন। পাড়া-প্রতিবেশীরাও চোখের জলে বিদায় দিলো রাফসান শিকদারকে। খাটিয়া কাঁধে নিয়ে আশমিন, অমি, আশিয়ান আর আমজাদ চৌধুরী বাড়ি থেকে বের হলেন। কাসেম শিকদার বাধা দিতে চাইলেও আশমিন আর আমজাদ চৌধুরী শুনলেন না। এই সময়ে কোনো তামাশা করতে মন সায় দিলো না কারোর। তাই চুপচাপ মেনে নিলেন সব। উঠানে বসে আহাজারি করছেন নাফিজা শিকদার। নুর তাঁর মাথাটা নিজের বুকের সাথে চেপে ধরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চলে যাওয়া খাটিয়ার দিকে।

দাফন শেষে সবাই ফিরে এসেছে। কাসেম শিকদার-সহ সবাই বসেছেন নুরদের বসার ঘরে। নাফিজা শিকদারের গলা বসে গেছে। তিনি গুনগুন করে বিলাপ করছেন। গতকাল এই সময়ে তার সাথেই ছিলেন মানুষটা। আর আজ অন্ধকার কবরের বাসিন্দা। থেকে থেকে ফুঁপিয়ে উঠছেন তিনি। কাসেম শিকদার, নাফিজা শিকদারের আর রাফসান শিকদারের বড়ো চাচার ছেলে।

নাফিজা শিকদারের দুই ভাই নাদির শিকদার আর নাসিম শিকদারও সেখানে উপস্থিত। বাড়ির পরিবেশ থমথমে। এলাকার মানুষ খুব একটা না থাকলেও শিকদার পরিবারের সদস্য দিয়ে বাড়ির আনাচে-কানাচে পূর্ণ হয়ে আছে।

নীরবতা ভেঙে কাসেম শিকদার মুখ খুললেন, "আমার ভাই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। জন্ম–মৃত্যু সব আল্লাহর হাতে। তবে স্বাভাবিকভাবে হলে মেনে নিতাম; কিন্তু যেভাবে এরা আমার ভাইকে খুন করেছে আমি তা কিছুতেই চুপচাপ সহ্য করব না।"

"কী করতে চাইছেন, ভাইজান? ওদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিয়ে তো কোনো লাভ নেই। থানা–পুলিশ ওদের পকেটে।"

নাসিম শিকদারের উদাসীন গলায় রেগে গেলেন কাসেম শিকদার। গলার স্বর উঁচু করে বললেন, "তাহলে কী করব? এভাবে বসে বসে তামাশা দেখব? ওই মহিলা আমাদের জীবনটা আরও একবার এলোমেলো করে দিয়েছে। আগেরবার রাফসানের অনুরোধে ওকে ছেড়ে দিয়েছি। এবার আর নয়। তখন ওকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলে আজ এ দিন দেখতে হতো না।"

সবার চোখ মুখ থমথমে। পুরোনো কোনো তিক্ত স্মৃতি তাদের মনটা বিষিয়ে দিচ্ছে হয়তো।

"যে চলে যাওয়ার সে তো চলেই গেছে, ভাইজান। এখন আর ওদের সাথে শত্রুতা বাড়িয়ে লাভ কী? তার চেয়ে আমরা ওদেরকে আমাদের কাছে (সিরাজদিখান) নিয়ে রাখি। ওখানেও তো ওদের নিজেদের বাড়ি আছে। আমাদের আশেপাশে থাকলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।"

নাদিম শিকদারের কথায় সবাই সম্মতি দিলো। তবে কাসেম শিকদার নীরব রইলেন। তার মনে কী চলছে তা একমাত্র সেই জানেন। চৌধুরীদের একেবারে ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নই আসে না।



কামিনী চৌধুরী ইদানীং কিছুটা চুপচাপ হয়ে গেছেন। প্রয়োজন ছাড়া খুব একটা কথা বলেন না। আগের মতো ছেলের সাথে সম্পর্কটা স্বাভাবিক নেই তাঁর। সম্পর্কের ছন্দপতন হয়েছে আমজাদ চৌধুরীর সাথেও। ইদানীং আশমিনকে দেখলে যেন পালিয়ে বাঁচেন। ছেলের ওই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁর ভেতরের সবটুকু অধ্যায় পড়ে ফেলতে চায়। তাই ছেলের চোখের দিকে তাকানোর সাহস করেন না তিনি। রাফসান শিকদারের মৃত্যুর চার মাস অতিক্রম হয়েছে। সেদিনই মুন্সিগঞ্জ থেকে ফিরে এসেছেন তিনি আর আমজাদ চৌধুরী। আশমিন অবশ্য সপ্তাহখানেক পরে এসেছে। আসার পর থেকেই নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছে। শিকদার–বাড়ির কাউকে নিয়ে কোনো কথা তার মুখে শোনা যায়নি। মাঝেমাঝে মাঝরাতে বাপ ছেলের মিটিং বসে স্টাডিরুমে। কামিনী চৌধুরী সেদিকে আর ধ্যান দেন না। ইদানীং আরেক সমস্যা দেখা দিয়েছে। দুঃস্বপ্ন দেখে রাতে ঘুম ভেঙে যায়। পরিচিত একটা মুখ বারবার মানস্পটে ভেসে ওঠে। মিজু সিদ্দিক তার পরিবার সমেত থাইল্যান্ড গিয়েছেন। তাই কামিনী চৌধুরী আরও বেশি একা হয়ে গেছেন। সুমা সিদ্দিক থাকলে কথা বলার অন্তত একজন থাকত। একাকিত্ব তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। তিনি যেন সব থেকেও নিঃস্ব।

শিকদার–বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়েছে আশমিন। ড্রাইভিং সিটে সানভি বসে আছে। আশমিন এক মনে নুরের রুমের জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রায় তিন ঘণ্টা হলো সে একভাবেই তাকিয়ে আছে। নুর একবারও তার সামনে আসেনি। অথচ গাড়ির শব্দে আশেপাশের সবাই বুঝেছে আশমিন এসেছে। গত কয়েকমাস ধরেই প্রতি সপ্তাহে দুবার আশমিন মুন্সিগঞ্জে আসে। এভাবেই সারা রাত প্রেয়সীর দুয়ারে কাটিয়ে ভোররাতে নিজ নীড়ে ফেরে। অথচ একবারের জন্যও ডাকাত-রানির দেখা মেলে না তার। চারদিকে ফজরের আজান পড়তেই আশমিন মলিন গলায় বলল, "গাড়ি স্টার্ট দাও, সান।"

ইঞ্জিনের আওয়াজে জানালার পাশে হেলান দিয়ে বসে থাকা নুর কান সজাগ করল। বুঝতে পারল আশমিন চলে যাচ্ছে। বুকের ভেতর পুড়তে থাকা হৃদয়টাকে শাসিয়ে চুপ করাল সে। তার যে প্রেমে পড়া বারণ!

আশমিনের তীব্র বিষাদ ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে সানভির খুব মায়া হলো। গাড়ির কাচ ভেদ করে আনমনে বাইরে তাকিয়ে থাকা সুদর্শন পুরুষের চোখের কোণ খানিকটা ভিজে উঠল কি? প্রচণ্ড মন খারাপ হলো তার। গলার স্বর কিছুটা খাদে নামিয়ে নরম গলায় বলল, "প্রতিদিন এভাবে নিজের হৃদয়টাকে কেন ছিন্নভিন্ন করতে যান, স্যার? ম্যাম খুবই নিষ্ঠুরভাবে আপনাকে ভেঙেচুরে দিচ্ছেন প্রতিনিয়ত। আমার খুব কষ্ট হয়।"

শেষের কথাটা বলতে গিয়ে সানভির গলা ভারী হয়ে এলো। আশমিন হাসল। শুভ্র পাঞ্জাবিতে লেপটে থাকা পুরুষের বিষাদের হাসিটা বড়ো নির্মল লাগল সানভির। নিজের চশমার কাচ ভেদ করে বাইরের অন্ধকারে দৃষ্টি দিলো আশমিন। মিনিট খানেক চুপ থেকে শান্ত গলায় বলল, "ভালোবাসা অদ্ভুত সুন্দর অনুভূতি, সান! চাইলেই এই অনুভূতি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। ভালোবাসার মানুষ আঘাত করতে করতে অনুভূতিগুলোকে মেরে ফেললেও ইচ্ছে করবে সেই পচে যাওয়া অনুভূতির লাশ বারবার কবর থেকে তুলে এনে বুকের মাঝে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরতে। সেখানে আমার অনুভূতি তো জীবন্ত, চোখের সামনে প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াচ্ছে। আমার ভালোবাসায় কোনো কার্পণ্য থাকবে না, সান। বিচ্ছেদেও আমি সমানভাবে ভালোবেসে যাব।"

রাফসান শিকদারের মৃত্যুর আট মাস পরেই শিকদার-বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব গেল চৌধুরী-বাড়ি থেকে। নাফিজা শিকদার এক বাক্যে অমত জানালেও নুর বিয়েতে মত দিলো। তবে আমজাদ চৌধুরীকে কিছু শর্ত জুড়ে দিয়েছে সে। অলৌকিকভাবে কাসেম শিকদার-সহ বাকি সবাই রাজি। তারা চান চৌধুরী-বাড়িতেই নুরের বিয়ে হোক। নাফিজা শিকদারের সাথে কয়েক দফা বৈঠক করে তাঁকে বোঝাতে লাগল বাকি সবাই। তিনি কোনোভাবেই বিয়েতে মত দেবেন না বলে বেঁকে বসলেন। কামিনী চৌধুরীর সেদিনের করা অপমান তাঁর চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। মৃত্যুর দিন এই মহিলার দ্বারা কীভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন তাঁর স্বামী সেটা ভাবলেই তাঁর গায়ে জ্বালা ধরে যায়। ওই অভিশপ্ত মহিলার ছেলের কাছে কিছুতেই নিজের মেয়েকে তুলে দেবেন না তিনি। সবাই নাফিজা শিকদারকে বোঝাতে বোঝাতে ক্লান্ত। অমি মায়ের মনের অবস্থা বোঝে। সেও চায় নুরের বিয়ে আশমিনের সাথেই হোক।

কামিনী চৌধুরী যেমনই হোক না কেন, আশমিন একেবারে খাঁটি হীরা। তার বোনের গায়ে একটা আঁচড়ও লাগতে দেবে না। সেই বিশ্বাস আশিমিনের ওপর তার আছে। তাছাড়া নূরও আশমিনকে ভালোবাসে। নূর নিজ মুখে স্বীকার করেছে। তাই সিদ্ধান্ত নিল, সে নিজে নাফিজা শিকদারকে বোঝাবে। পরিস্থিতি অনেকটা হাতের বাইরে। সেদিন লোকগুলো নূরের ক্ষতি করতেই এসেছিল। ভবিষ্যতে আবার হামলা করবে না—তার কী গ্যারান্টি আছে?

অমি নাফিজা শিকদারের রুমের সামনে এসে দরজায় নক করল, "আম্মু আসব?"

নাফিজা শিকদার শুয়ে ছিলেন। ছেলের ডাকে উঠে বসলেন তিনি। বললেন, "এসো।"

অমি এসে বিছানায় বসল। মায়ের সেই আগের উজ্জ্বল রূপটা নেই। চোখের নিচে কালি পড়েছে। আট মাসেই যেন বয়স বেড়ে গেছে তার। অমি চোখ নামিয়ে নিল।

"শরীর কেমন তোমার আম্মু? ওষুধগুলো ঠিকঠাক খাচ্ছ তো?"

নাফিজা শিকদার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তার সুস্থতার জাদুর কাঠি তো মাটির নিচে শুয়ে আছে। ওষুধ খেয়ে আর কী হবে? মায়ের মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে বুক ভার হয়ে এলো অমির। হাত দুটো আঁকড়ে ধরে ধরা গলায় বলল, "এভাবে নিজেকে শেষ করে দিয়ো না, আম্মু। তুমি ছাড়া আমাদের আর কে আছে? আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে হলেও একটু স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করো।"

নাফিজা শিকদার ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নরম গলায় বললেন, "রাতে খেয়েছ কিছু?"

"খেয়েছি আম্মু।"

"অনেক রাত হয়েছে। গিয়ে শুয়ে পড়ো। সকালে আবার আরতে যেতে হবে।"

অমি মায়ের হাত ধরে থামিয়ে দিলো, "বিয়েতে রাজি হয়ে যাও, আম্মু। নূরের ভালোর কথা ভেবে হলেও রাজি হয়ে যাও। আশমিন ভাইয়ের কাছে নূর ভালো থাকবে।"

নাফিজা শিকদার থমকে গেলেন। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন ছেলের মুখের দিকে। মায়ের এমন দৃষ্টি দেখে অমি চোখ নামিয়ে নিল। নাফিজা শিকদার নিজের হাতগুলো গুটিয়ে নিলেন। অমির দিকে তাকিয়ে শক্ত

গলায় বললেন, "ও বাড়িতে আমি মেয়ের বিয়ে দেবো না, অমি। নিজের রুমে যাও। এ বিষয়ে আর একটা কথাও বলতে চাই না।"

"আম্মু, প্লিজ, নুরের কথাটা অন্তত একবার ভাবো! ও আশমিন ভাইকে ভালোবাসে। তাছাড়া তুমি কী ভেবেছ, তুমি নুরকে অন্য কোথাও বিয়ে দিতে পারবে? আশমিন ভাই হতে দেবে? সারাজীবন নুরকে এভাবেই থাকতে হবে, আম্মু। সে বিয়ে করতে না পারলে কোনো প্রতিবাদ করবে না ঠিকই। তবে নুরের বিয়ে অন্য কোথাও সে কিছুতেই হতে দেবে না। সেই গ্যারান্টি আমি তোমাকে দিচ্ছি। একটাবার ভাবো আম্মু, নুর এখানে সেইফ নয়। যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তুমি কি চাও নুরের অবস্থাও আব্বুর মতো হোক?"

জীবনে প্রথমবারের মতো ছেলের গায়ে হাত তুললেন নাফিজা শিকদার। গালে হাত দিয়ে স্তব্ধ চোখে তাকিয়ে আছে অমি। নাফিজা শিকদার রাগে কাঁপছেন। বিছানা থেকে নেমে চিৎকার করে বললেন, "ওই খুনির বাড়িতে আমি আমার মেয়ে দেবো না, অমি। দরকার হলে ওকে তোর খালার কাছে জাপান পাঠিয়ে দেবো। তবুও চৌধুরী-বাড়িতে কোনো সম্বন্ধ করব না। এটাই আমার শেষ কথা।"

"শান্ত হও, আম্মু। আমার কথাটা একবার শোনো? আব্বুর মৃত্যুর পিছনে তাদের হাত আছে সেটা স্পষ্ট। তবে সে মানুষটা কে আমরা তা জানি না। সন্দেহ কামিনী আন্টির দিকে গেলেও আমরা কিন্তু শিউর না। তুমি কি চাও না অপরাধী শাস্তি পাক?"

নাফিজা শিকদার কিছুটা দমলেন। গভীর চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, "যে যাওয়ার সে তো চলেই গেছে। অপরাধীকে শাস্তি আল্লাহ দেবেন। এ নিয়ে কোনো প্রকার জল ঘোলা হোক আমি তা চাই না। মাথায় যা চলছে তা ঝেড়ে ফেলো, অমি।"

অমি নিরাশ হলো। নুর এতক্ষণ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। নাফিজা শিকদারের কথা শেষ হতেই সে রুমে প্রবেশ করল।

"আমি চৌধুরী-বাড়িতেই বিয়ে করতে চাই, আম্মু।"

"প্রতিশোধ নিতে চাও বলে?"

নাফিজা শিকদারের ধারালো প্রশ্নে নুর কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল। তারপর দৃঢ় গলায় বলল, "আমি আশমিন ভাইয়াকে ভালোবাসি, আম্মু।"

"তাহলে সেদিন অস্বীকার করেছিলে কেন?"

অতিরিক্ত রেগে গেলে নাফিজা শিকদার ছেলেমেয়েদের তুমি সম্বোধন করে কথা বলেন। অমি আর নুর মায়ের রাগের মাত্রা অনুভব করতে পারছে।

তবুও হাল ছাড়ল না তারা। নুর নরম গলায় বলল, "ভয়ে অস্বীকার করেছিলাম, আম্মু। এখন তারা যেহেতু নিজ থেকেই এসেছে সেহেতু ফিরিয়ে দেওয়ার মানে হয় না।"

নাফিজা শিকদার টলমল পায়ে বিছানায় বসলেন। খাটে হেলান দিয়ে চোখ বুজে শীতল কণ্ঠে বললেন, "ঠিক আছে। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। তবে একটা কথা মাথায় রেখো, বিয়ের পর তুমি আর কখনো আমার স্বামীর ভিটায় পা রাখবে না। এটা আমার আদেশ।"

নুরের পায়ের নিচের জমিন যেন দুলে উঠল। তার মা তাকে সারাজীবনের মতো ত্যাগ করতে চাইছেন! এ বাড়িতে আর কখনো আসতে পারবে না সে? বাবা বাবা গন্ধটা তো এ বাড়িতেই লেগে আছে। সে কীভাবে না এসে পারবে? বুকের ভেতরে যন্ত্রণা ধীরে ধীরে ডালপালা ছড়াতে লাগল। অমি বোনের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে। মায়ের এই সিদ্ধান্ত কীভাবে মানবে তারা? আদরের বোনটাকে একেবারে সারাজীবনের জন্য বিদায় দেবে কীভাবে?

নুর অভিমানী চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় বলল, "ঠিক আছে, আম্মু। আমি রাজি।"

নাফিজা শিকদার সেভাবে চোখ বন্ধ করেই পড়ে রইলেন। নুর সাথে সাথেই বেরিয়ে গেল সেখান থেকে। অমি মায়ের দিকে নির্মল চোখে তাকিয়ে থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল। ছেলে-মেয়ে বেরিয়ে যেতেই নাফিজা শিকদারের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। নিজেকে কঠিন করেও মেয়ের সিদ্ধান্ত বদলাতে পারলেন না তিনি। নুরের ভেতরে জ্বলা প্রতিশোধের আগুন তিনি স্পষ্ট দেখতে পান। ভয় হয় তাঁর। এই আগুন হয়তো তাদের সবার জীবন ছারখার করে দেবে।

আশমিন আর নুরের বিয়ের আয়োজন হলো খুব সাদামাটাভাবে। দেনমোহর হিসেবে নুরের হাতে চৌধুরী-বাড়ির দলিল তুলে দিলেন আমজাদ চৌধুরী নিজে। নুর স্মিত হেসে সেই দলিল নিজের হাতে নিল। অফ হোয়াইট শেরোয়ানিতে আশমিনকে রাজা–মহারাজাদের মতো লাগছে। নুর একবার তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল। আশিমিনের সাথে থাকা মৌরি কপাল কুঁচকে ফেলল। এভাবে চোখ সরিয়ে নেওয়ার মানে কী? সে উঁকি দিয়ে আশমিনকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখল। আশমিন ভ্রু কুঁচকে বলল, "কী?"

"না, কিছু না। তোর বউ যেভাবে তোর থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল, আমি ভাবলাম তোর গায়ে আবার বিড়াল পটি করে গিয়েছে কি-না।"

আশমিন নাকমুখ কুঁচকে ফেলল। পাশে বসে থাকা আলি হো-হো করে হাসছে। মৌরি সেদিকে ধ্যান দিলো না। সে চিন্তিত গলায় বলল, "দোস্ত, আমার মনে হয় সারাজীবন তোকে উপোস করেই কাটাতে হবে। পরিস্থিতি যা দেখছি, এই মেয়ে তো তোকে কাছেই ঘেঁষতে দেবে না।"

আশমিন শান্ত চোখে পাজি বন্ধুদের দেখে নিল। উপোস করবে মানে কী? না-হয় দু-একদিন ভদ্রতা দেখিয়ে চুমু খেয়ে ছেড়ে দেবে। এর বেশি ভদ্রতা দেখানো তার পক্ষে সম্ভব না। তার বাবা বলে, সে জন্মগত অভদ্র। বাবাকে তো আর ভুল প্রমাণ করা যায় না। তবে বউ তার জ্বলন্ত আগুন। নিশ্চয়ই তাকে জ্বালানো পোড়ানোর প্ল্যানিং ভালোভাবেই করেছে। তাকেও কোমরে গামছা বেঁধে নামতে হবে।

আলি আশমিনের কাঁধ জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বলল, "চৌধুরী-বাড়ি তো হাত থেকে গেল। আগের মতো ঢুকতে পারব তো?"

আশমিন কারোর কথার কোনো উত্তর দিলো না। সে এক দৃষ্টিতে বধূরূপে বসে থাকা নুরকে দেখছে। এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে আশেপাশের কয়েকজন বাঁকা চোখে তাকিয়েছে কয়েকবার। আশমিন অবশ্য সেসবের ধার ধারে না। সে ভিড় কমার অপেক্ষায়। বিয়ে হয়ে গেছে। এখনই টুপ করে একটা চুমু খেলে কিছুটা ভালো লাগত। গরমে হাঁসফাঁস লাগছে তার।

নুরের বিদায়বেলায় অমি আর নুরের মামা-চাচারা তাকে এগিয়ে দিতে এলো। নাফিজা শিকদার আর আশিয়ানের দেখা পাওয়া গেল না। নুর ভাইকে জড়িয়ে ধরে রইল কিছুক্ষণ। বোনের মাথায় পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দিলো অমি। নূর তৃষ্ণার্ত কাকের ন্যায় তাকিয়ে রইল দরজার পানে। মা আর ভাইয়ের দেখা না পেয়ে একরাশ হতাশা নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল সে। আশমিন ড্রাইভিং সিটে বসেছে। বউকে নিজেই ড্রাইভ করে নিয়ে যাবে সে। নূর আশমিনের দিকে এক পলক তাকিয়ে সামনে দৃষ্টি দিলো। নুরের শুকনো চোখ দেখে আশমিন টিপ্পনী কেটে বলল, "একটু কাঁদো, প্লিজ! বউয়ের শুকনো চোখ দেখলে বিয়ে বিয়ে ফিল আসে না। তুমি কাঁদবে, আমি রোমান্টিক বরের মতো ঠোঁট দিয়ে তোমার চোখের জল শুষে নেব। নাও, শুরু করো।"

নূর বিরক্ত চোখে তাকাল। এই লোকের ঢং দেখলে তার গা জ্বলে যায়। ইচ্ছে করে পাটার নিচে দিয়ে মিনিটখানেক গায়ের জ্বালা মিটিয়ে পিষে ফেলতে। ফালতু লোক একটা!

আশমিন বুঝল নুর রেগে গেছে। সে মুখ টিপে হেসে রাস্তায় নজর রেখে ধীর গলায় গান ধরল, "আজ পাশা খেলব রে, শ্যাম..."

"ছাগলের তিন নম্বর ছানার মতো চিৎকার না করে চুপচাপ গাড়ি চালান। বিরক্ত লাগছে।"

"আসো একটা চুমু খাই। ভালো লগবে।"

"জ্যান্ত কুমিরকে চুমু খাব, তবুও আপনাকে না।"

আশমিন কটমট করে তাকাল নুরের দিকে। রাগী গলায় বলল, "আমি ওই কুমিরের ঠোঁট কেটে নেব। আমার বউকে চুমু খাওয়া! এত বড়ো সাহস! কুমিরের ঠিকানা বলো? ব্যাটা নিশ্চয়ই কোনো নোংরা ডোবায় ঘাপটি মেরে বসে আছে?"

নুর বিরক্ত হয়ে চোখ বুজে বসে রইল। বাসার সবার জন্য মন কেমন করছে। বাবার কথা মনে পড়ছে খুব। বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছে তার। কান্না আটকাতে ঠোঁট কামড়ে ধরল সে। আশমিন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে মলিন হাসল সে। তার জীবনের সমীকরণ বদলাতে চলেছে। এই রমণী তার বুকের ভেতর বসে তাকে ধ্বংস করার ছক কষছে। আর সে নিজে খাতা-পেনসিল এগিয়ে দিয়ে তাকে সাহায্য করছে। আনমনে হাসল সে। পকেটে রাখা ফোনটা ভাইব্রেট করতেই গাড়ির গতি কমিয়ে দিলো। ক্লান্ত নুর ততক্ষণে ঘুমের দেশে পাড়ি জমিয়েছে। এক নজর নুরকে দেখে এক হাতে ফোন বের করে রিসিভ করে কানে তুলতেই সানভির বিচলিত গলা, "স্যার, ডাকাতদের একজন তো মারা গেছে। কী করব?"

"ওখানেই ফেলে রাখো।"

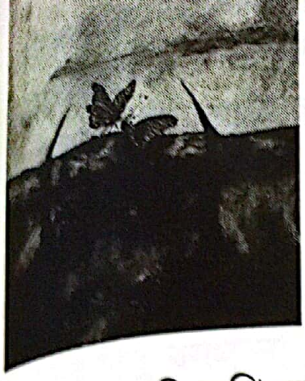
সানভির বুক কেঁপে উঠল। মিনমিনে গলায় বলল, "স্যার, দুজন জীবিত মানুষের সাথে একজন মৃত মানুষকে এভাবে রাখা ঠিক হবে? দুর্গন্ধ বের হবে! তাছাড়া ওরা ভয় পেতে পারে।"

আশমিন হাসল। বড়ো ভয়ংকর সেই হাসি। সানভিকে চমকে দিয়ে নির্দয়ের মতো বলল, "চাইলে তুমি ওদের সঙ্গ দিতে পারো। রাতটা ওখানেই কাটিয়ে দাও।"

"সরি, স্যার?"

আশমিন ফোন কেটে দিলো। নুরের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অনিমেষে। বুকের ভেতর প্রশান্তির বাতাস বইছে। একটু উষ্ণ আলিঙ্গনে

হৃদয়ের আগ্নেয়গিরিতে হিমেল হাওয়া বয়ে যাবে হয়তো। আশমিন সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না। গাড়ি দাঁড় করিয়ে নুরের মাথাটা নিজের বুকের কাছে রাখল সে। প্রেয়সীর প্রথম স্পর্শ! পুরো শরীরে শিহরন বয়ে গেল তার। হৃৎকম্পন দ্রুত গতিতে বাড়তে লাগল। অসহায় চোখে বাইরে তাকাল সে। পাশ ঘেঁষে শোঁ শোঁ করে দ্রুতগতিতে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে নিজেদের গন্তব্যে। কিছুক্ষণ হাঁসফাঁস করে টুপ করে নুরের কপালে চুমু খেয়ে ফেলল। নিজের কন্ট্রোল লেভেল দেখে সে নিজেই হতাশ! বিড়বিড় করে নিজেকে ভর্ৎসনা দিতে দিতে গাড়ি স্টার্ট করল। তাড়াতাড়ি বাড়িতে পৌঁছতে হবে। সবাই অপেক্ষা করছে হয়তো। ক্লান্ত নুর টেরই পেল না কিছু। ক্লান্তিতে চোখ বেয়ে ঘুম নেমেছে তার। জেগে থাকলে কি অপ্রিয় প্রেমিক পুরুষের এতটা কাছে যেত সে?



আশমিনের গাড়ির পিছনে আরও দুটো গাড়ি চৌধুরী-বাড়িতে ঢুকল। আলি, সানভি, লুবানা আর মৌরি পিছনের গাড়িতে ছিল। বাহাদুরের গাড়ি আশমিনের গাড়িকে চোখে চোখে রেখেছে সারাটা পথ। আমজাদ চৌধুরী এসে পৌঁছেছেন মিনিট দশেক আগে। বাড়িতে অনেক আত্মীয়স্বজন উপস্থিত আছেন। কাল বড়ো রিসিপশন পার্টি হবে। সেখানে প্রেস মিডিয়ার সবাইকে ডাকা হবে। গুরুত্বপূর্ণ অ্যানাউন্সমেন্ট করবেন স্বয়ং এমপি আমজাদ চৌধুরী। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে কালকের জন্য।

মৌরি-সহ আরও কয়েকজন মেয়ে নুরকে গাড়ি থেকে নামিয়ে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যেতে চাইলে বাধা দিলো আশমিন। এগিয়ে এসে মৌরির হাত থেকে নুরের হাত ছাড়িয়ে ধীর গলায় বলল, "আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল মৌরি। কটমট করে বলল, "তোর বউকে কি খেয়ে ফেলব আমরা? পৃথিবীতে যেন তোরই একটা বউ আছে। ঢং দেখে বাঁচি না!"

আশমিন রাগল না। শান্ত গলায় বলল, "বউ নিয়ে নো কম্প্রোমাইজ, সাইড দে।"

মৌরিকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই নুরকে কোলে তুলে গটগট করে চলে গেল সে। হাসতে হাসতে আলি মৌরির পাশে দাঁড়াল। কষ্ট পাওয়ার ভান করে বলল, "দোস্ত দোস্ত না রাহা।"

মৌরি কান্নার অভিনয় করে কপাল চাপড়ে দুজনে একসাথে হেসে ফেলল।

আশমিন নুরকে কোলে তুলে সদর দরজা দিয়ে সোজা ভেতরে চলে গেল। মুরব্বি কয়েকজন থামিয়ে বরণের কথা বললে সে শান্ত গলায় বলল, "প্রয়োজন নেই। আমার জীবনে তার বরণ হয়ে গেছে। আর কারোর বরণ করতে হবে না।"

আশমিনের সোজাসাপটা উত্তরে আর কেউ কথা বলার সাহস পেল না। নুরের লাগেজ নিয়ে ফুলি আশমিনকে অনুসরণ করল। আশমিনের রুমের সামনে কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। লুবানা দলনেতার মতো দাঁড়িয়ে আছে। আশমিন ভ্রু কুঁচকে বলল, "কী চাই?"

"টাকা চাই। নোট ছাড়ো, রুমে ঢুকো।"

আশমিন আশ্চর্য গলায় বলল, "কীসের টাকা? রুম তো সাজানোই হয়নি। তোদের টাকা দেবো কীজন্য?"

"ভাইয়া, টাকা দাও। তুমি রুম সাজাতে দাওনি, এটা কি আমাদের দোষ? একদম বাহানা করবে না।"

আশমিন স্মিত হাসল। অস্বস্তিতে গাঁট হয়ে থাকা নুরের দিকে চোখ বুলাল একবার। অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা সানভির দিকে ইশারা করে বলল, "সানের কাছ থেকে নিয়ে নে।"

খুশি হয়ে দরজা ছেড়ে দিলো লুবানা। অসহায় মুখে দাঁড়িয়ে থাকা সানভির কাছে ছুটে গেল তারা। এই ফাঁকে আশমিন টুপ করে রুমে ঢুকে পড়ল। সে জানে সানভির কাছে কোনো ক্যাশ নেই। তবুও সানভিকে দেখিয়ে দিয়েছে সে। সানভির বর্তমান অবস্থা ভেবেই মুচকি হাসল সে। আশমিনের হাসি দেখে গা জ্বলে গেল নুরের। একে তো অনুমতি না নিয়েই নির্লজ্জের মতো তাকে কোলে তুলে নিয়েছে। তার ওপর আবার হাসছে। নিশ্চয়ই কোনো অসভ্য চিন্তা করে মনে মনে খুশি হয়ে যাচ্ছে এই অশ্লীল লোকটা। রাগে নুরের নাক-মুখ লাল হয়ে গেল। সে মোচড়া-মুচড়ি করতে করতে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "এমন অসভ্যের মতো ধরে রেখেছেন কেন? ছাড়ুন আমাকে।"

আশমিন যেন এই কথার অপেক্ষায়ই ছিল। সে সাথে সাথেই নুরকে ছেড়ে দিলো। ফলাফল হিসেবে আশমিনের রুমের দামি থ্রিডি টাইলস দেখার সৌভাগ্য হয়ে গেল নুরের। কোমরের হাড়ে টনটনে ব্যথার উপস্থিতি আঘাতের মাত্রার হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে গেল হাতে-কলমে। নুরের বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে আশমিন চিন্তিত হওয়ার ভান করে বলল, "ব্যথা পেয়েছ, দেখি কোথায় লাগল?"

আশমিন এগিয়ে যেতেই নুর খ্যাঁকিয়ে উঠল। ঝাঁঝালো গলায় বলল, "একদম ন্যাকামি করবেন না। ইচ্ছে করে ফেলে এখন আদিখ্যেতা দেখানো হচ্ছে? দূর হন সামনে থেকে।"

আশমিন সরু চোখে তাকাল নুরের দিকে। নুরের গলার স্বর স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা উঁচু হয়েছে। আশমিনের মেজাজ খারাপ হলেও মুখে প্রকাশ

করল না সে। রয়েসয়ে নুরের সামনে বসল। সে খিঁচে যাওয়া মস্তিষ্ক ঠান্ডা করে হিমশীতল কণ্ঠে বলল, "নুর, প্রথম আর শেষবারের মতো বলছি, তুমি আমার স্ত্রী। সেটা তুমি মানো আর নাই-বা মানো। তবে এরপর থেকে কখনো আমার সাথে চ্যাঁচামেচি করবে না। আমার পছন্দ নয়। রাগ হোক, অভিমান হোক, আমাকে বলবে। প্রয়োজন হলে সারারাত রুমের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে। তবুও চ্যাঁচামেচি করবে না। এটাই একমাত্র অনুরোধ।"

নুর কিছু বলল না। দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে রইল। কোমরের ব্যথায় দাঁড়ানো সম্ভব হবে না মনে হয়। আর এই লোক অনুরোধের ডালি খুলে বসেছে। অসহ্য! নুর ঠিক করল সে রোজ সকালে অ্যালার্ম-ঘড়ির মতো চিৎকার করে বেজে উঠবে।

ফ্লোরে পড়ে থাকা নুরকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলো আশমিন। নুরের ব্যথায় জর্জরিত মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হলো খুব। তাকে আস্তে করে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বলল, "কোমর টিপে দেবো?"

নুর চোখ গরম করে তাকাতেই আশমিন আমতা আমতা করে বলল, "রেস্ট নাও। আমি মৌরিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যা বলার ওকেই বলো।"

আশমিন নুরের পা বিছানায় তুলে তাকে খাটের সাথে হেলান দিয়ে বসাল। পিঠের নিচে বালিশ দিয়ে নরম গলায় বলল, "বেশি ব্যথা পেয়েছ? ডাক্তার ডাকব?"

"প্রয়োজন নেই।"

আশমিন আর কথা বাড়াল না। উপরের শেরওয়ানি খুলে পাতলা পাঞ্জাবি পরে নির্লিপ্ত নুরের দিকে তাকাল।

"আমি বাইরে যাচ্ছি। আসতে লেইট হবে। ফ্রেশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।"

হাতের মোবাইল নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল আশমিন। নুর সেদিকে ধ্যান দিলো না। তার মনটা বিষিয়ে আছে। মায়ের সাথে কথা বলার জন্য হাঁসফাঁস লাগছে। আশিয়ান আর মায়ের অভিমান তাকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

একদল মেয়ে ঘিরে ধরেছে সানভিকে। সানভি অসহায় গলায় বলল, "বিশ্বাস করুন, আমার কাছে এই মুহূর্তে কোনো টাকা নেই।"

লুবানা তেড়ে গেল। তেড়ে গিয়ে বলল, "একদম মিথ্যা বলবেন না, ক্যাবলা মিয়াঁ। ভাইয়া নিজে বলেছে আপনার থেকে টাকা নিতে। আর আপনি বলছেন টাকা নেই! ভালোয় ভালোয় টাকা বের করুন।"

সানভি মুখ কালো করে ফেলল। আশমিন ইচ্ছে করে তাকে এখানে ফাঁসিয়ে দিয়ে গেছে। সে মিনমিনে গলায় বলল, "কাল দিয়ে দেবো। আজ নেই। সত্যি!"

লুবানা জহুরির চোখে পরখ করল সানভিকে। চোখ ছোটো ছোটো করে বলল, "মনে থাকে যেন। কাল এদিক-সেদিক হলে আপনার খবর আছে।"

সানভিকে শাসিয়ে লুবানা সবাইকে নিয়ে চলে গেল। সানভি হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। মনে হলো ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে।

"ভাবি, ভেতরে আইমু?"

নুর দরজার দিকে তাকিয়ে ধীর গলায় বলল, "আসো।"

ফুলি লাগেজ হাতে ভেতরে ঢুকল। লাগেজ এক কোনায় রাখতে রাখতে চঞ্চল গলায় বলল, "আফনের কাপড়চোপড় সব লইয়া আইলাম। ভাইজান ঘরে আছিল হেল্লাইগা বাইরে খাড়াইয়া আছিলাম। এই হানেই রাখি?"

নুর মাথা নেড়ে সায় জানাল।

"আর কিছু লাগব, ভাবি?"

"না, তোমার নাম কী?"

"আমার নাম ফুলবানু। বেবাকে ফুলি কইয়া ডাকে।"

নুর হাসল। মেয়েটা খুব সরল। মায়াবী মুখে সরলতা যেন উপচে পড়ছে। আসার পর থেকে কামিনী চৌধুরীকে একবারের জন্যও দেখেনি সে। তাই ফুলিকে জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের বড়ো ম্যাডাম কোথায়?"

"ম্যাডাম তো রুমে শুইয়া রইছে। হের বলে মাথা ব্যথা করতাছে। কেউরে ওই রুমে যাইতে মানা করছে।"

নুর হাসল। ফুলির মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "যাও, তবে যাওয়ার আগে লাগেজটা আমার সামনে বিছানায় রেখে যাও। পারবে তো? সামনে আনো। আমিও ধরছি সাথে।"

নুর আর ফুলি মিলে লাগেজ বিছানায় তুলে ফেলল। ফুলি একটু ইতস্তত গলায় বলল, "লাগেজে তো ময়লা লাইগা আছে। বিছানা নষ্ট হইব। ভাইজান জানলে রাগ করব, ভাবি।"

"কিচ্ছু হবে না। তুমি যাও। দরজাটা লক করে যেয়ো।"

ফুলি চলে যেতেই নুর তার লাগেজ খুলল। ল্যাপটপ আর ফোন বের করে খাটে রাখল সে। গ্যালারি ঘেঁটে কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা পেয়ে মুখে বক্র হাসি দেখা দিলো তার। দেশের বিখ্যাত কয়েকটা নিউজ চ্যানেলে ছবিগুলো সেন্ড করতে

গিয়ে দেখল তার ফোনে আর ল্যাপটপে ইন্টারনেট কানেকশন কাজ করছে না। এমনকি তার ফোনে কোনো নেটওয়ার্কই নেই। নুরের কপালে চিন্তার ছাপ দেখা গেল। এটা কীভাবে সম্ভব!

গাড়িতে বসে থাকা আশমিন নিঃশব্দে হাসল। ফোনের স্ক্রিনে ভাসা বউয়ের চিন্তাগ্রস্ত মুখটা খুব আদুরে লাগল তার। গুনগুন করে গান গাইল সে, "তুমি আমার ঘুড়ি, আমার হাতে নাটাই। যেখানেই উড়ে বেড়াও, আমার আকাশ পুরোটাই।"

আজকে রাতটা তার জন্য খুব স্পেশাল। অনেক দিনের স্বপ্ন আজ তার ঘরে সত্যি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার পরিবারকে ধ্বংসের পাঁয়তারা করছে। এমন দৃশ্য তার স্বপ্নের কোথাও ছিল? বিরক্তিতে আশমিনের কপাল কুঁচকে গেল। বাসররাতে বউয়ের সাথে এক্কা-দোক্কা না খেলে সে বাপের ডাকে বেইমান স্বামীর মতো বউ ফেলে ছুটে যাচ্ছে! এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন বাবা তার কপালেই ছিল? ন্যূনতম ভদ্রতা জ্ঞান নেই ভদ্রলোকের। কোথায় ছেলেকে বাসর করতে দেবেন। তা না করে রাত-বিরেতে জরুরি তলব করে বসে আছেন। মাঝরাতে পার্টি অফিসে গিয়ে বসে থাকার লজিক বুঝল না সে। থমথমে গলায় আশমিন সামনে বসা সানভিকে বলল, "সান, ভালো দেখে একটা বাবা খুঁজো তো। আমি নিজের জন্য কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন একজন বাবা এডপ্ট করতে চাইছি।"

সানভি চকিত চোখে তাকাল আশমিনের দিকে। বাবা এডপ্ট করবে মানে? এ আবার কী কথা! স্যার জানলে কী বলবেন? বাবা হিসেবে বড়ো স্যারের কোনো তুলনাই হয় না। অমন একটা নিষ্পাপ বাবা কি-না তার স্যার বদলে ফেলতে চাইছে! কী সাংঘাতিক কথাবার্তা! আশমিন অবশ্য সানভির অভিব্যক্তি দেখার অপেক্ষায় নেই। সে তার বউ দেখতে ব্যস্ত। ক্যামেরাগুলো ঠিকঠাক কাজ করছে। আরও কয়েকটা লাগিয়ে দেবে সময় করে। অবশ্য বাড়ির প্রতিটি অ্যাঙ্গেলে ক্যামেরা লাগিয়েছে সে। তার চোখের আড়ালে কিছুই নেই। বউ আর মা কাউকে বিশ্বাস নেই। সবকিছু নজরে রাখতে হবে।

রুমের বাইরে থেকে মৌরি দরজায় নক করে বলল, "নুর, দরজা খোল।"

নুর বিরক্ত সূচক শব্দ করে দ্রুত হাতে ল্যাপটপ আর ফোন আগের জায়গায় রেখে ধীর গলায় বলল, "দরজা খোলা, আপু। জোরে ধাক্কা দিন।"

CamScanner

মৌরি ভেতরে ঢুকে হাসিমুখে বলল, "বিরক্ত করলাম? তুমি কি ব্যস্ত ছিলে?"

নুর অপ্রস্তুত হাসল, "আরে না, আপু। শাড়ি চেইঞ্জ করার ট্রাই করছিলাম। এত ভারি শাড়িতে হাঁসফাঁস লাগছে।"

"এসো, আমি সাহায্য করছি।"

নুর এগিয়ে গেল। মৌরি নুরের শাড়ির সব-কটা পিন যত্ন সহকারে খুলে দিলো।

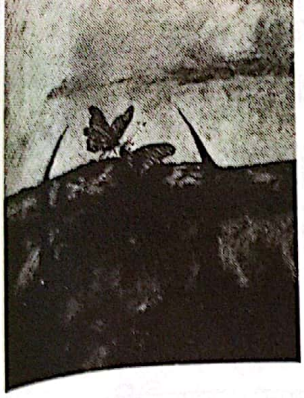
"ওপাশে চেইঞ্জিং রুম আছে। শাড়িটা বদলে ফ্রেশ হয়ে এসো। হালকা লাগবে নিজেকে। একা যেতে পারবে তো? আশমিন বলল ব্যথা পেয়েছ? নুর হালকা হেসে বলল, "পারব, আপু। সামান্য ব্যথা পেয়েছি।"

মৌরি কথা বাড়াল না। নুর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। মৌরি বুঝল এই মেয়ে সাহায্য চাইবে না। তাই সে নিজেই এগিয়ে গেল। নুরের বাহু ধরে বলল, "আমি নিয়ে যাচ্ছি। এমন ব্যথা পেলে কীভাবে, বলো তো?"

নুর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বলতে ইচ্ছে হলো, এটা আপনার বন্ধুর কুকর্ম। অথচ মুখে কিছু বলল না সে। চুপচাপ মৌরির সাথে চলে গেল ফ্রেশ হতে।

FREE PDF PETE FOLLOW TELEGRAM, CLICK KORUN





আমজাদ চৌধুরীর মুখোমুখি বসে আছে আশমিন। ছেলের কুঁচকে রাখা কপাল দেখে মনে মনে একচোট হাসলেন আমজাদ চৌধুরী। আশমিন বাবার হাবভাব বুঝেও চুপ করে বসে রইল। আমজাদ চৌধুরী নীরবতা ভেঙে ব্যঙ্গাত্মক হেসে বললেন, "কপাল কুঁচকে রেখেছ কেন? আজ বিয়ে করলে মাত্র, একদিনেই এই অবস্থা? এখনো তো সারাজীবন পড়ে আছে।"

বাবার টিপ্পনী বুঝল আশমিন। চোখেমুখে হতাশা এনে গম্ভীর গলায় বলল, "সারাজীবন পড়েই থাকতে হবে। এমন চলতে থাকলে তো আর বউ টিকবে না। কোথায় বউকে নিয়ে চাঁদ–তারার গল্প করব। তা না করে এখানে ব্যাঙের মতো হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছি। বাবাভক্ত ছেলে হলে যা হয় আরকি। এক ফোনকলেই উন্মাদ প্রেমিকের মতো বউ ফেলে ছুটে এসে রাত-দুপুরে বাবার অফিসে হাজিরা দিতে হচ্ছে।"

আমজাদ চৌধুরী হতভম্ব হয়ে গেলেন। বাবাভক্ত মানে? কী সাংঘাতিক মিথ্যা কথা! জন্মের পর থেকে এই ছেলে কোনোদিন তার কথা শুনেছে? উনত্রিশ বছরের ইতিহাস ঘেঁটে এমন কোনো ঘটনা আমজাদ চৌধুরীর মনে পড়ল না। তিনি শাসানোর ভঙ্গিতে বললেন, "একদম বাজে বকবে না।"

"শুরুটা কে করেছিল?"

আশমিনের তীর্যক উত্তরে আমজাদ চৌধুরী দমলেন। এই ছেলেকে আর ঘেঁটে কাজ নেই। তিনি সরাসরি মূল প্রসঙ্গে চলে গেলেন, "আসন্ন নির্বাচনে আমার জায়গায় তুমি এমপি পদে দাঁড়াচ্ছ। কাল সবার সামনে ঘোষণা দেবো আমি।"

আশমিন নড়েচড়ে বসল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আমজাদ চৌধুরীর দিকে, "আমি রাজনীতিতে জড়াতে চাই না, আব্বু। কথাটা তোমার চেয়ে ভালো আর কে জানে? তবুও হুট করেই এই সিদ্ধান্তের মানে কী?"

"আমার পরে সবকিছু তো তুমিই সামলাবে। আর একজন নেতা হিসেবে তুমি আমার চেয়েও যোগ্য এবং সামর্থ্যবান। তাহলে অসুবিধা কোথায়?"

"এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা অনেক আগেই হয়ে গেছে, আব্বু। আমি নির্বাচন করছি না। তোমার স্থানে তুমিই যোগ্য। অযথা ঝামেলা করো না।"

"এটা আমার আদেশ, আশমিন। শেষ অনুরোধও। আমার কথাটা রাখো। বিজনেস আমি সামলে নেব। রাজনীতিতে তোমার পথপ্রদর্শক হব। ছায়ার মতো সবসময় আমাকে তোমার পাশে পাবে। তুমি আর অমত করো না, প্লিজ!"

এ পর্যায়ে আমজাদ চৌধুরীর গলা অসহায় শোনাল। রাজনীতি আমজাদ চৌধুরীর কাছে নেশার মতো। নিজ ইচ্ছায় তিনি রাজনীতি থেকে সরে আসবেন না। তাহলে কে সরাচ্ছে? কে আছে এসবের পিছনে?

আশমিন বাবার দিকে সূক্ষ্ম চোখে তাকাল, "কেউ কি তোমাকে রাজনীতি ছাড়তে ফোর্স করছে, আব্বু? তার নামটা বলো? বাকিটা আমি বুঝে নেব।"

আমজাদ চৌধুরী মলিন হাসলেন। ছেলের দিকে স্নেহের চোখে তাকিয়ে বললেম, "কেউ ফোর্স করছে না। একটু রিলাক্স করতে মন চাইছে। জনসেবা তো অনেক হলো। এবার না-হয় একটু নিজেকে সময় দেওয়া যাক। আমার দায়িত্ব আমি তোমার কাঁধে তুলে দিচ্ছি। আমি জানি, তুমি দায়িত্বের অবহেলা করবে না।"

আশমিন নীরব রইল। আমজাদ চৌধুরী ছেলের নীরবতাকেই সম্মতি হিসেবে ধরে নিলেন। প্রতিশ্রুতি রাখতে হবে তাঁর। রাজনীতি তাঁর রক্তে মিশে আছে। এভাবে ছাড়তে কষ্ট হচ্ছে,. কিন্তু কিছু করার নেই। পরিস্থিতির কাছে সবাই অসহায়।

"বাসায় যাবে না?"

"হুম, তুমি যাও। আমি পরে আসছি।"

আশমিন কথা বাড়াল না। সূক্ষ্ম চোখে দেখল বাবাকে। বেরিয়ে যাওয়ার সময় শান্ত স্বরে বলল, "আমি এমন কিছু জানতে চাই না বাবা, যা আমাকে ভেতর থেকে ভেঙেচুরে একাকার করে দেবে। আমি শেষ পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করব যাতে অতীতের পাতা খোলা না হয়।"

আমজাদ চৌধুরী অসহায় চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি নিজেও চান না অতীত সামনে আসুক। মায়ের অতীত ছেলের জন্য বিব্রতকর হতে পারে। কামিনী মানুষ হিসেবে যেমনই হন না কেন, মা হিসেবে তার জুড়ি মেলা ভার। স্ত্রী হিসেবেও তিনি নিজের সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করছেন তাঁকে সুখী করার। সবকিছু ঠিকই চলছিল। তারপরও যেন সবকিছু কেমন আলগা হয়ে গেল। কিছু অপ্রিয় সত্যি তার সাজানো সংসার তছনছ করে দিলো। সেই

অপ্রিয় সত্য তার ছেলে পর্যন্ত কখনো না পৌঁছাক, মনে মনে প্রার্থণা করেন আমজাদ চৌধুরী।

আশমিন যখন বাসায় ফিরল তখন ঘড়ির কাঁটা দুটোর ঘরে ঝিমাচ্ছে। নুর পুরো বিছানা দখল করে ঘুমিয়ে আছে। পরনে তার পাতলা অফ হোয়াইট জামদানি শাড়ি। আশমিন রুমে ঢুকে নিষ্পলক চোখে কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইল তার বিছানা দখল করে থাকা সাদা গোলাপের দিকে। ইচ্ছে হলো এখনই গিয়ে উষ্ণ পরশে ভিজিয়ে দিতে। পাঞ্জাবির বোতাম খুলতে খুলতে আড়চোখে পর্যবেক্ষণ করল নুরকে। শরীরের উন্মুক্ত আকর্ষণীয় ভাঁজে চোখ বুলিয়ে মাথা চুলকাল সে। অসভ্য মেয়েটা তার ভাবনার চেয়েও বেশি সুন্দর! তার কপালে ঘাম ছুটে গেছে। শরীরের অনুভূতির জোয়ার ঢেউ খেলে যেতেই দ্রুত পায়ে ওয়াশরুমে ঢুকল সে। ফ্রেশ হতে যেতে যেতে ভাবল, আজ সে বউকে জাপটে ধরে ঘুমাবে। বাসর-টাসর তার কপালে নেই। যে আগ্নেয়গিরি সে ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছে, সে এই চৌধুরী-বাড়ি জ্বালিয়ে তবেই দম নেবে। সে কি ঘুমের সুযোগ নিয়ে কয়েকটা চুমু খেয়ে নেবে? ভাবনাটা মনে ধরল তার। ব্যাপরটা নিঃশব্দে ঘটাতে হবে। জেগে গেলেই সমস্যা!

এমপি আমজাদ চৌধুরীর ছেলের রিসিপশন পার্টি উপলক্ষ্যে চাঁদের হাট বসেছে চৌধুরী-বাড়িতে। চারদিকের ঝলমলে আলোর ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে সবার। চৌধুরী-বাড়ির একমাত্র ছেলের বিয়ে উপলক্ষ্যে নতুন সাজে সেজেছে চৌধুরী-বাড়ির প্রতিটি কোনা। নুরকে রানিদের মতো সাজানো হয়েছে। স্টেজে আশমিনের পাশেই বসে আছে সে। আশমিন খুব সাধারণভাবেই নিজেকে উপস্থাপন করেছে। নিত্যকার সাদা পাঞ্জাবি পরেই নূরের পাশে বসে আছে। চারদিকের কোলাহলে সে খুব বিরক্ত। কয়েক হাত দূরে ব্যস্ত আলিকে ডেকে বলল, "আমার বেরুতে হবে। জরুরি কাজ আছে। আব্বুকে বল ফর্মালিটি তাড়াতাড়ি শেষ করতে।"

"মাথা খারাপ হয়েছে! কত বড়ো বড়ো মানুষ এসেছে এখানে, তা জেনেও অবুঝের মতো করছিস কেন? শান্ত হয়ে বস। অনুষ্ঠান ফেলে উঠে গেলে অযথা কন্ট্রোভার্সি হবে। চারিদিকে বড়ো বড়ো নিউজ চ্যানেল থেকে লোক এসেছে। একটা দিনই তো। একটু ম্যানেজ কর।"

আশমিন আর কিছু বলল না। আলির লম্বা ভাষণে তার মেজাজ আরও বেশি খারাপ হয়ে গেছে। সানভি আহাম্মকটাও আশে পাশে নেই। আজ সারারাত সুইমিংপুলের পাশে দাঁড় করিয়ে মশার কামড় খাইয়ে ডেঙ্গু রোগী বানিয়ে ছাড়বে অসভ্যটাকে। আশমিনের মেজাজ খিঁচে থাকলেও সে সবার

সাথে খুব আন্তরিকভাবে কথা বলছে। আজ আর কামিনী চৌধুরী দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে থাকেননি। সব সময়ের মতো স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে গেস্টদের অ্যাটেন্ড করছেন। একটা পুঁচকে মেয়ের ভয়ে তিনি লুকিয়ে বেড়াবেন, তা তো হতে পারে না। চৌধুরী-বাড়ির বউ হওয়ার সাধ চিরতরে ঘুচিয়ে দেবেন তিনি। মনে মনে দাঁত পিষছেন কামিনী চৌধুরী। শিকদারদের ছায়া তিনি তাঁর ছেলের জীবনে পড়তে দেবেন না। মিজু সিদ্দিককে যা বলার বলেছেন তিনি। কয়েক দিনের মধ্যেই তারা দেশে ফিরবেন। সরাসরি এই বাড়িতেই উঠতে বলেছেন। এই মেয়েকে এমনভাবে পথ থেকে সরাতে হবে, যাতে সাপও মরে আর লাঠিও না ভাঙে। নুরের দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসলেন তিনি।

আশমিন নিজের খিঁচে যাওয়া মেজাজ সাইডে রেখে নুরের দিকে চেপে বসল। নুরের কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, "কোমর ব্যথা সেরে গেছে?"

নুর কপাল কুঁচকে তাকাল। কালকের তুলনায় ব্যথার মাত্রা অনেকটা কমে এসেছে। সহনীয় পর্যায়ে বলা চলে। নুরকে চুপ থাকতে দেখে অসভ্যের মতো হেসে বলল, "কমবে না! সারারাত আলতো হাতে টিপে দিয়েছি। না কমে যাবে কোথায়? সব আমার নরম হাতের জাদু।"

নুর ছিটকে দূরে সরে গেল। হতভম্ব চোখে তাকাল আশমিনের দিকে, "টিপে দিয়েছেন মানে? আমাকে ছুঁয়েছেন কোন সাহসে? অসভ্য বর্বর লোক! দূরে যান।"

আশমিন মনে মনে হো-হো করে হেসে উঠল। মুখের ভাব গম্ভীর করে বলল, "এই সাহসটা স্বামীর ক্যাটাগরিতে পাওয়া যায়। বড়োই নেক সাহস বলে প্রসিদ্ধ সে। আসো, আরেকটু টিপে দিই।"

নুর কটমট করে তাকাল। কত বড়ো নির্লজ্জ হলে এভাবে আবার বলতে পারছে! আর এই নরম হাত মানে কী? এই লোকের হাত কোন অ্যাঙ্গেল থেকে নরম? এমন মিথ্যাচারও সহ্য করতে হবে তাকে?

আশমিন বুঝল নুরের মেজাজ সপ্তমে। সে এক হাতে কোমর চেপে নিজের কাছে আনল নুরকে। দুলতে থাকা শরীরের কম্পন অনুভব করে হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। কথা বলার ভান করে আলতো চুমু খেল নুরের কানের লতিতে। কেঁপে ওঠা নুর অবিশ্বাস্য চোখে তাকাল আশমিনের দিকে। চারদিকে ক্যামেরার ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। সবার ক্যামেরা নতুন দম্পতির দিকেই তাক করা। নুর অপ্রস্তুত হলো। রাগী চোখে তাকাল

আশমিনের দিকে। আশমিন আহ্লাদী গলায় বলল, "এভাবে তাকিয়ো না, বউ। আমার মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। তাই তোমারটাও একটু খারাপ করে দিয়ে গেলাম। আবার মনে করো না ভালোবাসে চুমু খেয়েছি। কুমিরের প্রেমিকাকে ভালোবাসে চুমু খাওয়ার প্রশ্নই আসে না। মাঝেমাঝে ফর্মালিটি রক্ষা করতে টুপটাপ চুমু খাব। তুমি আবার ভুল বুঝো না কিন্তু।"

নুর প্রতিক্রিয়া জানাতে ভুলে গেল। একটা মানুষ এমন আহ্লাদী গলায় এত ফালতু কথা কীভাবে বলতে পারে! নুরের ভাবনার মধ্যেই আশমিন উঠে দাঁড়িয়েছে।

"শোনো বউ, আমার ভয়ংকর প্রেম পাচ্ছে। চলো, একটু রুম থেকে ঘুরে আসি।"

আশমিনের আহ্লাদী কথায় শান্ত চোখে তাকাল নুর। নিজ থেকে আরেকটু চেপে বসে ফিসফিস করে নেশা ধরা গলায় বলল, "কেন নয়? আমিও তো তাই চাই। রুমে গিয়ে আপনি আমার মাঝে হারিয়ে যাবেন। আর ঠিক তখনই আপনার বুকে ধারালো ছুরি চালিয়ে দেবো আমি। আপনার একমাত্র সুন্দরী, আদরের একমাত্র বউ। এখনই চলুন না! শুভকাজে দেরি করতে নেই।"

নুরের আহ্লাদী কথায় গলে গেল আশমিন। সে দ্বিগুণ আহ্লাদী গলায় বলল, "এভাবে বলো না, বউ। কামড়ে দিতে ইচ্ছে করে। আচ্ছা শোনো না, আমি একটু গেস্টদের সাথে কথা বলতে যাচ্ছি। আমাকে মিস করলে একটা মিসড কল দেবে। আমি চলে আসব। যদিও তার প্রয়োজন হবে না। আমি সারাক্ষণ তোমাকে চোখে চোখেই রাখব। বলা তো যায় না, কখন তোমার কুমির মহাশয় এসে হাজির হয়। আর তুমিও অসভ্যের মতো তার বিশ্রী ঠোঁটে চুমু খেতে যাও।"

নুরের গা গুলিয়ে উঠল। মনে হচ্ছে এক্ষুনি বমি করে ভাসিয়ে দেবে। আশমিন আর দাঁড়াল না। কাল রাতের প্রতিশোধ সে পুরোপুরি উসুল করে ছাড়বে। এত শখের বউয়ের দিকে চেয়ে থেকেই রাত শেষ করতে হলো! এ কষ্ট সে কোন ব্যাংকে রাখবে? আশমিন নাদান শিশুর মতো উঠে চলে গেল। নুরের ইচ্ছে হলো হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে এই লোকের মাথাটার একটা মজাদার ভর্তা বানিয়ে ফেলতে। ইতর একটা! এই অসভ্য লোকের প্রেমে কীভাবে পড়েছিল সে?

ঘণ্টাখানেক পর আমজাদ চৌধুরী আর কামিনী চৌধুরী স্টেজে উঠে এলেন। আশমিন কামিনী চৌধুরীকে হাত ধরে স্টেজে উঠতে সাহায্য করল। আশমিনকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাসিমুখে আলিঙ্গন করলেন আমজাদ চৌধুরী।

কামিনী চৌধুরী হাসিমুখে নুরের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। নুরের ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি গা জ্বালিয়ে দিচ্ছে তাঁর। ইচ্ছে করছে পেট্রোল ঢেলে এক্ষুনি এই মেয়েকে পুড়িয়ে মারতে। নিজেকে শান্ত করলেন কামিনী চৌধুরী। রেগে গেলে চলবে না। উড়তে থাকুক, যত পারে। যখন মাটিতে এনে পিষে মারবেন তখন বুঝবে কামিনী চৌধুরী কী জিনিস।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবার সামানে দাঁড়িয়ে আশমিনকে এক হাতে জড়িয়ে ধরলেন আমজাদ চৌধুরী। হাসিমুখে বিনয়ের সাথে বললেন, "আপনারা আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে এসেছেন, আমি খুব খুশি হয়েছি। আজ আমার ছেলের জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন। সে নতুন জীবনে পা রেখেছে। আপনাদের দোয়া আর ভালোবাসাই একমাত্র কাম্য। তবে এখানে আরেকটি উদ্দেশ্যে সবাইকে একত্রিত করা হয়েছে। আমি আপনাদের আরেকটি বিষয় জানাতে চাই। আপনারা জানেন, আমি ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতির সাথে জড়িত। আমার চলার পথে আমি কখনো জনগণের কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু ভাবিনি। দীর্ঘ বত্রিশ বছর আমি রাজনীতিকে সঙ্গে নিয়ে কাটিয়েছি। এবার অবসর নেওয়ার সময়। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আমি আমার ছেলের হাতে তুলে দিতে চাই। আশমিনকে আপনারা সবাই কম-বেশি চিনেন। আমার যোগ্য উত্তরসূরি সে। আপনারা আমার পাশে থেকে আমাকে যেভাবে সাপোর্ট করে গিয়েছেন, অনুরোধ রইল, আমার ছেলেকেও সেভাবে আপনাদের ছায়াতলে রাখবেন।"

আমজাদ চৌধুরীর দীর্ঘ বক্তব্যের পর সবার হাততালিতে মুখরিত হলো পরিবেশ। নুর কামিনী চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে রহস্যময়ী হেসে নিজেও হাত তালি দিলো। আশমিন চোখমুখ স্থির রেখে তার বাবার দিকে তাকিয়ে রইল। আমজাদ চৌধুরীর চোখেও খুশির হাসি। হাসি নেই একমাত্র কামিনী চৌধুরীর মুখে। স্বামীর এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না তাঁর। নুর কামিনী চৌধুরীর ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে মন খুলে হাসল। অনেক দিন পর বুকের ভেতরে একটু শান্তির বাতাস বইছে। এই তো সবে শুরু। তোমার সব অহংকার একটু একটু করে মাটিতে মিশিয়ে দেবো, কামিনী চৌধুরী। মনে মনে প্রমাদ গুনল নুর। আশমিন নুরের উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে হালকা হাসল। আহা, কী নিখুঁত পরিকল্পনা! এই না হলে তার বউ!

অনুষ্ঠান শেষ হতে অনেক রাত হয়ে গেছে। শিকদার-বাড়ি থেকে কাসেম শিকদার-সহ নুরের চাচা-মামারা সবাই এসেছেন। জ্যামের জন্য আসতে আসতে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে তাদের। অমির সাথে আশিয়ানকে

দেখে নূরের মুখে হাসি ফুটে উঠল। ভাইকে শক্ত করে জড়িয়ে রাখল নিজের বুকে।

"আম্মু কেমন আছে, ভাইয়া?"

"আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছে। তোর জন্য মন খারাপ করে বসে থাকে সারাক্ষণ। তুই চিন্তা করিস না। আম্মুকে আমি সামলে নেব। তুই মন খারাপ করিস না।"

নূরের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আশমিন নূরের মলিন মুখটা দেখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। সময় এক গতিতে চলবে না। তার বিশ্বাস, তাদের জীবনেও ভালো সময় আসবে। সেই দিনের অপেক্ষায় সে।

আশিয়ানকে দেখে এগিয়ে এসেছেন আমজাদ চৌধুরী, "কী অবস্থা, ব্রাদার ইয়াংম্যান?"

আশিয়ান লজ্জিত হয়ে চোখ নামিয়ে নিল। অনুতপ্ত গলায় বলল, "সরি, আংকেল। সেদিন আমি খুব বেয়াদবি করে ফেলেছি। আমার ব্যবহারের জন্য আমি খুবই দুঃখিত।"

আমজাদ চৌধুরী নিঃশব্দে হাসলেন। আশিয়ানের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "সরি হওয়ার কিছু নেই। তোমার রিয়্যাকশন যথার্থ ছিল। বাবা আমাদের আবেগ, ভালোবাসার জায়গা। সেখানে আঘাত করলে সন্তান বাঘের ন্যায় গর্জে উঠবে, এটাই তো স্বাভাবিক। তবে রাগকে সংযত করতে হবে। কিছু কিছু জায়গায় মাথা ঠান্ডা রেখে সঠিক সময়ের অপেক্ষা করতে হয়। রেগে গেলে তো হেরে গেলে। বুঝলে?"

আশিয়ান ঘাড় নাড়িয়ে সায় জানাল। আমজাদ চৌধুরীর কথা তার মনে ধরেছে। সেও না-হয় সঠিক সময়ের অপেক্ষায় থাকবে। বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ সে চৌধুরীদের থেকে কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নেবে। মনে মনে হাসল সে। নিজেদের ধ্বংসের হাতেখড়ি ভালো করেই শিখিয়ে দিচ্ছে।



"গ্রামের বাড়িতে আন্টিরা সুরক্ষিত না। ঢাকায় যেহেতু নিজেদের ফ্ল্যাট আছে সেহেতু এখানেই চলে আসলে ভালো হয়। অমির ব্যাবসা এখানে। আশিয়ান এখনো পড়াশোনা করছে। ও একা একা কীভাবে সবকিছু সামলাবে?"

কাসেম শিকদার বাঁকা চোখে তাকালেন আশমিনের দিকে। বাগানের কোনার বেঞ্চে বসে আছেন তাঁরা। আশমিনের কথাটা তার পছন্দ হয়নি। তাই তিনি তীর্যক গলায় বললেন, "ঢাকাতেই-বা ওরা কতটা সেইফ থাকবে? শত্রুরা তো এখন আত্মীয়ের বেশ ধরেছে। ওদের চিন্তা বাদ দিয়ে নিজের চিন্তা করো। নাফিজার জন্য আমরা সবাই আছি। ভাইয়ের পরিবারকে ভেসে যেতে দেবো না।"

আশমিন তীক্ষ্ণ চোখে ভদ্রলোককে দেখল। এই লোককে তার পছন্দ হচ্ছে না। অবাধ্য প্রেমিকার মতো বাঁকা বাঁকা কথা বলে যাচ্ছে শুরু থেকে। বউ কি কম ছিল? এখন চাচা-শ্বশুরও খোঁচা দিচ্ছে!

লতিফা চৌধুরী ঢাকায় আসেননি। লুবানাকে পাঠাতেও অমত করেছিলেন তিনি। কামিনী চৌধুরীর সেদিনের করা অপমান বড্ড গায়ে লেগেছে তাঁর। নেহাতই লোকে মন্দ বলবে তাই বিয়েতে উপস্থিত হয়েছিলেন। তবে বেশিক্ষণ থাকেননি সেখানে। হাজিরা দিয়েই দায় সেরেছেন। তবে লুবানাকে না পাঠিয়ে পারেননি। আশমিনের শান্ত গলার অনুরোধ ফেলতে পারেননি তিনি। এবার থেকে কামিনী চৌধুরীর সাথে দূরত্ব রেখেই চলবেন বলে ঠিক করেছেন। নিজের প্রাপ্য সম্মান নিজেকেই বুঝে নিতে হয়। যেখানে সম্মানহানি হয় সেখান থেকে দূরে থাকাই ভালো। লুবানা ভাইয়ের বিয়ে খুব একটা উপভোগ করতে পারেনি। মাকে ছাড়া তার ভালো লাগছে না। মৌরি আয়োজনের দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত। সেজেগুজে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া তেমন কোনো কাজ নেই তার। কিছুক্ষণ নুরের সাথে বসে রইল সে। একের পর এক মানুষ এসে নুরের সাথে আলাপ করছে। লুবানা সেখান থেকে উঠে এক পাশে গিয়ে চুপচাপ বসে রইল। আশমিন দূর থেকে লক্ষ করল লুবানাকে। বোনের গোমড়া মুখ দেখে কারণ আন্দাজ করল কিছুটা। সানভিকে পাঠাল তার

কাছে। পরিপাটি সানভি লুবানার সামনে গিয়ে দাঁত বের করে হাসল। গলায় খুশি খুশি ভাব এনে ডাকল, "মিস সাবানা।"

লুবানা খ্যাঁকিয়ে উঠল। এই লোক সবসময় তার নামের জানাজা পড়িয়ে দেয়। খ্যাঁকখ্যাঁক করে বলল, "আরেকবার আমার নাম উলটা-পালটা বললে আপনাকে জ্যান্ত সমাহিত করব আমি। আমাকে পিঞ্চ করার সাহস কোথায় পেলেন?"

সানভি অসহায় চোখ মুখে তাকিয়ে রইল। সে বারবার নামটা ভুল করে ফেলে। পুরোটাই অনিচ্ছাকৃত। তাই বলে এভাবে বলবে?

"আপনার টাকাটা দিতে এসেছি। কাল দিতে পারিনি তাই। এই নিন।"

লুবানার হাতে একটা খাম দিয়ে চলে গেল সানভি। লুবানা বিরক্ত চোখে তাকিয়ে রইল। লোকটাকে দেখলেই তার রাগ ওঠে। ছাগল একটা! তবে খামের ভেতরে টাকার বান্ডিল দেখে মন ভালো হয়ে গেল তার। ইচ্ছেমতো শপিং করা যাবে। লতিফা চৌধুরীকে কল করল সে। খুশি হলেই মায়ের কথা সবার আগে মনে হয়।

আশমিন কাসেম শিকদারের সাথে সৌজন্য আলাপ সেরে দ্রুত সেখান থেকে সরে পড়ল। মেজাজ খারাপের মাত্রা আস্তে আস্তে বেড়েই চলেছে। আমজাদ চৌধুরীকে বলে সানভিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। ড্রাইভিং সিটে আশমিনকে বসতে দেখে এক লাফে কলিজা গলায় এসে আটকে গেল সানভির। আজ আর প্রাণ নিয়ে ঘরে ফেরা হবে না। আজরাইল কোন রাস্তায় তার জন্য অপেক্ষা করছে কে জানে? কাঁপতে থাকা শরীরটা নিয়ে কোনরকম গাড়িতে উঠল সে।

"আহাম্মকের মতো বসে না থেকে সিটবেল্ট বাঁধো। অপদার্থ একটা!"

আশমিনের ধমকে সানভি নিশ্চিত হয়ে গেল আজই তার শেষ দিন। নিজের করা সমস্ত পাপের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে সিটবেল্ট বাঁধল সে।

গাড়ি হাইওয়েতে উল্কার গতিতে ছুটছে। আশেপাশে জনমানবের ছায়া নেই। দূরপাল্লার গাড়িগুলো শাঁ শাঁ করে তাদের পাশ কেটে চলে যাচ্ছে। সানভি চোখ বন্ধ করে ঘুমের ভান ধরে বসে আছে। নিজের মৃত্যু ঘুমের ভান ধরেই বরণ করে নেবে সে। চোখ খোলা রাখলে অ্যাকসিডেন্টের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। ভয়েই প্রাণপাখি উড়াল দেবে তার।

রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চারদিকে চোখ বুলাল আশমিন। গাড়ি থেমে গেছে দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সানভি। ঠোঁট গোল করে শ্বাস ছাড়ল সে। আশমিন গাড়ির দরজা খুলে এক পা বাইরে রেখে স্টেয়ারিং-এ কনুই ভর দিয়ে বসল। সানভির স্বস্তির নিঃশ্বাস আতঙ্কে বন্ধ হওয়ার জোগাড়। আশমিনের ভাবভঙ্গি সুবিধার লাগছে না। এই নীরব রাস্তায় আর কিছুক্ষণ থাকলে শেয়াল কুকুরের খাবার হতে হবে। শত্রুর তো আর অভাব নেই। এই নির্দয় মানুষটা নিজের কম শত্রু বানিয়ে রাখেনি। যেকোনো দিক থেকে আক্রমণ হতে পারে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না আশমিনের। দশ মিনিটের মাথায় বাহাদুরের গাড়ি এসে আশমিনের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। আশমিন তাকাল না সেদিকে। আয়েশ করে সিগারেট ধরিয়ে ঠোঁটে গুঁজল। বাহাদুর গাড়ি থেকে টেনে একটা আধবয়সি লোককে বের করে আনল। ধাক্কা দিয়ে আশমিনের পায়ের কাছে ফেলতেই লোকটা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, "আমাকে ছেড়ে দাও, বাবা। এবারের মতো মাফ করে দাও। আর কখনো এই কাজ করব না। আমি তোমার বাবার বয়সি।"

আশমিন ধোঁয়া উপরের দিকে ছাড়তে ছাড়তে বলল, "বাবা হলেও ছাড়তাম না। যা জানেন বলতে শুরু করুন। দাঁড়ি-কমাও যেন বাদ না পড়ে।"

লোকটা শুকনো ঢোক গিলল। আতঙ্কিত চোখে বাহাদুরের দিকে তাকাল একবার। বাহাদুর ইশারা করল বলতে।

"মেয়েটা আমিই ঠিক করে দিয়েছিলাম। পার্টিতে অনেক বড়ো বড়ো লোক আসে। তাদের মনোরঞ্জন করার জন্য রব্বানি স্যার হাই রেটেড কাউকে ভাড়া করতে বলেছিল।"

আশমিন সিগারেট ফেলে পা দিয়ে পিষে বলল, "আব্বুর সাথে গেল কীভাবে? আব্বু অফার করে ছিল?"

আশমিনের গলায় একটুও জড়তা নেই। লোকটা ইতস্তত গলায় বলল, "না, দলের এক সিনিয়র নেতা মেয়েটাকে স্যারের রুমে পাঠিয়ে ছিল। স্যার হালকা ড্রিংক করায় একটু নেশা হয়ে গিয়েছিল তার। সেই সুযোগেই মেয়েটা..."

"ডিড দে হ্যাভ ফিজিক্যাল ইন্টারকোর্স?"

সানভি চমকাল। আশমিনের পানির মতো ঠান্ডা গলায় বলা কথাটা হজম করতে কষ্ট হলো তার। কত সহজেই বলে ফেলল! এ কেমন ছেলে? বড়ো

স্যার মোটেও এমন মানুষ নন। ছেলে হিসেবে আশমিন দশের মধ্যে শূন্য পেল সানভির তরফ থেকে।

লোকটার মৌন থাকা আশমিনের মেজাজ খারাপ করল। আস্তে-ধীরে গাড়িতে রাখা রিভলবারটা বের করল সে। আহ্লাদী গলায় বলল, "প্রশ্নের উত্তরটা তাড়াতাড়ি দিন, কাকু। বাসায় বউ সেজেগুজে অপেক্ষা করছে। নতুন বিয়ে করেছি তো, বউ ছাড়া বেশিক্ষণ থাকতে পারি না।"

আশমিনের লজ্জা পাওয়ার ভান দেখে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল সানভি। লোকটাকেও সামান্য দ্বিধান্বিত দেখাল। অস্বস্তি ভরা গলায় বলল, "না, তবে মেয়েটা অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। তাকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় বের করে আনা হয় রুম থেকে।"

আশমিনের হুট করেই খুব তাড়া দেখিয়ে বলল, "ঠিক আছে। এখন যান।"

লোকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বিপদ কেটে যাওয়ার খুশিতে হাসতে হাসতে বিদায় নিল সেখান থেকে। কয়েক কদম এগিয়ে যেতেই পিছন থেকে গুলি করল আশমিন। বুলেট বুকের বাঁ পাশ এফোঁড়-ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেছে। সানভি রক্তশূন্য মুখে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে আছে সামনে। আশমিন নিষ্পাপ মুখ করে বলল, "সামনে থেকে মারতে খারাপ লাগছিল। বাবার বয়সি কি না!"

"কিন্তু উনি তো কিছু করেননি!"

আশমিন সানভির প্রশ্নে দাঁত কিড়মিড় করল, "কিছু করেনি মানে? বেয়াদবটাই সব করেছে। আব্বুর রুমে মেয়েটাকেও সে-ই পাঠিয়েছিল। ছবি আর ভিডিয়ো করেছে আব্বুকে ব্ল্যাকমেইল করতে। সেই ছবি আবার টাকার বিনিময়ে আমার বউয়ের কাছে বেঁচে দিয়েছে! ছি, ছি! বিবেক বলে কিছু নেই? আমার শিশু বউকে এরা অল্পবয়সে পাকিয়ে ফেলবে? যত্তসব আপদ!"

সানভি অসহায় চোখেমুখে বসে রইল। কিছু বলার নেই তার। এখান থেকে ফিরে গিয়ে নিজেকে গুম করে দেবে সে। জগৎ-সংসার তার জন্য নয়। এমন মিথ্যাচার শোনার চেয়ে সে অপারেশন করে কালা হয়ে যাবে। এমন কান থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। আশমিন সানভির অসহায়ত্ব দেখল না। বউয়ের হাতে বাবার স্ক্যান্ডেল ধরা পড়েছে। বিয়ে করে কোথায় বাসর করে বাচ্চার বাবা হবে। তা না করে বুড়ো বাপের কেলেঙ্কারি লোপাট করতে হচ্ছে। কপালে বিরক্তির ভাঁজ ফেলে সানভিকে বলল, "গাড়ি থেকে নামো। লাশ দাফন করার ব্যবস্থা করো। বাহাদুর তোমার সাথে যাবে।"

দৌড়ে আসা কান্নাটা টুপ করে গিলে নিল সানভি। এই খুন-খারাবি তার সহ্য হয় না। বাহাদুর যাবে শুনে কলিজায় পানি এলো তার। সানভি নামতেই আশমিন গাড়ি স্টার্ট করল। বাহাদুরের সাথে প্রয়োজনীয় কথা সেরে গন্তব্যে বেরিয়ে পড়ল সে।

নুরের পরিবারের সবাই কিছুক্ষণ আগেই চলে গিয়েছে। নুরের বুক ভার হয়ে আছে। আজ তারও যাওয়ার কথা ছিল। নাফিজা শিকদারের আদেশ অমান্য করতে মন সায় দেয়নি তার। সে জানে, মা তার পথ চেয়ে থাকবেন। তাকে না দেখে কষ্টও পাবেন খুব। তবে এভাবে সে বাড়িতে ফিরবে না। বিজয়ী হয়ে তবেই শিকদার-বাড়িতে পা রাখবে সে। তার আগে নয়।

রুমে বসে গয়না খুলছিল নুর। কামিনী চৌধুরী গটগট করে রুমে ঢুকল। নুর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না। নিজের মতো কানের দুল খুলতে ব্যস্ত সে। কামিনী চৌধুরী শক্ত হাতে তার বাহু ধরে দাঁড় করালেন তাকে। চোখে চোখ রেখে কটমট করে বললেন, "এসব তুই করেছিস না? তুই আমার স্বামীর কানে মন্ত্রণা দিয়েছিস। যে ছেলে কোনোদিন সরাসরি রাজনীতিতে জড়ায়নি, সে আজ নির্বাচন করতে রাজি হয়ে গেল? কী করেছিস তুই? কী বলে বশ করেছিস?"

নুর কামিনী চৌধুরীর থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল। ভ্রু কুঁচকে হেসে বলল, "রিলাক্স, মিসেস চৌধুরী। এত হাইপার হলে চলে? সবে তো শুরু হলো। এখনো যে অনেক দূর চলতে হবে। নিজেকে তৈরি রাখুন, মিসেস চৌধুরী। আপনার অহংকারের প্রত্যেকটা ভিত আমি একটা একটা করে ভাঙব।"

কামিনী চৌধুরী নিজের রাগ সামলাতে পারলেন না। চিৎকার করে বললেন, "কী চাস তুই? এ বাড়িতে কেন ঢুকেছিস? খুব লোভ, তাই না? এত বড়ো বাড়ি, টাকা-পয়সা, ক্ষমতা দেখে লোভ সামলাতে পারিসনি, তাই না? সব হাতিয়ে নিতে এসেছিস?"

নুর হাসল। আরেকটু কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, "আমার বাড়িতে এত চিৎকার চ্যাঁচামেচি করবেন না, মিসেস চৌধুরী। ঘাড় ধরে বের করে দেবো। আপনার এই তেজ মাখা বুলি পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে রাস্তায় বের করে দেবো। সো, নো সাউন্ড প্লিজ। আর আপনি এত রাগছেন কেন, বলুন তো? আপনার ছেলেই তো নমিনেশন পাচ্ছে। বাবার দায়িত্ব ছেলে পাবে এটাই তো স্বাভাবিক। নাকি অন্য কোনো গল্প আছে?"

কামিনী চৌধুরী আগুন চোখে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর সাজানো সংসার আজ এই মেয়ের দখলে। ভাবতেই রাগে গা দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে তাঁর। আমজাদ চৌধুরীকে এর জবাব দিতেই হবে। তারপর এই মেয়ের দেমাগ ভাঙবেন তিনি। প্রয়োজনে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবেন। তাঁর সংসারে এই কালনাগিনির ছায়া কিছুতেই সহ্য করবেন না। রাগ লুকিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলেন তিনি। অবজ্ঞার গলায় বলল, "হুম, ঠিক বলেছ। আমারই তো ছেলে। যাকে তুমি ধ্বংস করতে এসেছ—তাঁর ছেলের সাথেই এক বিছানায় ঘুমাচ্ছ। নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছ সস্তা মেয়েদের মতো। রক্ত বলে কথ। শিকদাররা এমনই সস্তা। আমাকে ধ্বংস করতে আমার ছেলের কাঁধের সাহায্য নিতে হচ্ছে তোমার। তুমি তো আগে থেকেই হেরে বসে আছ। বাকি রইল এই চৌধুরী-বাড়ির কথা। এ বাড়ি আমার ছিল। আমারই থাকবে। কয়েকদিন পর পর এ বাড়িতে বেড়ে ওঠা আগাছা পরিষ্কার করা হয়। তখন না-হয় তোমারও একটা ব্যবস্থা করা যাবে। ততদিন আয়েশ করো।"

কামিনী চৌধুরীর গা জ্বালানো কথায় মুচকি হাসল নুর। কামিনী চৌধুরীর উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হলো না তার। তবে কথা বাড়াল না সে। সারাদিনের ধকলে কথা বলে সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে করছে না একদম। তাই কামিনী চৌধুরীকে শান্ত গলায় বলল, "আমি খুব ক্লান্ত, আপনি এবার আসুন। পরেরবার আমার রুমে আসার সময় দরজা নক করে আসবেন, মিসেস চৌধুরী। আমার বাড়িতে আমি অভদ্রতা এলাউ করব না।"

কামিনী চৌধুরী দাঁড়ালেন না। কটমট চোখে নুরকে দেখে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন। নুর একটা একটা করে গয়না খুলে ড্রেসিং টেবিলের সামনে রাখল। ধুপধাপ পা ফেলে মৌরি রুমে ঢুকে হাত-পা ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তার পিছনে লুবানা আর ফুলিও এসেছে। সবার চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ। লুবানা নিজেও ধপ করে শুয়ে পড়েছে মৌরির পাশে। ফুলির হাতে জুসের গ্লাস। সে গ্লাস নুরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "খাইয়া লন, ভাবি। সারাদিন তো তেমন কিছুই খান নাই।"

নুর আলতো হেসে জুসের গ্লাসটা নিল।

"আমি শেষ! শরীরের প্রত্যেকটা জয়েন্টে ব্যথা করছে। এই জন্য আমি বিয়েতে এসেছিলাম? গাধার মতো খাটিয়ে নিয়েছে একেবারে। সারাদিন দুটো পা এক করতে পারিনি। আমি আর কখনো ওর বিয়েতে আসব না।"

কাঁদো কাঁদো গলায় বলা মৌরির কথা শুনে হাসির রোল পড়ে গেল। লুবানা কৌতুক করে বলল, "তোমাকে তো আসতেই হবে, আপু। প্রতি বছর ভাইয়াকে একটা করে বিয়ে করাব। কব্জি ডুবিয়ে খেতে হবে না?"

নুর মুচকি হেসে জুসের গ্লাসে চুমুক দিলো। ফুলি অবাক গলায় বলল, "ভাইজান কেমনে বিয়া করব, আফা? হেয় তো বিয়া কইরা ফালাইছে!"

"বাদ দে, ফুলি। আমার মাথা ঠিকঠাক কাজ করা বন্ধ করে দিছে। আমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আয়। সারাদিন খাওয়ার টাইম পাইনি।"

মৌরির ক্লান্ত গলায় বলা কথটা শুনে নুরের মনটা খারাপ হয়ে গেল। সে নিজে দেখেছে সারাদিন মৌরি কতটা ব্যস্ত ছিল। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের পুরোটা মৌরিকে সামলাতে হয়েছে। আলি ক্যাটারিং সামলেছে। প্রতিটা জিনিসের দিকে সূক্ষ্ম চোখে নজর রেখেছে তারা। সানভিও সারাদিন দু-পা এক করতে পারেনি। তিনজন মানুষ সব অ্যারেঞ্জমেন্ট নিপুণ হাতে সামলে নিয়েছে। নুর প্রশংসা না করে পারল না। এদের গুণ আছে বলতে হবে। লুবানা এগিয়ে এসে নুরের শাড়ির পিন খুলতে খুলতে বলল, "আর বসে থেকো না। তাড়াতাড়ি চেইঞ্জ করে নাও।"

মুখে কিছুই বলল না নুর। ফুলি খাবার আনতে ছুটেছে। ক্লান্তিতে মৌরির চোখ লেগে গেছে। নুর সেদিকে তাকিয়ে হাসল। খিদে তারও পেয়েছে। এত মানুষের ভিড়ে ঠিকমতো খেতে পারেনি সে। লুবানা প্রত্যেকটা পিন সময় নিয়ে খুলল।

"যাও, ফ্রেশ হয়ে এসো। হালকা কিছু পরো, ভালো লাগবে।"

নুর কথা না বাড়িয়ে ফ্রেশ হতে চলে গেল। খাবার হাতে রুমে ঢুকে অবাক হয়ে গেল ফুলি। বিস্মিত গলায় বলল, "আপায় দেহি ঘুমায় গেছে! খাইব না?"

"তুই রাখ। আমি ডেকে দিচ্ছি।"

ফুলি তিনজনের জন্যই খাবার নিয়ে এসেছে। নুর ফ্রেশ হয়ে এসেছে। হালকা সবুজ শাড়িতে অসম্ভব স্নিগ্ধ লাগছে তাকে। মৌরি ততক্ষণে উঠে বসেছে। লুবানা খাবার প্লেটে দিয়ে নুরকে তাড়া দিয়ে বলল, "তাড়াতাড়ি আসো, আপু। খুব খিদে পেয়েছে। আমিও ঠিকভাবে কিছু খেতে পারিনি।"

খাবার দেখে নুরের খিদে আরও বেড়ে গেল। চুপচাপ গিয়ে খেতে বসল সে। খাওয়া-দাওয়ার পর্ব চুকিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করল তারা।

আশমিন এসে পৌঁছল মাঝরাতে। ড্রয়িংরুমে কামিনী চৌধুরী যথারীতি তার অপেক্ষায় বসে আছেন। আশমিন মাকে দেখে মুচকি হাসল। কামিনী চৌধুরী তাড়া দিয়ে বললেন, "তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে এসো। সারাদিন তো তেমন খেতে পারোনি। আমি খাবার বাড়ছি।"

মায়ের অভিমান ভাঙতে দেখে বুকে প্রশান্তির হাওয়া বয়ে গেল আশমিনের। এক হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে "আসছি" বলে দ্রুত পায়ে ভেতরে চলে গেল সে।

নুর রুমের সাথে লাগোয়া মিনি ছাদে দাঁড়িয়ে রইল। আশমিন দেখেও কিছু বলল না। নিঃশব্দে কাবার্ড থেকে কাপড় বের করে ফ্রেশ হতে চলে গেল। নুর আশমিনের উপস্থিতি টের পেয়েছে। সে অধর বাঁকিয়ে মনে মনে আঙুল গুনতে লাগল। কয়েক সেকেন্ডের মাথায় ধপ করে কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দে গা দুলিয়ে হাসল সে। দ্রুত পায়ে ওয়াশরুমের সামনে এসে চিন্তিত হওয়ার ভান করে বলল, "শব্দ কীসের? পড়ে গেলেন নাকি?"

আশমিন দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা হজম করল। ফ্লোরে পড়ে থাকা পিচ্ছিল পদার্থ দেখেই ষড়যন্ত্রের আগাগোড়া বুঝে ফেলল সে। বেসিনের সাথে ধাক্কা লেগে বেশ ভালোই ব্যথা পেয়েছে। কালকের প্রতিশোধ নিতেই এই ব্যবস্থা, বুঝতে অসুবিধা হলো না তার। রাগটা চেপে হাসল সে। দেওয়ালের সাহায্যে উঠে দাড়াতেই পিঠের ব্যথা তার উপস্থিতি ভালো করেই জানিয়ে দিলো। আস্তে-ধীরে ফ্রশ হয়ে কাপড় চেইঞ্জ করে সাধারণ পোশাকে বেরিয়ে এলো আশমিন। নুর মিটমিটিয়ে হেসে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। আশমিন দেখেও না দেখার ভান করে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে টাওয়াল দিয়ে মাথা মুছতে লাগল। নুর দ্বিধান্বিত চোখে দেখল তাকে। কৌতূহল দমিয়ে রাখতে না পেরে আমতা আমতা করে বলল, "বেশি ব্যথা পেয়েছেন?"

"ব্যথা পাব কেন?"

"তাহলে শব্দ হলো যে?"

"স্লিপ কেটে দরজার সাথে ধাক্কা লেগেছে। একটুর জন্য বেঁচে গিয়েছি বুঝলে? না-হলে আজ আমার কোমরও ভাঙত।"

নুরের মুখের খুশির আভা কেটে গেল। মনে মনে দাঁত কিড়মিড় করল সে। এতগুলো শাওয়ার জেল ফেলেও কোনো কাজ হলো না! আশমিন হাসি চেপে বারান্দায় চলে গেল। ভেজা টাওয়াল মেলে দিয়ে শান্ত গলায় বলল, "চাইলে এখান থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারো। কোমরের সাথে সাথে হাত-পাও ভেঙে যাবে।"

নুর জবাব দিলো না। হনহন করে গিয়ে বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়ল। আশমিন বারান্দায় দাঁড়িয়েই বউয়ের রাগ দেখল। হালকা সবুজ শাড়িতে অসম্ভব মায়াবতী রমণী তার বিছানায় শুয়ে আছে। পকেটে হাত গুঁজে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল সেদিকে। পিঠের ব্যথা বেড়েই চলেছে। নুরের অস্বস্তি হচ্ছে খুব। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে আশমিন তার দিকেই তাকিয়ে আছে। শরীরে তীব্র শিহরন বয়ে গেল তার। ঠোঁট কামড়ে খিঁচে চোখ বন্ধ করে ফেলল সে। আশমিন হাসল। চুলে আঙুল গলিয়ে আড়চোখে দেখল নুরকে। নুরের দিকে দৃষ্টি রেখে ধীর পায়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল সে। নুর যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। দ্রুত উঠে ল্যাপটপ নিয়ে বসল সে। নিজের কাজ সেরে ল্যাপটপ জায়গামতো রেখে চুপচাপ শুয়ে পড়ল। ফোন নিয়ে অমিকে কল করল। কয়েকবার রিং হতেই ফোন রিসিভ করল অমি।

"আমরা পৌঁছে গেছি, আলো। চিন্তা করিস না।"

নুর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। গলার স্বর নিচু করে বলল, "আম্মু কী করছে, ভাইয়া? ঘুমিয়ে গেছে?"

অমি আড়চোখে নাফিজা শিকদারকে দেখল। নাফিজা শিকদার চোখমুখ শক্ত করে বসে আছেন। নুরের সাথে কথা বলবেন না সেটা জানে অমি। বোনকে কষ্ট দিতে মন সায় দিলো না তার। তাই হাসার চেষ্টা করে বলল, "আম্মু ঘুমিয়েছে অনেকক্ষণ। জানিসই তো, ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমায়। সকালে কল করে কথা বলে নিস।"

নুর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। ভাইয়ের ছল বুঝতে অসুবিধা হলো না তার। ছলছল চোখে মলিন হাসল সে। ভাইয়ের সাথে কথা এগিয়ে নিতে পারল না আর। ঘুমানোর বাহানায় কল কেটে দিলো।

অমি কান থেকে ফোন নামিয়ে অসহায় চোখে নাফিজা শিকদারের দিকে তাকাল, "একবার কথা বলতে পারতে, আম্মু। আমার বোনটা খুব একা হয়ে গেছে। আমাদের ওকে সাপোর্ট করা উচিত।"

"তোমার বোন একা নয়, অমি। ওর সাথে ওর স্বামী আছে। আমরা থাকলাম কি না থাকলাম তাতে কিছু যায় আসে না।"

নাফিজা শিকদার উঠে চলে গেলেন। মায়ের শক্ত গলার ভাঁজে লুকানো অভিমান বোঝে অমি। তাই আর কথা বাড়াল না সে। মায়েদের অভিমান দীর্ঘস্থায়ী হয় না। একদিন এই অভিমানের বরফ ঠিকই গলবে।

রুমে ফিরে এসে চুপচাপ শুয়ে পড়ল আশমিন। পিঠের ব্যথাটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। নুর ঘুমের ভান ধরে চোখ বন্ধ করে আছে। পাশ ফিরতে গিয়ে হালকা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো আশমিনের মুখ থেকে। নুর আশমিনের মিথ্যাটা ধরে ফেলল। মাথা উঁচু করে এক পলক তাকাল আশমিনের দিকে, "ব্যথা পেয়েছেন?"

"নাহ, বউ পাশে তো, তাই উত্তেজনায় ছটফট করছি।"

আশমিনের ঠান্ডা গলায় এমন বেহায়া কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল নুর। নিজের গালেই চড় মারতে ইচ্ছে হলো তার। যেন এই লোকের সাথে কথা বলা মহাপাপ। অসভ্য একটা!

আশমিন নুরের ভাবনার তোয়াক্কা করল না। নুরের দিকে ঘুরে গম্ভীর গলায় বলল, "আমি তোমাকে ভালোবাসি, নুর। সব কিছুর উর্ধ্বে এটাই ধ্রুব সত্য। বহু বছর আগে আমি এক কাজলরাঙা চঞ্চল হরিণীর প্রেমে পড়েছিলাম। সে কি তীব্র শিহরন জাগানো অনুভূতি! কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার আমিটাই থমকে গিয়েছিল। বুকের ভেতর কি ভীষণ অস্থিরতা! তোমায় ভালোবাসে আমি নিজেকে ভুলে কত রকম পাগলামি করেছি, তার কোনো হিসেব নেই! আমার লোক চব্বিশ ঘণ্টা তোমাকে ফলো করত। তোমার হলেও একজন আছে। যে ভেতরের সমস্ত আপডেট আমাকে জানাত। এক মুহূর্তের জন্যও তোমাকে নিজের থেকে আলাদা করত ভয় হতো আমার। তোমাকে এক পলক দেখার জন্য আমি তোমার হলের সামনে কত রাত গাড়িতে কাটিয়েছি, গুনে বলা সম্ভব নয়! তোমার এই স্নিগ্ধ মুখের এক পলক আমায় স্বস্তি দিত। পৃথিবীতে তুমিই আমার সবচেয়ে আপনজন। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আল্লাহ বেহেশত থেকে তৈরি করে পাঠিয়েছেন। আমি জানি, আমাদের পথ চলাটা মসৃণ হবে না। তোমার মনে আমার জন্য ভালোবাসা আছে কি না তা নিয়েও আমি শঙ্কিত! তবে যা-ই হয়ে যাক না কেন, একটা কথা সবসময় মনে রাখবে। পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেও তুমি জানবে একজন তোমাকে তখনো ভালোবাসে। তোমার খারাপ-ভালো সবটাই সে ভালোবাসে। আমি সবসময় ছায়ার মতো তোমায় ছুঁয়ে থাকব। চাইলেও তুমি নিজের থেকে আমাকে আলাদা করতে পারবে না।"

নুর চুপচাপ শুনল। এই মন্ত্রমুগ্ধ কথাগুলো শোনাতে চাওয়ার আকুতি আজ পূর্ণ হলো। তার স্বপ্নের পুরুষ তার হাতের নাগালে। চাইলেই ছুঁয়ে দেওয়া যায়। অনুভূতির চাদরে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখা যায়; কিন্তু অনুভূতি? সে তো কবেই বাবার সাথে সমাধিস্থ হয়েছে। নুরের বুকের যন্ত্রণা বেড়ে গেল। প্রচণ্ড হাঁসফাঁসে নিঃশ্বাস আটকে এলো তার। একটু নিঃশ্বাসের আশায় বিছানা থেকে উঠে ছুটে গেল বারান্দায়। আশমিন শান্ত চোখে দেখল। নুরের

পিছু নিল না সে। বেডসাইড ড্রয়ার থেকে একটা ব্যথানাশক ওষুধ খেয়ে শুয়ে রইল চুপচাপ।

বাকি রাতটুকু দুজনেরই অনিদ্রায় কাটল।

আশমিনের পিঠের ব্যথা খুব ভোগাল তাকে। এক্স-রে পর্যন্ত করতে হলো। নুরের কিঞ্চিৎ অনুশোচনা হলেও নির্লিপ্ত রইল সে। দু-একটা কথা ছাড়া তেমন বিশেষ কথা হলো না তাদের মধ্যে।



মাসখানেক পর:

নুর নিজের ব্যাগ গোছাচ্ছে। হলে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। এখানে থাকলে তার উদ্দেশ্য সফল হবে না। যা করার চৌধুরী-বাড়ি থেকে বেরিয়ে করতে হবে। আশমিনের দৃষ্টি শিকারি চিলের মতো সারাক্ষণ তার ওপরেই তাক করা থাকে। তার ওপর গতকাল মিজু সিদ্দিক পরিবার সমেত ফিরে এসেছেন। এঁদের প্ল্যান অনেক বড়ো। যার ছোটোখাটো বলি রাফসান শিকদারকে নিজের জীবন দিয়ে দিতে হয়েছে। তাদের ধরাশায়ী করতে হলে আশমিনের মুখোমুখি হতে হবে। যা নুর এই মুহূর্তে একদমই চাইছে না। তাই পরিস্থিতি নিজের হাতের মুঠোয় নিতে এই বাড়ি থেকে বের হওয়া জরুরি।

অফিসের জরুরি মিটিংয়ের মাঝেই তার নির্লিজ্জ মন বউকে দেখার জন্য আনচান আনচান করছিল। সিসিটিভি চেক করতে গিয়ে বউয়ের তল্প-তল্পি গোটানো দেখে চোখ কপালে উঠল তার। বউ কি তাকে রেখে পালানোর চাল চালছে? কী সাংঘাতিক কথাবার্তা! তার মতো হ্যান্ডসাম ছেলে রেখে কোন কুমিরের সাথে ইস্টুপিস্টু করছে? কনফারেন্স রুমে সবাই তার দিকেই তাকিয়ে আছে। আশমিন ভদ্র ছেলের মতো ফোন রেখে দিলো। আড়চোখে স্ক্রিনে নজর রেখে মিটিং চালিয়ে যেতে বলল আলিকে। আলি প্রজেক্টরে নিজেদের পোশাকের প্রেজেন্টেশন দিচ্ছে, "এই পোশাকগুলো আমরা আগামী সপ্তাহে লঞ্চ করতে যাচ্ছি। বাংলাদেশ-সহ বিদেশের প্রত্যেকটি আউটলেটে আমাদের প্রোডাক্টগুলো অ্যাভেইলেভল থাকবে। বাইরের কান্ট্রিগুলোতে প্রোডাক্ট শিপিং করা হয়ে গেছে। আগামী সোমবার প্রোডাক্ট লঞ্চের জন্য একটা র‍্যাম্প শো করা হবে। মডেলদের সাথে যোগাযোগ করে সব ঠিক করে ফেলুন। শো'স টপার হবে জনপ্রিয় মডেল সাবা খান। তার ডেট নিয়ে নিয়েছি। সবাই অ্যারেঞ্জমেন্টে লেগে যান। কোনো কমতি যেন না থাকে। একটা কমপ্লেইনও চাই না আমি। ক্লিয়ার?"

"ইয়েস, স্যার।"

"ঠিক আছে। আজকের মিটিং এ পর্যন্তই। আপনারা এখন আসতে পারেন।"

রুম খালি করে সবাই একে একে বেরিয়ে গেল। আশমিন কপালে ভাঁজ ফেলে বউয়ের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে নজর রাখছে। একটামাত্র বউ! বিয়ের কথা বলতেই শ্বশুর শহিদ হয়ে গেল। সেই দায় কাঁধে নিয়ে কত যুদ্ধ করে বিয়ে করল সে! সেই বউ তাকে রেখে কুমিরের সাথে পালাচ্ছে? কুমিরকে চুমু খাওয়ার এত তাড়া? তার ঠোঁট বন্যায় ভেসে গেছে নাকি? সেও কুমিরের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। তাকে তো আজ পর্যন্ত একটা চুমু খেল না। অসভ্য বেইমান মেয়ে!

দাঁত কিড়মিড় করতে করতে নুরের পিণ্ডি চটকাচ্ছিল আশমিন। কখন তার পিছনে আলি আর মৌরি এসে দাঁড়িয়েছে টেরই পায়নি সে। আলি থুতনিতে হাত বুলিয়ে ভাবুক গলায় বলল, "বিয়ের এক মাসের মাথায় আমাদের নেতা আশমিন জায়িন চৌধুরীকে রেখে তার বউ বাড়ি ছাড়ার পাঁয়তারা করছে, এটা তো ব্রেকিং নিউজ হয়ে যাবে রে!"

মৌরি কিটকিটে হেসে উঠল। আলি দুঃখ পাওয়ার ভান করে বলল, "থাক ভাই, মন খারাপ করিস না। তুই না-হয় বিবাহিত সিঙ্গেলই থাকলি। আমাদের কপালে মিঙ্গেল হওয়া লেখা নাই, ভাই।"

আশমিন কিছু বলল না। থমথমে মুখে দুই বাঁদরের দিকে তাকাল। যারা এই মুহূর্তে তার দিকে তাকিয়ে গা দুলিয়ে হাসছে। আশমিন গা এলিয়ে বসল। চেয়ারে দুলতে দুলতে সানভিকে ডাকল সে। আলি আর মৌরি তখনো তার দুর্দশা দেখে দাঁত বের করে হাসায় ব্যস্ত।

সানভি হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকল, "জি, স্যার?"

"আমি বাসায় যাচ্ছি। নোটিশবোর্ডে লিখে দাও প্রোডাক্ট লঞ্চের ডেট দুদিন এগিয়ে আনা হয়েছে। আলি আর মৌরি এদিকটা সামলে নেবে। তুমি আমার সাথে এসো।"

সানভি যে গতিতে এসেছিল তার দ্বিগুণ গতিতে বেরিয়ে গেল। আলি আর মৌরির হাসি থেমে গেছে। দুজনের মুখই ফ্যাকাশে।

"এটা কিন্তু ঠিক না। তুই আমাদের ওপর জুলুম করছিস। আমি এই মুহূর্তে চাকরি ছেড়ে দেবো। আব্বাকে বলব ছেলে খুঁজতে। বিয়ে করে শান্তিতে সংসার করব। এত প্যারা ভাল্লাগে না। তোর কোম্পানি গোল্লায় যাক।"

মৌরির মিথ্যা হুমকিতে কাজ হলো না। আশমিন আবারও মোবাইলে দৃষ্টি স্থির করেছে। আলি কপাল চাপড়াল। এই প্রজেক্ট কমপ্লিট হলেই

নির্বাচনের প্রচারণায় তারা পুরোপুরি ব্যস্ত হয়ে পড়বে। বর্তমান সরকার দল থেকে খুব সহজেই নমিনেশন পেয়ে গেছে আশমিন। দলের ছেলেরা অলরেডি এলাকায় প্রচারণা চালাচ্ছে। কোম্পানি আমজাদ চৌধুরীর হাতে দিয়ে সেদিকে ছুটবে তারা। এদিকে এ ছেলের কোনো হেলদোল নেই। কাল রাত অবধি মডেল সাবা খানের সাথে আলাপ করেছে সে। তারা আজ পর্যন্ত কোনো মেয়ের সাথে এত দীর্ঘ আলাপ করতে দেখেনি আশমিনকে। ব্যাপরটা আলি আর মৌরি দুজনেরই চোখে লেগেছে খুব। আশমিনের মাথায় কিছু একটা চলছে সেটা স্পষ্ট। তবে বিষয়টা ধরতে পারছে না তারা। সাবা খান তো আশমিনের পার্সোনালিটি দেখেই মুগ্ধ। আশমিনের দিক থেকে চোখই যেন সরছিল না তার। আশমিনও হেসে হেসে কথা বলছিল। খটকা তো একটা আছেই!

সানভিকে নিয়ে বাড়ির দিকে ছুটছে আশমিন। নুরের মতিগতি ভালো ঠেকছে না। চৌধুরী-বাড়ি থেকে কিছুতেই বের হতে দেওয়া যাবে না নুরকে। চারদিকে বিপদ ওত পেতে আছে। তার সীমানা থেকে বেরোলেই চিন্তায় নাওয়াখাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে তার। মেয়েটা এত অবাধ্য কেন কে জানে! সে তো ভালো ছেলের মতো দূরত্ব রেখেই থাকছে। মাঝেমধ্যে তার একটু প্রেম প্রেম পায় তা সত্য। একটু-আধটু চুমু খেলে তো ক্ষয় হয়ে যাবে না। তবুও কেন পালাই পালাই করছে মেয়েটা? নাকি সে দূরে থাকছে বলে রাগ করে চলে যাচ্ছে? আশমিনের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। সে কি একটু আদর সোহাগ দেখাবে? এই যে এখন, বাড়ি পৌঁছেই জাপটে ধরে চটাস চটাস চুমু খেয়ে নেবে। প্রয়োজন হলে ঘণ্টাখানেক কোলে নিয়েও ঘুরে আসবে। আদর চাই বললেই তো হয়। এত ব্যাগ গোছানোর কী হলো? যত্তসব ভয়ংকর কার্যকলাপ!

কামিনী চৌধুরীর সামনে রাগে ফোঁসফোঁস করছেন মিজু সিদ্দিক। সুমা সিদ্দিকও অসন্তুষ্ট হয়ে বসে আছেন। লারা কেঁদে কেঁদে চোখ ভাসিয়ে ফেলছে কাল থেকে। ব্যাবসায়িক কাজে তাদের আসতে সময় লেগেছে। লারার ন্যাকা কান্না দেখে ফুলি আড়াল থেকে মুখ বাঁকায়। এই এক মাসে নুরের সাথে বেশ খাতির জমেছে তার। নুরও অনেক স্নেহ করে তাকে। লারাকে দেখলেই ফুলির মেজাজ আকাশে উঠে বসে থাকে। ঢঙি মাইয়া একটা! বাপ-মা দুইটাই শয়তানের বংশধর। পেটে পেটে শয়তানি। আলির মায়ের ঘটনা জানে সে। তাই মিজু সিদ্দিক আর সুমা সিদ্দিককে দেখলেই গায়ে ডুমুর পাতা ঘষে দিতে ইচ্ছে করে তার। বেহায়া বেডা-বেডি!

নুরের আদেশে কামিনী চৌধুরীর রুমের সামনে ওত পেতেছে সে। বড়ো ম্যাডাম ভালো মানুষ। এই দুটো খারাপ মানুষ আশমিনের মাথাটা চিবিয়ে খাবে। ফুলি এটা কিছুতেই হইতে দেবে না। এই শয়তানগুলোর থেকে ম্যাডামরে ও রক্ষা করবে। এই ভাবনা থেকেই নুরকে সাহায্য করছে সে।

"আর তো চুপ করে থাকা যায় না। ওই মেয়ে এই বাড়িতে ঢুকেই চৌধুরী-বাড়ি নিজের নামে করে নিয়েছে। দুলাভাইকে সরিয়ে আশমিনকে ভোটে দাঁড় করিয়েছে। কত বড়ো ষড়যন্ত্র করছে, ভেবেছেন, আপা? আশমিন যতই আপনার ছেলে হোক, ওর তো স্বামী। দিনশেষে বউয়ের কথাই প্রাধান্য পাবে। মায়ের কথার কি মূল্য থাকবে তখন?"

সুমা সিদ্দিকের উসকানিমূলক কথায় কামিনী চৌধুরীর ভেতরের আগুন বাড়তে লাগল। মিজু সিদ্দিক সুযোগ বুঝে আসল কথায় চলে গেলেন। কামিনী চৌধুরীর পাশে বসে গম্ভীর গলায় বললেন, "শোন কামিনী, আশমিন এখন নির্বাচন, দল এগুলো নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। সংসদ সদস্য হওয়া তো আর চারটেখানি কথা না। দায়িত্ব বলেও একটা ব্যাপার আছে। চাইলেও সে বিজনেসে সময় দিতে পারবে না। দুলাভাইয়ের সাথে তুইও অফিস জয়েন কর। আমি তো আছিই তোদের সাহায্য করার জন্য। রাজনৈতিক ক্ষমতা হাত থেকে গেলেও ব্যাবসাটা নিজের আয়ত্তে নিয়ে আয়। সবকিছু হাত থেকে চলে গেলে এই মেয়ে তোকে রাস্তার কুকুর বানিয়ে ছাড়বে। তখন হাজারবার কপাল চাপড়ালেও লাভ হবে না।"

"কিন্তু আমি তো ব্যাবসার কিছুই বুঝি না, ভাইজান। আমি কীভাবে এত বড়ো বিজনেস সামলাব?"

"আরে বোকা, টেনশন করছিস কেন? তোকে সাহায্য করার জন্য তো আমি আছিই। তুই শুধু এমডির পোস্টে থিতু হবি। বাকিটা আমি সামলে নেব। তাছাড়া আশমিন আর দুলাভাই তো আছেই।"

কামিনী চৌধুরীকে দ্বিধান্বিত দেখাল। মিজু সিদ্দিক নানান কথার জালে কামিনী চৌধুরীকে কনভিন্স করতে লাগলেন।

লারা তার বাবা মায়ের ওপর বিরক্ত। কান্নার অভিনয় করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছে সে। কেউ তার বিষয়টা আলোচনা করছে না। লারা অধৈর্য হয়ে গেল। সে বলল, "তোমরা থামবে? তখন থেকে এক জায়গায় আটকে আছ। কেউ আমার ব্যাপরটা ভেবে দেখেছ? আশমিন ওই মেয়েটাকে বউ করে নিয়ে এসেছে। চোখের সামনে নিজের ভালোবাসার মানুষটাকে অন্য কারও সাথে সংসার করতে দেখছি। আমার কতটা যন্ত্রণা হচ্ছে, ভেবেছ একবার?"

কামিনী চৌধুরী এসে লারাকে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। লারা হাপুস নয়নে কাঁদছে। সুমা সিদ্দিক মেয়ের অভিনয়ের প্রশংসা না করে পারলেন না। অধর বাঁকিয়ে হাসলেন তিনি। কামিনী চৌধুরী লারাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কেঁদো না, সোনা। কয়েকটা দিন একটু সহ্য করো। আশমিন তোমারই হবে। ওই মেয়েকে এই বাড়ি থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করব আমি। এখন থেকে আশমিনের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করবে। বেশি বেশি সময় দেবে। নিজেদের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে ফেলো। তুমি বুদ্ধিমান মেয়ে। তোমাকে নিশ্চয়ই সবকিছু ভেঙে বোঝাতে হবে না?"

লারা মাথা নাড়ল। সে তো চায়ই আশমিনের কাছাকাছি থাকতে। ওই শক্ত পেটানো শরীরটা ছুঁয়ে দেওয়ার লোভ তার বহু দিনের। কল্পনায় কত রাত সে আশমিনে মেতে থেকেছে তার কোনো হিসাব নেই! তার জীবনে অগণিত পুরুষ এসেছে। সাময়িক তৃপ্তি দিতে পারলেও কেউ দীর্ঘ হয়নি। এসেছে আবার চলেও গেছে। তবে আশমিনকে তার চাই। সারাজীবনের জন্য না হলেও এক রাতের জন্য তাকে চাই।

ফুলি আর সেখানে দাঁড়াল না। দ্রুত সেখান থেকে সরে গেল। কেউ দেখে ফেললে বিপদে পড়ে যাবে সে। নুর তানভিরের সাথে কথা বলছিল। ফুলিকে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকতে দেখে তানভিরের সাথে কথা দীর্ঘ করল না সে। ফোন কেটে চিন্তিত গলায় বলল, "কী হয়েছে? এমন দেখাচ্ছে কেন তোমাকে?"

"সর্বনাশ হইয়া গেছে, ভাবি! ওই পিশাচগুলান তো বড়ো ম্যাডামরে সব কুবুদ্ধি দিতাছে।"

"আগে শান্ত হয়ে বসো। সবকিছু খুলে বলো। কী করেছে ওরা?"

ফুলি গড়গড় একে একে করে সবকিছু বলতে শুরু করল। নুর মনোযোগ দিয়ে সব শুনল।

"হুম, ব্যাপরটা তো ভেবে দেখতে হচ্ছে। তুমি চিন্তা করো না, ফুলি। আমি এমন কিছুই হতে দেবো না। তোমার বড়ো ম্যাডাম তার নিজের ভুলগুলো বুঝতে পারবেন। আমি সব ঠিক করে দেবো। তুমি শুধু ওদের ওপর নজর রাখো।"

ফুলি বিজ্ঞের মতো মাথা দোলাল। নুর হেসে ফুলির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো। এই সহজ-সরল মেয়েটাকে মিথ্যা বলতে মন সায় দেয় না, কিন্তু সেও তো নিরুপায়।

CamScanner

আশমিন নিত্যকার মতো স্বাভাবিকভাবেই বাসায় ঢুকল। বাইরের বৈঠকখানা পার হতেই তার সামনে টপকে পড়ল লারা। ওয়েস্টার্ন ড্রেসে খোলামেলাভাবে নিজেকে সাজিয়ে আশমিনের সামনে হাজির হয়েছে সে। আশমিন কপাল কুঁচকে দেখল তাকে। বিরক্তিতে কপালে হাত বুলাল কয়েকবার। সানভি চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে আছে। এমন বিশ্রী ড্রেস কোন টেইলার্স বানিয়েছে? যত্তসব অপসংস্কৃতি!

"আমাকে কেমন লাগছে?"

লারার আহ্লাদী গলা আশমিনের কাছে বড্ড তেতো লাগল। এই আবর্জনার কানের নিচে তবলা বাজাতে হাত নিশপিশ করছে তার। লারা উৎসাহী চোখে উত্তরের অপেক্ষায়। আশমিন নিজের বিরক্তি সাইডে রেখে গম্ভীর গলায় বাহাদুরকে ডাকল। এক মিনিটের মধ্যেই বাহাদুর হাজির।

"বলুন, স্যার।"

"সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যাপারটাকে আজ সারারাত আউট হাউজের আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে রাখবে। ঠিক সকাল আটটায় আমার সামনে হাজির করবে। তখন তার কাছ থেকেই শুনব তাকে কেমন লাগছে।"

সানভি দুদিকে মাথা নাড়ল। বেচারি লারা! এত ঢং করার কী দরকার ছিল? বাহাদুর তো এক মিনিটের জন্যও ছাড় দেবে না। অসহ্য এক রাতের জন্য মনে মনে শুভকামনা জানাল সে। আশমিন গটগট করে উপরে চলে গেল। লারার হতভম্ব চেহারা দেখার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তার। এই মেয়ে চুলোয় যাক!

আশমিন গম্ভীর মুখে রুমে ঢুকল। চেহারায় রাগ স্পষ্ট। পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে নিজের রাগ বোঝাতে চাইল। নুর পাত্তা দিলো না। সে গুনগুন করে গান গাইছে। ফোনের স্ক্রিনে তাকিয়ে লাজুক হাসছে। মোট কথা ইনিয়েবিনিয়ে আশমিনকে রাগিয়ে দিতে চাইছে সে। পৃথিবীর সবচেয়ে ইনসিকিউর্ড স্বামী আশমিন। বউকে মশা কামড় দিলেও সে হিংসায় জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সে থাকতে তার বউকে মশা কেন কামড়াবে? তার সামনেই নুর কিনা ফোন নিয়ে মিটমিট করে হাসছে! আশমিনের মেজাজ আরও খারাপ হলো। আড়চোখে একবার পরখ করে নিল নুরকে। তারপর বলল, "ব্যাগ গুছিয়ে কোথায় যাচ্ছ?"

"হলে ফিরে যাচ্ছি।"

নুরের নির্লিপ্ত কণ্ঠে রাগের মাত্রা বাড়ছে আশমিনের। নিজেকে শান্ত রেখে নরম গলায় বলল, "কেন?"

"আমার ইচ্ছে। এখানে থাকতে ভালো লাগছে না। তাছাড়া আপনাকে জবাবদিহি করতে বাধ্য নই আমি।"

"হলে যাওয়া হবে না তোমার। এখানেই থাকতে হবে। যা করার এখান থেকেই করো। কেউ তোমাকে বাধা দিচ্ছে না।"

নুর উঠে দাঁড়াল। ধীর পায়ে আশমিনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শক্ত গলায় বলল, "এই তো দিচ্ছেন। আমার ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছেন। আমাকে হলে যেতে নিষেধ করেছেন। এটা কি বাধা নয়?"

আশমিন সুযোগের সৎ ব্যবহার করল। দুহাতে কোমর টেনে নিজের সাথে মিলিয়ে নিল নুরকে। শক্ত করে নিজের সাথে চেপে ধরে মন্থর গলায় বলল, "আমি আরও অনেক কিছুই করতে পারি। করেছি কি?"

নুরের গলায় মুখ গুঁজে ঠোঁটের রাজত্ব চালাতে চালাতে বলল, "চাইলেই এভাবে তোমার গায়ে শিহরনের ঢেউ খেলাতে পারি। কখনো করেছি?"

নুরের সারা মুখে চুমু খেয়ে ছেড়ে দিয়ে বলল, "চাইলে এভাবে চুমুও খেতে পারতাম। ভালো ছেলে বলে এখনো এমন কিছু করিনি। অযথা আমার ঘাড়ে দোষ চাপাবে না।"

কাঁপতে থাকা নুর হতভম্ব চোখে তাকিয়ে আছে। করিনি করিনি বলে সব করে ফেলল! আবার বড়াই করে নিজেকে ভালো ছেলে দাবি করছে! নুরের গা জ্বলে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আশমিনের দিকে। আশমিন সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া বাচ্চার ন্যায় নিষ্পাপ মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। নুরের আর সহ্য হলো না। সে রাগে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "আরেকবার কাছে এলে আমি আপনাকে খুন করে ফেলব।"

"তার দরকার নেই। আমি প্রতিরাতে তোমাকে দেখেই খুন হয়ে যাই। রাতে বেশি হট হয়ে যাও কি-না।"

নুর হাসল। ব্যঙ্গাত্মক গলায় বলল, "তাই নাকি? এমন সস্তা ফ্লার্ট আপনার আশেপাশে ঘোরা সস্তা মেয়েদের সাথেই করবেন। আমার সাথে নয়। ভালোবাসে আপনার সাথে সংসার করতে আসিনি আমি, নিশ্চয়ই তা ভুলে যাননি? আপনাদের দেখলে আমার গায়ে জ্বালা ধরে যায়। ইচ্ছে করে জ্বালিয়ে দিতে। আপনাদের জন্য আমার আব্বুকে এত নির্মমভাবে পৃথিবী ছাড়তে হয়েছে। আমরা এতিম হয়েছি। এত সহজেই ভুলে গেলেন নাকি সব? অবশ্য ভোলারই কথা। এমন দু-একটা খুন-খারাবি আপনাদের জন্য ডালভাত। আপনার কেউ তো মরেনি। তাই বুঝতে পারছেন না। আপনাকে

দেখলেই আমার আব্বুর রক্তাক্ত মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমার থেকে দূরে থাকুন। না-হয় চৌধুরী বংশ নির্বংশ করে দেবো!"

নুরের চোখ ছলছল করছে। কণ্ঠে যেন আগুন ঝরে পড়ছে। আশমিন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নুরের মুখে। প্রতিশোধের নেশায় পাগল হয়ে থাকা মেয়েটা তার প্রাণভোমরা। যে কিনা তাকে ধ্বংস করতে একের পর এক ছক কষে যাচ্ছে।

"আমাকে ঘৃণা করো, নুর?"

"ঘৃণা করতে হলে মনে স্থান দিতে হয়। আপনাকে আমি ঘৃণায়ও রাখিনি, মিস্টার আশমিন জায়িন চৌধুরী। আমার কাছে আপনি শুধু কামিনী চৌধুরীর ছেলে। এছাড়া আপনার দ্বিতীয় কোনো পরিচয় এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই।"

"আমি তোমার স্বামী। আল্লাহর পবিত্র কালাম সাক্ষী রেখে আমাদের বিয়ে হয়েছে, নুর। তুমি আমাকে স্বামী বলে কবুল করেছ। এটা তো মিথ্যা নয়। অস্বীকার করতে পারবে তুমি?"

আশমিনের শান্ত গলায় করা প্রশ্নের উত্তর তৎক্ষণাৎ দিলো না নুর। আশমিন দুহাত পিছনে মুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। নুর গা দুলিয়ে হাসল। হাসতে হাসতে বিছানা থেকে নিজের ফোনটা তুলে স্বাভাবিক গলায় বলল, "অস্বীকার করব কেন? বিয়ে তো আমি নিজ ইচ্ছায় করেছি। নিজের শান্তির জন্য। শত্রুর বিনাশ নিজ চোখে দেখব বলেই তো এই বিয়ে বিয়ে খেলা খেলতে হলো। চাপ নেবেন না। খেলা শেষ হলেই এই সম্পর্ক থেকে মুক্তি আপনার।"

সবসময় নিজের রাগ সংযত করা আশমিন আজ ভয়ানক রেগে গেল। ক্ষিপ্ত হয়ে নুরের বাহু ধরে নিজের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে শক্ত হাতে গাল চেপে ধরল সে। আগুন চোখে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, "আরেকবার এই কথা মুখে আনলে পরিণতি খুব খারাপ হবে, মিসেস আশমিন। আমি কিন্তু অতটাও ভালো ছেলে নই। আই অ্যাম আ ভেরি ব্যাড বয়, সোনা।"

নুর ছাড়া পাওয়ার জন্য ছটফট করছে। আশমিন ছেড়ে দিলো। গটগট পায়ে বেরিয়ে গেল রুম থেকে। নুর ঘৃণার দৃষ্টিতে আশমিনের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। গালগুলো লাল হয়ে গেছে তার। টনটনে ব্যথায় চোয়াল অবশ হওয়ার জোগাড়। নুরের জেদ যেন কয়েকগুণ বেড়ে গেল। এভাবে হবে না। চুপচাপ বসে থাকা মানে সময়ের অপচয়। আজ থেকেই চৌধুরী-বাড়ির সকলের ঘুম হারাম করে দেবে সে। কাল সকালটা সবার চোখে দুঃস্বপ্ন হয়ে ধরা দেবে। ফোন বের করে কল করল বন্ধু তানভিরকে।

"হ্যা, বল।"

"ছবিগুলো কাল সকালের সমস্ত নিউজ চ্যানেলে দেখতে চাই। ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম, ইউটিউব, সব জায়গায় ভাইরাল করে দে। কাল সকালে চায়ের সাথে ব্রেকিং নিউজ দেখে নাশতা করব।"

"তুই ঠিক আছিস? এভাবে কথা বলছিস কেন? কেউ কিছু বলেছে?"

নুর ঝামেলার ব্যাপারটা লুকিয়ে গেল। গলার স্বর স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে বলল, "কেউ কিছু বলেনি। এটাই সঠিক সময়।"

তানভির বুঝল কিছু একটা হয়েছে। জিজ্ঞেস করে নুরকে আর অস্বস্তিতে ফেলল না সে। নরম গলায় বলল, "এখন এই ছবিগুলো ভাইরাল হলে আশমিন ভাইয়ার নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে। আমাদের লক্ষ্য কিন্তু এটা না, নুর। আগে নির্বাচনটা হয়ে যাক। তারপর না-হয়,"

"আমি সব ভেবেচিন্তেই বলছি। শত্রুর ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত। এই সুযোগে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ বুঝে নিতে হবে।"

তানভির নুরের কথায় সম্মত হলো। বন্ধুকে বিদায় দিয়ে ফোন রাখল নুর।

আগামী মাসে নাফিজা শিকদার-সহ ঢাকা শিফট করবে অমি। নাফিজা শিকদারকে অনেক বুঝিয়ে রাজি করানো হয়েছে। রাফসান শিকদারের ব্যাবসা আপাতত নাসিম শিকদার দেখবেন। তাই সেদিক থেকে কিছুটা চিন্তামুক্ত। কালকের কথা ভেবেই পৈশাচিক হাসল নুর। এবার না-হয় লড়াইটা সামনাসামনিই হোক।



চৌধুরী-বাড়ির পরিবেশ খুব থমথমে। ভোর রাত থেকে প্রত্যেকটা নিউজ চ্যানেলে আমজাদ চৌধুরীর সাথে এক অর্ধনগ্ন মেয়ের ছবি ব্রেকিং নিউজ হিসেবে দেখানো হচ্ছে। ড্রয়িংরুমে লাগানো বড়ো এলইডিতে সেই নিউজ দেখতে দেখতে কফি খাচ্ছে আশমিন আর আলি। আলি চিন্তিত মুখে বসে আছে। সানভি দুঃখী দুঃখী মুখে দাঁড়িয়ে রইল। বড়ো স্যারের ইজ্জতের ফালুদা করে দিয়েছে একদম! কী নিষ্ঠুর কার্যকলাপ!

কামিনী চৌধুরী দেখা মাত্রই দরজায় খিল দিয়েছেন। আমজাদ চৌধুরীর ফোনে একের পর এক কল আসছে সকাল থেকে। সবার একই প্রশ্ন, কে এই মেয়ে? আমজাদ চৌধুরীর সাথে কী সম্পর্ক তার? আমজাদ চৌধুরী কি পরকীয়ায় লিপ্ত? এমন হাজারও প্রশ্নে দিশেহারা আমজাদ চৌধুরী ফোন ধরা বন্ধ করে দিয়েছেন। থমথমে মুখে তিনি ছেলের পাশের সোফায় বসে আছেন। তার অ্যাসিস্ট্যান্ট গোলাম রব্বানি সাহেব জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক কোনায়। আমজাদ চৌধুরী চিৎকার করে বললেন, "মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে না থেকে এসব বন্ধ করার ব্যবস্থা করো। এই ছবি যে ভাইরাল করেছে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাকে খুঁজে বের করো, রব্বানি।"

আমজাদ চৌধুরীর চিৎকার-চ্যাঁচামেচিতে তার দিকে কপাল কুঁচকে তাকাল আশমিন। কফির কাপে চুমুক দিয়ে বিরক্ত গলায় বলল, "চ্যাঁচাচ্ছ কেন? ছবির কোয়ালিটি তো ভালোই এসেছে। আর কী চাই?"

আমজাদ চৌধুরী স্তব্ধ হয়ে গেলেন। হতভম্ব চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কয়েক মুহূর্ত কথা বের হলো না তাঁর মুখ থেকে। বাবার অশ্লীল ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে আর ছেলে কফি খেতে খেতে তাকে কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছে!

"পাগল-টাগল হয়ে গেছ নাকি? কীসব আবোল-তাবোল বকছ? দেখতে পাচ্ছ টিভিতে কী দেখাচ্ছে?"

আশমিন চশমা ঠিক করে খুঁটিয়ে দেখে বলল, "মেয়েটা হট!"

আশমিনের নির্লিপ্ত কণ্ঠে ফুঁসে উঠলেন আমজাদ চৌধুরী। রাগে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, "মেয়েটার পাশে তোমার বাবাও আছে। তাকেও একটু দেখো।"

আশমিন মনোযোগী ছাত্রের মতো ছবিগুলো দেখল। স্বাভাবিক গলায় বলল, "তুমি তো ঘুমাচ্ছ। দেখার কিছু নেই। পরেরবার আরও ভালো পারফরম্যান্স চাই।"

আমজাদ চৌধুরী হাল ছেড়ে দিলেন। ছেলের গলায় স্পষ্ট রসিকতা। আমজাদ চৌধুরীর প্রেশার বেড়ে গেছে। তিনি হতাশ গলায় বললেন, "আমার এত বছরের রাজনীতির ক্যারিয়ারে আজ দাগ লেগে গেল! এটা যে কতটা লজ্জার আর অপমানের তা তুমি বুঝবে না। একটু একটু করে কামানো সম্মান এক নিমিষেই ধুলোয় মিশে গেল!"

বাবার বেদনায় নীল হয়ে যাওয়া মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আশমিন। আলি আমজাদ চৌধুরীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "চিন্তা করবেন না, আংকেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধামাকা আসছে। আমাদের ওপর ভরসা রাখুন।"

নুর উপরে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। আলির কথা শুনে কপাল কুঁচকে গেল তার। আমজাদ চৌধুরীকে হেনস্তা করার ইচ্ছে ছিল না মোটেও। কামিনী চৌধুরীর ভালো ঘর, ভালো বর নিয়ে করা অহংকারের গোড়ায় হালকা টোকা দিতেই এই পথ ধরতে হলো তাকে। এবার আশমিনের পরের পদক্ষেপের অপেক্ষা। ধীর পায়ে নিচে নামল সে। আমজাদ চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বলল, "গুড মর্নিং, আংকেল।"

আমজাদ চৌধুরী হাসার চেষ্টা করে বললেন,"গুড মর্নিং, মা। ঘুম ভেঙেছে?"

নুর মুচকি হেসে তার পাশে বসে বলল, "হ্যাঁ, আংকেল। আজ একটু লেইট হয়ে গেল।"

আশমিন তীক্ষ্ণ চোখে নুরকে পরখ করল। ঘড়িতে সময় দেখে ক্রুর হাসল সে।

"ব্রেকিং নিউজ! আজ ভোররাত থেকে এমপি আমজাদ চৌধুরীর ভাইরাল হওয়া এমএমএস, এরপর এবার আমাদের হাতে সেই রাতের আরেকটি ভিডিয়ো এসে পৌঁছেছে। ভিডিয়োতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওই মেয়ে আমজাদ চৌধুরী ঘুমিয়ে যাওয়ার পর রুমে ঢুকেছে। এমনকি সে নিজে নিজে অর্ধনগ্ন হয়ে ছবি তুলছে। পুরোটাই যে সাজানো ষড়যন্ত্র তা বুঝতে বাকি নেই কারোর। আমজাদ চৌধুরীকে বদনাম করার উদ্দেশ্যেই এসব করা হয়েছে, তা একেবারে স্পষ্ট,"

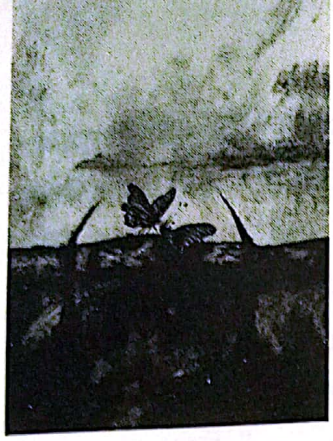
আশমিন শান্ত চোখে নুরের দিকে তাকাল। নুর চোখমুখ শক্ত করে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। আমজাদ চৌধুরী অপ্রস্তুত হলেন। নুরের সামনে এমন অপ্রীতিকর ঘটনা সামনে আসায় লজ্জা বোধ করলেন। আশমিন টিভি বন্ধ করে আমজাদ চৌধুরীকে বলল, "ইটস ওকে, আব্বু। তুমি অন্যায় কিছু করোনি। তাই লজ্জিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না। রিলাক্স। যে বা যারা এই কাজ করেছে, তাদের এখনো অনেক কিছু শেখা বাকি। চিন্তা করো না। আমি এদিকটা সামলে নেব।"

আমজাদ চৌধুরী মাথা নাড়িয়ে উঠে চলে গেলেন। এখানে থাকতে অস্বস্তি হচ্ছে তার। আমজাদ চৌধুরীর প্রস্থানের সাথে সাথেই নুর সেখান থেকে চলে গেল। আশমিন তার পরিবারকে প্রটেক্ট করছে এটা তার কাছে স্পষ্ট। তার মানে সবকিছু তৈরিই ছিল? নুরের প্রতিটা পদক্ষেপে নজর রাখছে আশমিন। রুমে এসে এলোমেলো চিন্তায় দিশাহারা অবস্থা নুরের। আশমিন নাশতা সেরে ধীরে-সুস্থে রুমে এলো। বউয়ের দিশেহারা মুখ দেখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। আশমিনকে দেখেই তেড়ে গেল নুর। চোখে চোখ রেখে রাগে ফিসফিসিয়ে বলল, "আপনি সব আগে থেকেই জানতেন, তাই না? নজর রাখছেন আমার ওপর? এসব করে আমাকে দমাতে পারবেন, ভেবেছেন? কখনো না। আপনার খুনি মাকে আঘাত থেকে বাঁচাতে চাইছেন তো? চালিয়ে যান। এবার আমিও দেখি, আপনি কতদূর পর্যন্ত যেতে পারেন।"

নুরের জেদ দেখে ভড়কাল না আশমিন। নরম গলায় বলল, "শান্ত হও, নুর। এখানে আমি শুধু একজন ছেলের দায়িত্ব পালন করেছি। তুমি যা করতে চেয়েছ, করেছ। আমি বাধা দিইনি। আমার বাবা কোনো দোষ করেনি, নুর। তাহলে সে কেন দুর্নামের ভাগীদার হবে? যদি কখনো এমন প্রমাণ হয় যে, আমার আম্মু আংকেলের খুনের সাথে জড়িত। তাহলে আমি নিজে তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন শাস্তিটা দেবো, কথা দিলাম তোমায়!"

নুরের রাগ কমেনি। সে রক্তাক্ত চোখে তাকিয়ে আছে। আশমিন হাসল। ছুট করেই বলল, "শ্বশুরের এমন ব্যক্তিগত ছবি দেখতে লজ্জা করল না তোমার? আমাকে তো কোনোদিন এভাবে দেখতে চাইলে না? আমি কি পাঞ্জাবিটা খুলে আসব?"

নুর সিদ্ধান্ত নিল সে একটা বন্দুক কিনবে। মোটা সাইজের কয়েকটা গুলিও কিনে ফেলবে সাথে। তারপর কোনো এক সন্ধ্যায় এই লোকের বুকে প্রত্যেকটা গুলি চালান করে দিয়ে মনের জ্বালা মেটাবে। অসহ্য মানুষ একটা! হনহন করে বেরিয়ে গেল নুর। আশমিন ঠোঁট কামড়ে হাসল। বখাটেদের মতো বউকে আগাগোড়া চোখ বুলাল। এই মেয়েটার হাঁটাও খুব আকর্ষণীয়! নাকি তার কাছেই সব কিছু আকর্ষণীয় লাগে?



আশমিনের নির্বাচন শেষ হয়েছে। বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে সে। এমনকি মন্ত্রীপরিষদেও তার নাম উঠে এসেছে। অবশ্য এর পিছনে কলকাঠি নেড়েছেন আমজাদ চৌধুরী। এবারের নির্বাচন করলে মন্ত্রী পদে নিয়োজিত হতেন তিনি। সেই পদটা কায়দা করে ছেলেকে পাইয়ে দিয়েছেন। আশমিন যথেষ্ট যোগ্য। ঠিক সামলে নেবে। কোথাও আটকে গেলে আমজাদ চৌধুরী তো আছেনই। নুরকে তেমন মাতামাতি করতে দেখা গেল না। সে নিজের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আশমিন শুধু দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। ইদানীং নুরের স্থির শান্ত ব্যবহার ভাবনায় ফেলছে তাকে। নুরকে নিজের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখে ভাবনা কিছুটা কমিয়েছে সে। তবুও নুরের প্রত্যেকটা পদক্ষেপে নজর রাখছে। বউকে তার এক আনারও বিশ্বাস নেই।

প্রতিদিন রাতে আশমিন গোসল সেরে একবার নিচে যায়। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। কামিনী চৌধুরীর সাথে কথাবার্তা স্বাভাবিকভাবেই চলছে। আশমিনকে নিচে নামতে দেখে কামিনী চৌধুরী এক কাপ কফি এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আব্বু, তোমার আব্বু তোমাকে স্টাডি রুমে ডেকেছে। একবার দেখা করে এসো।"

আশমিন আলগোছে মাথা নাড়ল। কফির কাপে চুমুক দিয়ে সিঁড়ি মাড়িয়ে উপরে চলে গেল সে। কামিনী চৌধুরী কাঁপা কাঁপা হাতে কপালের ঘাম মুছলেন। পরিকল্পনা মতো কাজ না হলে নিজের ছেলের সাথে কখনো চোখ মেলাতে পারবেন না। ধীর পায়ে এগিয়ে সোফায় ধপ করে বসে পড়লেন তিনি। ফুলি ডাইনিং রুমেই ছিল। সতর্ক চোখে কামিনী চৌধুরীকে দেখছিল সে। আজ সন্ধ্যায় লারা এসেছে। সেদিন আশমিনের দেওয়া শাস্তির বদৌলতে মনে ভয় ঢুকে গিয়েছিল তার। চৌধুরী-বাড়িতে ঢোকার পর থেকেই কামিনী চৌধুরীর সাথে ফুসফাস করছিল। ফুলি হাতের কাজ ফেলে দ্রুত উপরে গেল। প্রবল উত্তেজনায় রুমে ঢুকতে গিয়ে দরজায় বাড়ি খেয়ে কপালের এক পাশ ফুলিয়ে ফেলল সে। ব্যথায় আর্তনাদ করে কপাল চেপে বসে পড়ল নিচে।

"আরে কী করছ? আস্তে হাঁটবে তো? দেখি কতটা লাগল?"

নুরের উদ্‌বিগ্ন গলা শুনে চোখ তুলে তাকাল ফুলি। নুর কপাল থেকে হাত সরিয়ে বিচলিত গলায় বলল, "অনেকটা ফুলে গেছে তো! এসো, মলম লাগিয়ে দিচ্ছি। একটু দেখেশুনে হাঁটবে না? এত অস্থিরতা কীসের?"

ফুলি উঠল না। নুরের হাত ধরে ভীতু গলায় বলল, "ভাবি, আপনে এহনই ভাইয়ের কাছে যান। আমার মনে হয় ভাই কোনো বিপদে পড়ব!"

ফুলির অসংলগ্ন কথাবার্তার কিছুই বুঝল না নুর।

"কী বলছ এসব? তার আবার বিপদ কীসের? কিছুক্ষণ আগেই তো নিচে গেল।"

ফুলি অসহায় বোধ করল। সংক্ষেপে নিজের আশঙ্কার কথা জানাল নুরকে। উদ্‌বিগ্ন গলায় বলল, "ভাইজান বড়ো স্যারের ইশটাডি রুমে গেছে। কিন্তু স্যার তো বাড়িতেই নাই। সন্ধ্যায় বাইর হইছে। এহনো ফিরে নাই। বুঝতাছেন কিছু? নিশ্চয়ই ওই শয়তান মাইয়া ভাইজানের কোনো ক্ষতি করব!"

নুর শান্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। টেবিলে বসে বইয়ে মনোযোগ দিয়ে বলল, "তোমার ভাইজানের ক্ষতি করার সাধ্য ওর নেই, ফুলি। চিন্তা করো না। নিচে গিয়ে কপালে একটু বরফ লাগাও। যাও।"

ফুলি নিরাশ হলো। অসহায় চোখে নুরের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক পলক। আস্তে-ধীরে উঠে চলে গেল রুম থেকে। নুর নিজেকে শান্ত রাখতে চাইছে। আশমিনের ভাবনা চেয়েও মাথা থেকে বের করতে পারছে না সে। অসহ্য হয়ে বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। শাড়ির আঁচল ঠিক করে স্টাডি রুমের দিকে এগিয়ে গেল সে।

রুমে ঘুটঘুটে অন্ধকার দেখে কপাল কুঁচকে গেল আশমিনের। এভাবে আলো নিভিয়ে রাখার মানে কী? এই বয়সে কি এখন বাবার সাথে লুকোচুরি খেলবে সে? বাবাটা আজকাল নায়িকাদের মতো ন্যাকা হয়ে যাচ্ছে। চোখমুখ গম্ভীর হয়ে গেল তার। কফির কাপ হাতড়ে টেবিলে রেখে আমজাদ চৌধুরীকে ডাকল, "আব্বু।"

মাথাটাও কেমন ঝিমঝিম করছে। শরীরে অন্যরকম এক উন্মাদনার আভাস পাচ্ছে সে। আশমিন এবার ভয়ানক বিরক্ত হলো। একে তো বউ তার কাছে ঘেঁষে না। প্রতিবেশীর বউয়ের মতো দূরত্ব মেইনটেইন করে চলে। এখন এই আচানক উদয় হওয়া পাগলামি ভালোবাসা সে কাকে দেখাবে? দেওয়ালে সিঁটিয়ে থাকা বইগুলো কে? নিজ মনেই বিরক্তি ঝাড়ল আশমিন। মাথা দুবার ঝাঁকিয়ে সামনে এগিয়ে যেতেই খট করে দরজা বন্ধের শব্দ হলো।

অন্ধকারে দুটো হাত এসে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল তাকে। ঝোঁক সামলাতে না পেরে কয়েক কদম পিছেয়ে গেল আশমিন। অন্ধকারে কিছুই তার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। হাতড়ে কিছু একটা ধরার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো সে। বিপদের ঝাঁঝালো গন্ধ নাক হয়ে মস্তিষ্কে খবর পৌঁছে দিলো অনায়াসে। শরীর টলে যেতেই গায়ের সাথে লেপটে থাকা মানুষটা সামলে নিল তাকে। আশমিন হালকা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো মানুষটিকে। দেওয়াল হাতড়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালাল সে। ঝাপসা চোখে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অর্ধনগ্ন লারাকে দেখে রাগে শরীর কাঁপছে তার। এক হাতে দেওয়ালে ভর দিয়ে জড়ানো গলায় বলল, "এই মুহূর্তে এখান থেকে বেরিয়ে যাও। যা করেছ তার ফল হজম করতে পারবে না।"

আশমিনের ঠান্ডা হুমকিতে ভয় পেল লারা। মুখে প্রকাশ না করে এগিয়ে গেল আশমিনের দিকে। আশমিনের এক হাত নিজের কোমরে রেখে গলা জড়িয়ে ধরল তার। লাস্যময়ী হেসে বলল, "বেরিয়ে যাওয়ার জন্য তো আসিনি, বেবি। তোমাকে নিজের করতে এসেছি। আজ আমি পুরোপুরি তোমার মাঝে ডুবে যাব।"

আশমিন ঝাড়া দিয়ে নিজের হাত ছাড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। ঘৃণায় গা গুলিয়ে উঠল তার। প্রবল আক্রোশে এক হাতে গলা চেপে ধরল লারার। আশমিনের কাঁপতে থাকা হাতটা অবলীলায় ছাড়িয়ে নিল লারা। বিদ্রুপের হাসি হেসে আশমিনের বুকে নাক ঘষে বলল, "কাজ হবে না, বেবি। যতই চেষ্টা করো না কেন, আজ আমাকে এড়িয়ে যেতে পারবে না। এভাবে মুখ ফিরিয়ে না রেখে একবার আমার দিকে তাকাও। একবার আদর করে ছুঁয়ে দেখো আমায়। নিরাশ হবে না। তোমার বউয়ের চেয়েও বেশি সুখ দেবো। ট্রাস্ট মি!"

লারার আকুতি ভরা গলায় একবিন্দুও টলল না আশমিন। শক্ত হাতের বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল সে। পুরো শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে তার। আর কিছুক্ষণ এভাবে থাকলে ভয়ংকর কিছু ঘটে যাবে। নারীদেহের আকর্ষণ তাকে পাগল করে দিচ্ছে। লারার জায়গায় বারবার নুরকে দেখছে সে। নেশা জাতীয় কিছু তাকে দেওয়া হয়েছে এটা নিশ্চিত। কীভাবে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাবে সেই চিন্তা করার শক্তিটুকুও অবশিষ্ট নেই। এক মনে আল্লাহকে ডাকতে লাগল সে। তখনই বাইরে থেকে দরজা খুলে গেল। অতিরিক্ত উত্তেজনায় দরজার লক ঠিকমতো হয়েছে কি-না ধ্যান দেয়নি লারা। চমকে সেদিকে তাকাতেই গলা শুকিয়ে গেল তার। রক্তিম মুখে নুরকে দেখে ছিটকে সরে গেল আশমিনের ওপর থেকে। আশমিন পড়ে যেতে নিলেই নুর এসে আগলে ধরল তাকে। চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে সতর্ক চোখে তাকাল

আশমিনের দিকে। আশমিনের প্রায় বুজে আসা চোখের দিকে তাকিয়ে ঘটনা কিছুটা আন্দাজ করল। লারা নিজের অনাবৃত শরীর ঢাকতে ব্যস্ত। নুর এগিয়ে লারার সামনে দাঁড়াল। শক্ত হাতে চড় বসাল তার গালে। আঙুল তুলে দাঁতে দাঁত চেপে

বলল, "হি ইজ মাইন! হাত লাগানোর সাহস কোথায় পেলি?"

লারাকে কিছু ভাবার সময় না দিয়েই হাতটা মুচড়ে ধরল নুর। ভাঙা হাতে পুনরায় আঘাত করতেই আর্তনাদ করে উঠল লারা। কয়েক সেকেন্ড হাত মুচড়ে ধরে টেনে রুম থেকে বের করে নিয়ে গেল। লারা শব্দ করে কাঁদছে। ব্যথায় হাত অবশ হওয়ার জোগাড়। সিঁড়ি বেয়ে লারাকে টেনে নামাতে দেখে ভড়কে গেলেন কামিনী চৌধুরী। ফুলি-সহ আরও কয়েকজন স্টাফ এগিয়ে এসেছে। নুর কামিনী চৌধুরীর সামনে গিয়ে তার দিকে ছুড়ে মারল লারাকে। হতভম্ব কামিনী চৌধুরী এক হাতে লারাকে আগলে নিলেন। অজানা শঙ্কায় বুক কাঁপছে তার। নুর কামিনী চৌধুরীর সামনে গিয়ে হিসহিসিয়ে বলল, "নিজের নোংরা রূপটা ছেলের সামনে দেখিয়েই দিলেন তাহলে? কতটা নীচ হলে একজন মা তার বিবাহিত ছেলেকে বেশ্যার কাছে পাঠাতে পারে! কাল সকালের জন্য অপেক্ষা করুন, মিসেস চৌধুরী। আপনার পতন আপনি নিজে ডেকে এনেছেন। ছেলের চোখে অপরাধী হতে নিজেকে তৈরি করুন।"

কামিনী চৌধুরী চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রইলেন। নুর তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে গার্ডসদের ডাকল। বাহাদুর সাথে সাথেই সেখানে হাজির হলো।

"আপনার স্যারকে স্টাডি রুম থেকে তার রুমে দিয়ে আসুন।"

বাহাদুর দেরি করল না। দ্রুত পায়ে ছুটল স্টাডি রুমের দিকে। নুর মিইয়ে যাওয়া লারাকে চোখে শাসিয়ে চলে গেল সেখান থেকে।

আশমিনের ঘুম ভাঙল দুপুর গড়িয়ে। মাথায় টনটনে ব্যথা নিয়ে উঠতে গেলে আলি বাধা দিলো, "উঠতে হবে না, শুয়ে থাক।"

আশমিন চোখ পিটপিট করে তাকাল। বেডের সাইডে আলি বসে আছে। কাউচে আমজাদ চৌধুরী। সবার মুখ থমথমে। আশমিন আতঙ্কিত হলো। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখল সব ঠিক আছে কি-না। পরনে কাল রাতের পোশাক দেখে নিশ্চিন্ত হলো।

"মাথা ব্যথা কমবে না। হালকা কিছু খেয়ে ওষুধ খেতে হবে।"

আশমিন শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, "আমাকে কী দেওয়া হয়েছিল?"

"আইস: বিদেশি ড্রাগস। শরীরের উত্তেজনা বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।"

আমজাদ চৌধুরী নিশ্চুপ বসে আছেন। আশমিন শুয়ে পড়ল। বাবার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, "কাজটা ঠিক করোনি, আব্বু। এভাবে দুষ্টু নারী দিয়ে আমার ইজ্জত লুটতে চাওয়া কোনো ভালো বাবার কাজ নয়।"

আমজাদ চৌধুরী অবাক হলেন। বিস্ময় নিয়ে বললেন, "আরে, আমি কী করলাম? আমি তো কাল বাসায়ই ছিলাম না। তুমি নিজে লজ্জাজনক কাণ্ড ঘটিয়ে এখন আমার ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছ?"

আশমিন চটে গেল। ঘাড় উঁচু করে কপাল কুঁচকে বলল, "আমি করেছি? এ বাড়ির প্রত্যেকটা দেওয়াল আমার ভদ্রতার সাক্ষী দেবে। নতুন রং করালে তাদের দিকে পর্যন্ত আমি লালসার দৃষ্টিতে তাকাই না। এখনো নিজের বউয়ের দিকে পর্যন্ত প্রেম প্রেম নজরে তাকাইনি। বাসর তো অনেক পরের কথা! আর তুমি আমার চরিত্রে কাজল লাগাতে চাইছ? শোনো আব্বু, তোমার ছেলে এখনো কুমার। কোনো বালিকার সাথে তার কোনো দুষ্টু কাজকারবার হয়নি। তোমার তো গর্ব করা উচিত। তা না করে সন্দেহবাতিক প্রেমিকার মতো আমার দিকে আঙুল তুলছ?"

আমজাদ চৌধুরী হতবাক হয়ে রইলেন। ক্লান্ত চোখে মাথা নাড়লেন। এই ছেলের সামনে মুখ খোলাই তার পাপ হয়েছে। বে-লাজ বেহায়া ছেলের বাবাদের চুপ থাকাটাই জগতের নিয়ম। মনে হতাশার শ্বাস ছাড়লেন তিনি। আলি হাসি আটকাতে এদিক–সেদিক তাকাচ্ছে। বন্ধুর মেজাজ ঠিক নেই। না-হলে দেওয়ালের দিকে লালসার দৃষ্টিতে তাকানোর লজিকটা সে অবশ্যই জেনে নিত।

আশমিনের হাঁসফাঁস লাগছে। চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে নুরকে খুঁজল সে। আলি লক্ষ করে বলল, "খুঁজে লাভ নেই। অফিসে গেছে। আংকেল তাকে নতুন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে নিয়োগ করেছেন।"

আশমিন অবাক হলো। এই পদে স্বয়ং আমজাদ চৌধুরী নিজে ছিলেন। হুট করেই নুরকে অফিসে বসানোর ব্যাপারটা ঠিক লাগছে না তার। আমজাদ চৌধুরীর আর আশমিনের গার্মেন্টস এখন এক কোম্পানি থেকেই পরিচালনা করা হয়। নুর জার্নালিজম নিয়ে পড়াশোনা করছে। ফ্যাশন হাউজে তার কী কাজ, সেটাই বুঝল না আশমিন। তার ভাবনার মাঝেই বোম ফাটালেন আমজাদ চৌধুরী। শান্ত গলায় বললেন, "আমার কোম্পানির ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট শেয়ার আমি নুরের নামে লিখে দিয়েছি। চৌধুরী মাল্টি ন্যাশনাল

কোম্পানির বড়ো শেয়ারহোল্ডার হচ্ছে নুর। আজ থেকে নিজের দায়িত্ব বুঝে নেবে ও। তুমি টেনশন করো না। রাজনীতিতে মন দাও।"

আলি আর আশমিন চোখ বড়ো বড়ো করে আমজাদ চৌধুরীর দিকে তাকাল। আমজাদ চৌধুরী দেখেও না দেখান ভান করলেন। ছেলে আর নিজের স্ত্রী, কারও ওপরই ভরসা নেই। মাঝখান থেকে তিনি পিষে যাচ্ছেন। অনেক বছর আগে নিজের অজান্তে করা ভুল এবার শুধরে নেবার পালা। বুক ভারী হয় উঠছে আমজাদ চৌধুরীর। ধীর পায়ে বেরিয়ে গেলেন রুম থেকে। আশমিন চিন্তিত চোখে আলির দিকে তাকাল। আলি ভ্রু উঁচু করে জানাল, সে কিছুই জানে না।



অফিসে এসে নিজের কাজ বুঝে নিয়েছে নুর। মিজু সিদ্দিক অফিসে এসে নুরকে দেখে অসন্তুষ্ট হলেন। চৌধুরী কোম্পানিতে তারও কিছু শেয়ার আছে। কাল রাতে লারাকে করা অপমান ভোলেননি তিনি। মেয়ের গালে আঙুলের ছাপ আর ফুলে যাওয়া হাতের কথা মাথায় আসতেই রাগ বেড়ে গেল তার। নুরকে কিছু না বলে ফোঁসফোঁস করে অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন। আজ সকালেই বিরোধী দলের নেতা কায়সার কামালের সাথে দেখা করেছেন তিনি। লোকটা আমজাদ চৌধুরী আর আশমিনের ওপর অসম্ভব খ্যাপে আছেন। একটা পুঁচকে ছেলের কাছে হেরে যাওয়াটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না তিনি। তার ওপর মন্ত্রী পরিষদে নিজের জায়াগা করে নিয়েছে আশমিন। গায়ের জ্বালায় যেন লবণ পড়েছে তার। এই জ্বালাটাকেই কাজে লাগাবেন মিজু সিদ্দিক। বিদেশ থেকে আসা তার ড্রাগস 'আইস' নতুন ধরনের মাদক। এর কেমিক্যাল নাম মেথান ফিটামিন, উৎপত্তিস্থল অস্ট্রেলিয়া, মালেয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও চায়না। সেবু, ক্রিস্টাল ম্যাথ, ডি ম্যাথ-সহ আইসের আরও নাম রয়েছে। দশ গ্রাম আইস মাদকের দাম এক লক্ষ টাকা। এটি স্নায়ু উত্তেজক ড্রাগ। এটি গ্রহণে হরমোন উত্তেজনা স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে হাজারগুণ বৃদ্ধি পায়। তিনটি ফরমেশনে এটি গ্রহণ করা হয়; ধুমপান আকারে, ইনজেক্ট করে ও ট্যাবলেট হিসেবে। বিদেশ থেকে উচ্চবৃত্তদের জন্য এই ড্রাগ আনা হয়েছে। প্রতিবার মাদকদ্রব্য আইস সেবনে দশ থেকে বারো হাজার টাকা খরচ হয়। উচ্চবৃত্ত পরিবারের সন্তানদের টার্গেট করে এদেশে মার্কেট ধরতে বিদেশ থেকে মাদকদ্রব্য আইস এনেছেন মিজু সিদ্দিক। এছাড়াও চাকরির নাম করে গ্রাম থেকে মেয়ে এনে বিদেশে পাচার করেন তিনি। বেশিভাগ মেয়ে থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর-সহ ইউরোপ কান্ট্রিতে পাঠানো হয়। এ লাইনের অনেক পুরোনো খেলোয়ার তিনি। চৌধুরী কোম্পানির বাণিজ্যিক দিকটা মিজু সিদ্দিক দেখেন। সুযোগের সৎ ব্যবহারটা তিনি খুব ভালো করেই করতে জানেন। ধরা পড়লেও তার নাম কখনো সামনে আসবে না। আশমিনের গার্মেন্টস বিজনেস চৌধুরী ইন্ডাস্ট্রির তত্তাবধানে আসায় সোনায় সোহাগা হয়েছে তার জন্য। আশমিনের গার্মেন্টস মেটেরিয়াল বেশিভাগ দেশের বাইরে থেকেই আসে।

মডেল সাবার সাথেও তার ভাব আছে। তার ব্যাবসা এবার রমরমা চলবে বলেই আশাবাদী ছিলেন তিনি। মাঝখান থেকে এই মেয়ে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। এর একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে। মনে মনে ছক কষছেন মিজু সিদ্দিক। এবার আর হাত গুটিয়ে বসে থাকার সময় নেই।

অফিস শেষে তানভিরকে সঙ্গে নিয়ে অমির অফিসে হাজির হলো নুর। ভাইয়ের সামনে বসে চিন্তিত গলায় বলল, "কোনো খোঁজ পেলে, ভাইয়া?"

"নাহ, আমি কাল শ্যামলপুর গিয়েছিলাম। কামিনী চৌধুরীর মা-বাবা কেউই তো বেঁচে নেই। বহু বছর আগের ঘটনা বলে অনেকেই এই বিষয়ে তেমন কিছু জানে না। তাছাড়া এমপির বউ, আবার এখন তো মন্ত্রীর মা। প্রাণের ভয়েও কেউ মুখ খুলবে না।"

নুর হতাশার শ্বাস ফেলল। তানভির গম্ভীর গলায় বলল, "এভাবে হবে না। পুরোনো ইতিহাস ঘেঁটে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এর চেয়ে বরং আংকেলের মার্ডারের ব্যাপারটা নিয়ে কাজ করা যাক। একবার আসল কালপ্রিট ধরা পড়লে বাকি সত্যিটাও আপনাআপনি সামনে চলে আসবে।"

অমি তানভিরের সাথে সম্মত হলো। আশিয়ান পুলিশের ট্রেইনিং-এ আছে। গতমাসেই সিলেকশন হয়েছে তার। এদিক থেকে ওরা কিছুটা নিশ্চিন্ত। ওখানে আশিয়ান পুরোপুরি সেইফ থাকবে।

"আমার একজন বডিগার্ড লাগবে, ভাইয়া। ব্যবস্থা করতে পারবে?

"পারব, কিন্তু এত গার্ড থাকতে আবার নতুন করে গার্ড চাইছিস কেন?"

"প্রয়োজন আছে, ভাইয়া। তুমি ব্যবস্থা করো।"

অমি মথা নেড়ে সায় জানাল। নুর চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে বলল, "এবার উঠি, ভাইয়া। মায়ের খেয়াল রেখো।"

পেছন থেকে অমি নুরকে ডেকে বলল, "আশমিন ভাইয়া নির্দোষ, আলো। অযথা নিজেদের মধ্যে তিক্ততা বাড়াস না। আরেকজনের অন্যায়ের শাস্তি তাকে দিস না।"

নুর মলিন হেসে বলল, "আমার আব্বুও নির্দোষ ছিল, ভাইয়া। তাকে কেন শাস্তি পেতে হলো? হিসেবটা খুব সহজ ভাইয়া, ভালোবাসার পাপটা আমি করেছিলাম। তার দায় আব্বুকে নিজের জীবন দিয়ে দিতে হলো। প্রত্যক্ষভাবে না হোক, পরোক্ষভাবে তিনিই দায়ী। তাই তাকে এক চুলও ছাড় নয়।"

তানভির আর অমি তপ্ত শ্বাস ছাড়ল। দুজনের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত তারা। কী হবে এদের সম্পর্কের সমাপ্তিতে?

মন্ত্রণালয়ের কাজ সামলাতে পুরোপুরি ব্যস্ত আশমিন। অফিসের দিকে যাওয়া হয় না অনেকদিন হলো। হাতের কাজগুলো শেষ করে সানভিকে ডাকল সে, "গাড়ি বের করতে বলো, সান। অফিসে যাব। সাবাকেও আসতে বলো। পাঁচটার মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে বলো তাকে।"

"ওকে, স্যার।"

সানভি দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল। আশমিন নিজের কাজ গুছিয়ে উঠে দাঁড়াল। কেবিনের সাথে লাগোয়া ওয়াশরুম চলে গেল ফ্রেশ হতে। আজ বউয়ের সাথে হালকা রোমান্স করার প্রস্তুতি নিয়ে অফিসে যাচ্ছে সে। বেয়াদবটা ইদানীং আলাদা রুমে থাকছে। সেদিনের ব্যাপারটাকে ইস্যু করে তার চরিত্রে এক খাবলা গোবর লেপটে দিয়েছে অসভ্যটা। বিয়ের বছর ঘুরতে চলল, অথচ সে বউয়ের কাছেই ঘেঁষতে পারল না। নিজেকে ধিক্কার দিতে মোটেও কৃপণতা করল না আশমিন। আজ একটা হেস্তনেস্ত করেই বাড়িতে ফিরবে।

প্রচণ্ড গম্ভীরমুখে অফিসে পা ফেলল আশমিন। তাকে দেখেই সবাই তটস্থ হয়ে গেল। মুখের ভাব আরেকটু গম্ভীর করে কনফারেন্স রুমে ঢুকল সে। মোটামুটি সবাই তখন উপস্থিত। নুর বিরক্ত চোখে তাকিয়ে আছে। পাঁচটায় মিটিংয়ের কথা বলে রাত আটটায় এসেছে। আর ভাবটা এমন যে, তারাই সবাই লেইট করেছে। অসহ্য একটা মানুষ! আশমিনের গম্ভীর মুখ দেখে আলি হাই তুলে বলল, "কী হইছে, মামা? মুখটা এমন প্যাঁচার মতো কইরা রাখছস ক্যান?"

আশমিন নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। সাবা পাশের চেয়ারে বসে মোহনীয় চোখে আশমিনকে দেখছে। আশমিন আলির কথার জবাব দিলো না। ব্যস্ত গলায় সানভিকে জিজ্ঞেস করল, "মৌরি কোথায়?"

"ম্যাম আজ আসতে পারবে না, স্যার।"

"কেন?"

"আজকে পাত্রপক্ষ তাকে দেখতে আসবে।"

আলির মুখটা থমথমে হয়ে গেল। আশমিন লক্ষ করে মুচকি হাসল। আড়চোখে নুরের বিরক্ত মুখটা দেখে সম্পূর্ণ মনোযোগ সাবার দিকে দিলো। মুখের হাসি চওড়া করে নমনীয় গলায় বলল, "কেমন আছেন, মিস. সাবা?"

"আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। ইদানীং তো আপনার দেখাই পাওয়া যায় না। অমাবস্যার চাঁদ হয়ে গেছেন খুব।"

আশমিন হাসল। নেশা ধরা গলায় বলল, "আপনার কাছাকাছিই তো আছি। চাঁদ–তারার দূরত্ব তো খুব বেশি নয়। আপনি স্টার বলে কথা।"

আশমিনের সস্তা রসিকতায় সাবা গলে গেলেও নুরের মেজাজ খারাপ হলো। রাগ মিশ্রিত হাসি দিয়ে গোলাম রব্বানিকে বলল, "আপনি বরং রেস্ট রুমটা খুলে দিন, রব্বানি সাহেব। মন্ত্রী সাহেব খুব ক্লান্ত। চাঁদ–তারা একসাথে থাকলে কিছুটা রিফ্রেশমেন্ট পাওয়া যাবে।"

গোলাম রব্বানি অসহায় মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। আশমিনের হাসি হাসি মুখটা এখন গম্ভীর দেখাচ্ছে। নুরের কথার কোনো জবাব না দিয়ে আলিকে মিটিং শুরু করতে বলল।

প্রায় দুই ঘণ্টার মিটিং শেষে সিদ্ধান্ত হলো আগামী মাসে সাবা মালয়েশিয়া যাবে। সেখানকার একটা র‍্যাম্পে মালাই সুন্দরীদের সাথে র‍্যাম্পওয়াক করবে সে। সাবা এক কথায় রাজি হয়ে গেল।

আশমিন মিটিং শেষ করে রেস্ট রুমে চলে গেছে। নুর নিজের কেবিনে আসতেই আশমিনের ডাক পড়ল। স্বাভাবিকভাবেই নুর রেস্ট রুমে গেল। আশমিন গায়ের পাঞ্জাবি খুলে খালি গায়ে বসে আছে। নুরকে দেখে দুষ্টু হাসল। কয়েক কদম এগিয়ে নুরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ধীর গলায় বলল, "তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।"

"কেন?"

নুরের তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বিরক্ত হলো আশমিন। মেয়েটার মাঝে ন্যূনতম রোমান্টিকতা নেই। এমন সুপুরুষ স্বামী তার সামনে কাপড় খুলে বসে আছে। কোথায় ক্ষুধার্ত হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে। তা না করে বলছে—কেন!'

খিঁচে যাওয়া মেজাজ নিয়েই আশমিন নুরকে এক হাতে ঘুরিয়ে নিজের সাথে চেপে ধরল। ঘাড়ের উপর তপ্ত শ্বাস ফেলে নেশা ধরা গলায় বলল, "আদর করব, তাই। অনেকদিন তো হলো। এবার এই তৃষ্ণার্ত প্রেমিককে একটু ভালোবাসার পরশ দাও। এই দূরত্ব আর সহ্য হয় না।"

নুরের সর্বাঙ্গে অনুভূতির ছোড়াছুড়ি খেলে যাচ্ছে। কিছু বলতে গিয়েও গলা কেঁপে উঠছে তার। ততক্ষণে আশমিনের ঠোঁট নুরের গলার ভাঁজে নিজের রাজত্ব চালাতে ব্যস্ত। নুর কাঁপা কাঁপা হাতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল। বুজে যাওয়া গলায় অস্পষ্ট স্বরে বেরিয়ে এলো, "নাহ।"

আশমিন শুনল না। উন্মাদের মতো নিজের সাথে জড়িয়ে নিল নুরকে। এক হাতে কোমর প্যাঁচিয়ে উপরে তুলে ফেলল তাকে। বিধ্বস্ত নুর হাল ছেড়ে দিলো। আশমিন ততক্ষণে তার সারা শরীরে নিজের ভালোবাসার চিহ্ন একে দিচ্ছে। আশমিনের অসভ্য হাতের বেপরোয়া ছোঁয়া থেকে মুক্তি পেতে ছটফট করে উঠতেই আশমিন নুরের দুহাত চেপে ধরল। ঠোঁটে লম্বা চুমু খেয়ে নুরকে ছেড়ে ঝটপট উঠে দাঁড়াল সে। নেতিয়ে যাওয়া নুর প্রশ্নবোধক চাউনি দিতেই আশমিন নিজের রূপে ফিরে এলো। চোখেমুখে দুঃখের ফোয়ারা সাজিয়ে দুঃখী গলায় বলল, "এভাবে তুমি আমাকে জবরদস্তি করতে পারো না, বউ। আমার সরলতার সুযোগ নিয়ে বন্ধ রুমে আমার সর্বনাশ করতে বিবেকে বাধল না তোমার? এই দেখো, বুকে নখের আঁচড় বসিয়ে দিয়েছ! জনগণকে এই মুখ দেখাব কী করে?"

হতভম্ব নুর বোকার মতো তাকিয়ে রইল আশমিনের দিকে। কয়েক সেকেন্ডে আশমিনের শয়তানি বুঝে ফেলল সে। ইচ্ছে করেই তাকে অনুভূতির সাগরে ভাসিয়ে এখন নৌকা নিয়ে পালাচ্ছে। নুর নিজেকে সামলে নিল। আশমিন ততক্ষণে পাঞ্জাবি পরে তৈরি। নুরকে উঠতে দেখেই দুষ্টু হাসল সে। পাঞ্জাবির বোতাম লাগিয়ে নুরকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, "আমি তো এভাবে বাসর করব না, বউ। অফিসে কি বাসর হয়? একটা প্রস্তুতির ব্যাপার আছে না? একদিন সময় করে সেজেগুজে বাসরটা করে নেব। এখন ইচ্ছে করছে না। আজ আমি ব্যস্ত। আসছি।"

আশমিন ঠোঁট কামড়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। নুর শুধু দাঁতে দাঁত চেপে দেখল সবটা। এর প্রতিশোধ সে সময়মতো ঠিক নিয়ে নেবে। বর্বর মন্ত্রী! মনে মনে খায়েশ মিটিয়ে গালি দিলো সে।



দেখতে দেখতে রাফসান শিকদারের মৃত্যুর দুবছর কেটে গেছে। নুর নিজের মতো ব্যস্ত। কামিনী চৌধুরীর সাথে কথা হয় না তার। ইচ্ছে করেই এড়িয়ে চলে সে। রাফসান শিকদারের খুনিকে না পেলেও অনেক গোপন তথ্য হাতে এসেছে নুরের। কাসেম শিকদারের বলা কথাগুলোর প্রমাণ এখন তার হাতে। এতে অবশ্য খুব একটা উপকার হবে না। আশমিন কামিনী শিকদারকে জেল অবধি পৌঁছতে দেবে না কখনোই। তবে এই সত্যিগুলো আশমিনের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে সে। ইদানীং মিজু সিদ্দিকেকে সাবার ফ্ল্যাটে ঘনঘন যাতায়াত করতে দেখা যায়। বিষয়টা স্বাভাবিক নয়। সেদিন স্টাডি রুমের ঘটনার পর থেকেই লারা নিখোঁজ। ব্যাপারটাতে আশমিনের হাত আছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মুখে কিছু না বললেও মিজু সিদ্দিক আঁচ করতে পেরেছেন। এ নিয়ে কামিনী চৌধুরী কয়েকবার কথা বলতে গেলেও নীরব থেকেছে আশমিন। সেদিনের পর থেকে মায়ের সাথে তার সম্পর্কটা প্রায় নিভু নিভু। ছেলের তাঁর প্রতি এই নির্লিপ্ততা দেখে মুষড়ে পড়েছেন তিনি। বহুবার কেঁদে বিলাপ করতে দেখেছে নুর। যে নারী অন্য মায়ের বুক থেকে তার সন্তানকে কেড়ে নেয় সে কীভাবে নিজের সন্তানের জন্য এমন হাহাকার করে? বুঝে আসে না নুরের।

অফিসের কাজে আমজাদ চৌধুরী মালেয়েশিয়া গিয়েছেন মাসখানেক আগে। আশমিন আর আলি সব দিক সামলে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। মৌরি প্রেগন্যান্ট থাকায় তাকে অফিসে যেতে দিচ্ছে না আলি। সেদিন আলি নিজের মনের কথা চেপে রাখতে পারেনি। আশমিনের কাছে নিজের ভালোবাসার কথা অকপটে স্বীকারও করেছে। আশমিন সাথে সাথেই নুর আর আলিকে নিয়ে হাজির হয়েছে মৌরির বাড়িতে। মৌরির ধূর্ত বাপ দোনামনা করলেও আশমিনের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছেন। তবে শর্ত জুড়ে দিয়েছেন মৌরি আর আলিকে বিয়ের পর তাঁর সাথেই থাকতে হবে। মা মরা একমাত্র মেয়েকে ফেলে তিনি থাকতে পারবেন না। আশমিন আর আলি একবাক্যে রাজি হলেও বেঁকে বসেছিল মৌরি। তার সোজা কথা, সে কোনো তর্কবাজ

গাধাকে বিয়ে করবে না। তার ভাষ্যমতে, আলি তাকে সিকি পয়সারও সম্মান দেয় না। যখন-তখন মানুষের সামনে তাকে হেনস্তা করে। এই বিয়ে সে করবে না।

আশমিন অবশ্য এর মধ্যে কথা বলেনি। আলির ব্যাপার আলি বুঝে নিক। ভাই-বন্ধু হয়েছে বলে তো আর বউ পটিয়ে দেওয়া যায় না! আলিকে সামলাতে বলে কেটে পড়েছে সে।

আলি জীবনে প্রথমবারের মতো নরম গলায় নিজের ভালোবাসা বুঝিয়েছে মৌরিকে। মৌরির জেদ কিছুতেই কমে না। সে গোঁ ধরে বসে আছে দেখে ধুপধাপ কয়েক ঘা লাগিয়ে দুমিনিটে রাজি করিয়ে ফেলেছে। আলি আবার হাতের কাজে বিশ্বাসী। আগে মাইর পরে কথা।

ধুমধামে না হলেও মোটামুটি আয়োজন করেই বিয়ে হয়েছে তাদের। আশমিনের রাতের আধঘণ্টা বন্ধুদের জন্য বরাদ্দ রাখা। সেই সময় সে মনোযোগ দিয়ে দুজনের অভিযোগ শোনে। তারপর কোনোরকম সান্তনা না দিয়েই ফোন কাটে সে। বউয়ের আদর ভালোবাসা পেয়ে তেল হয়ে গেছে বেয়াদবের। সে যে বউয়ের কাছে ঘেঁষতে পারে না, বউকে ছুঁয়ে দিলেই ছ্যাঁৎ করে ওঠে, কাউকে কি অভিযোগ করেছে সে? এদিকে বাবা হওয়ার চিন্তায় তার নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হওয়ার জোগাড়। বন্ধু বিয়ে করে বাচ্চার বাপ হয়ে যাচ্ছে। আর সে বসে বসে হাপিত্যেশ করে মরছে।

মুন্সিগঞ্জের একটা সমাবেশ শেষ করে ঢাকায় ফিরছে আশমিন। চশমার উপর দিয়ে সানভির চুপসে যাওয়া মুখটা দেখল সে। ফোনে মনোযোগ দিয়ে শান্ত গলায় বলল, "কিছু বলতে চাও, সান?"

হাঁসফাঁস করতে থাকা সানভি চমকে গেল। লুবানার সাথে প্রেমের হাতেখড়ি হবে হবে ভাব। আশমিন কি সবটা ধরে ফেলল? ভয়ার্ত চোখে তাকাল আশমিনের দিকে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "কী বলব, স্যার?"

আশমিন অগোচরে হাসল। ফোনে দৃষ্টি রেখে গলার স্বর গম্ভীর করে বলল, "কিছুই বলার নেই?"

সানভি দ্বিধান্বিত চোখে দ্রুত মাথা নাড়ল। তার কিছু বলার নেই। আশমিনের গাড়ির সামনে ও পিছনে তার গাড়ি বহর। দুটো পুলিশের গাড়ি ও র‍্যাবের গাড়ি আগপিছ করে তার গাড়ির সাথেই চলছে। আশমিন চোখ বুজল। কামিনী চৌধুরী একের পর এক ফোন দিচ্ছেন তাকে। মায়ের সাথে দূরত্ব তার নিজের তৈরি। চাইলেও সম্পর্ক সমান্তরাল হবে না আর। নুরের সাথে মায়ের করা অন্যায় ব্যবহার কিছুতেই মাথা থেকে বের করতে পারে না

সে। ছেলে হয়ে মাকে শাস্তি সে দিতে পারবে না, কিন্তু বাবা তো পারতেন! তিনি কেন চুপ রইলেন? মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আশমিন। দূরত্ব বাড়িয়ে দিলেও মাকে সে অসম্ভব ভালোবাসে। এই ভালোবাসার জন্যই নুরের চোখে সে অপরাধী।

নুরের ব্যক্তিগত গার্ড খবর দিয়েছে কিছুক্ষণ আগেই মিজু সিদ্দিক সাবার ফ্ল্যাটে গিয়েছেন। নুর আর দেরি করেনি। সাথে সাথেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছে। লারার গায়েব হওয়ার পর থেকেই সুমা সিদ্দিক আর লিনাকে চৌধুরী-বাড়িতে দেখা যায়নি। সেদিন কামিনী চৌধুরীর সাথে লারা আর সুমা সিদ্দিকও মুন্সিগঞ্জ গিয়েছিলেন। রাফসান শিকদারের খুনের পিছনে তাদের হাত নেই তো? নুরের মনে সন্দেহের দানা বাঁধতে লাগল। সাবার বাসা বনানী এগারো নম্বর রোডে। যাওয়ার আগে অমিকে ফোনে সবটা জানাল সে। অমি বিচলিত হলো। সাথে সাথেই সব জানাল আশমিনকে। অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকা আশমিন কোনোরকম গার্ড ছাড়া তৎক্ষণাৎ বেড়িয়ে পড়ল বনানীর উদ্দেশে।

সাবার বাসায় পৌঁছে সদর দরজা খোলা দেখে কপাল কুঁচকে গেল আশমিনের। ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করতেই জিনিসপত্র ছড়ানো-ছিটানো দেখে ঘাবড়ে গেল সে। এগিয়ে যাওয়ার আগেই সেখানে পুলিশের আগমন ঘটল। আশমিন প্রথমে বুঝতে না পারলেও পুলিশ ফোর্সের সাথে আশিয়ানের উপস্থিতি তাকে বুঝিয়ে দিলো, এখানে কিছু একটা ঘটে গেছে। বুক কেঁপে উঠল তার। নুরের কিছু হয়নি তো? বিচলিত আশমিন দ্রুত ছুটে গেল ভেতরে। বেডরুমে সাবার নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। এর মানে তার বউয়ের কিছু হয়নি। আশমিনের পাশাপাশি আশিয়ানও এসে দাঁড়িয়েছে।

"ওকে মারল কে?"

আশমিনের কথায় বিরক্তি ঝরে পড়ছে। আশিয়ান ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসছে, "সে তো আপনি বলবেন, স্যার। এখানে তো আপনাকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।"

আশমিন তীর্যক চোখে আশিয়ানকে দেখল। আশিয়ানের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা ইন্সপেক্টর কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "স্যার, উনি একজন মন্ত্রী। যা বলার বুঝে শুনে বলুন।"

"মন্ত্রী কি খুন করতে পারে না? লাশের পাশে যাকে পাওয়া গেছে তাকেই তো গ্রেফতার করতে হবে। কথা না বাড়িয়ে লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করো।"

আশিয়ান হাসি হাসি মুখ করে আশমিনকে

বলল, "চলুন, স্যার। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আপনাকে পিবিআই অফিসে যেতে হবে।"

আশমিন দ্বিমত করল না। চুপচাপ বেরিয়ে নিজের গাড়িতে উঠে বসল সে। মনে মনে নুরের জন্য শঙ্কিত হলো। পকেট হাতড়ে ফোন বের করে দ্রুত কল করল সানভিকে, "তোমাদের ম্যাডাম কোথায় আছে তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করে আমাকে জানাও।"

সানভি চমকাল না। দিনে তিন-চারবার নিয়ম করে এই লাইনগুলো শোনে সে। তাই স্বাভাবিকভাবেই নুরের খোঁজ করল সে।

আশমিনের গ্রেফতারের বিষয়টা তাদের ভাইবোনের ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে মেসেজ করে জানিয়ে দিয়েছে আশিয়ান। এছাড়াও আরও কয়েকটা নিউজ চ্যানেলেও জানিয়েছে সে। বহুদিন পরে চৌধুরীদের বাগে পেয়েছে। এবার ভালো মতো খাতির-যত্ন করবে ভেবেই বাঁকা হাসল আশিয়ান।

তখন বাসায় নুরের সাথে রাগ করে বাগানে চলে এসেছে আশমিন। সাবার মৃত্যুতে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে তার। মৃত্যুর কারণ আন্দাজ করতে পারছে সে। মিজু সিদ্দিক অত্যন্ত চতুরতার সাথে কদম ফেলছেন। হাতের নাগালে থেকেও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। রাগে মাথার রগ দপদপ করছে আশমিনের। আশমিনের কিছুটা দূরে সানভি দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসায় চলে যাবে সে। আশমিনের মুখভঙ্গি দেখে আর কিছু বলার সাহস পেল না। চুপচাপ মলিন মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

আমজাদ চৌধুরী আশমিনের পাশে এসে বসেছেন। বাবাকে দেখে মুখ আরও গম্ভীর করে ফেলল আশমিন। আমজাদ চৌধুরী চিন্তিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "খুনের বিষয়ে কিছু জানতে পারলে?"

"আলি খোঁজ নিচ্ছে।"

"সে না-হয় বুঝলাম। তুমি ওখানে কী করতে গিয়েছিলে, বলো তো?"

"লাশের সাথে হানিমুন করতে।"

আমজাদ চৌধুরী বিরক্ত হলেন। ছেলের খামখেয়ালি জবাবে চটে গিয়ে বললেন, "অসভ্যের মতো কথা বলো না। কী কাজে গিয়েছিলে, সেটা বলো?"

আশমিন থমথমে চোখে বাবার দিকে তাকাল। বউ তাকে পাত্তা দিচ্ছে না। এ দেশের একজন স্বনামধন্য মন্ত্রীকে হেলাফেলা করছে। আর তার বাবা কি-না এসে তাকে অসভ্য বলছে! আশমিন চটে গেল। ফোঁস করে বলল, "আমি কি তোমাকে একবারও জিজ্ঞেস করেছি, তুমি শ্যামলপুর কেন গিয়েছিলে? বেছে বেছে তোমাকে আমার চাচা-শ্বশুরের প্রাক্তনকেই পছন্দ করতে হলো? দেশে কি মেয়ের অভাব পড়েছিল? ভবিষ্যৎ—পরিকল্পনা বলে কিছু নেই তোমার, আব্বু? তোমার অপরিকল্পিত প্রেমে পড়ার ফল তোমার একমাত্র ছেলেকে ভোগ করতে হচ্ছে। এ জীবনে আর দাদা ডাক শুনতে হবে না তোমার। তোমার ছেলের জীবন-যৌবন রাস্তায় লুটোপুটি খেয়ে শেষ হবে। চৌধুরী বংশের প্রদীপ তোমার জন্য পৃথিবীর মুখ দেখবে না। এর জন্য একমাত্র তুমি দায়ী।"

আমজাদ চৌধুরী হতভম্ব চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এখানে তাঁর দোষটা কোথায়, সেটাই তাঁর বোধগম্য নয়। বিয়ে তো তিনি আগে করেছেন। তিনি কীভাবে বুঝবেন, তাঁর ছেলে মায়ের প্রাক্তন দেবরের মেয়ের প্রেমে পড়বে? বিরক্তিতে নাকমুখ কুঁচকে ফেললেন তিনি। ছেলেকে দেখে মায়াও হলো খুব। এটা সত্যি যে, কামিনী চৌধুরীর অতীত আশমিনের জীবনে খুব বাজেভাবে প্রভাব ফেলেছে। নুরের সাথে আশমিনের সম্পর্ক আদায় কাঁচকলার মতো, তা বাড়ির ছোটো থেকে বড়ো সবারই জানা। সানভির মাথায় জট পেকে গেল। সে চিন্তিত মুখে আসল দোষী সনাক্ত করায় ব্যস্ত হলো। আপাতত তার আর কোনো কাজ নেই।

আশমিনের খোঁজে বাগানে এসেছিল নুর। এখানে এসে মৃত চাচার কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল সে। তার মানে আশমিন সব জানে! জেনেও সে নিজের মাকে বাঁচাতে চাইছে? ঘৃণায় গা গুলিয়ে উঠল তার। প্রচণ্ড আক্রোশ নিয়ে ভেতরে চলে গেল সে।

"দারোয়ান বদলাতে হবে, আব্বু। গ্রাম থেকে রহমতকে আসতে বলেছি। কাল থেকে প্রধান ফটকে ও থাকবে।"

আমজাদ চৌধুরী নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন। তার অভিজ্ঞ মস্তিষ্ক বলছে তাদের সামনে বিপদ। প্রত্যেকটা ব্যাপার নজরে রাখতে হবে।

তাদের কথার মাঝেই আলি এসেছে। ধপ করে আশমিনের পাশের চেয়ারে বসল সে। সচেতন চোখে আশমিনকে পরখ করে বলল, "বৃষ্টি আসছিল নাকি? কই, আমি তো দেখলাম না।"

আশমিন ভ্রু কুঁচকে তাকাল। আলি আমতা আমতা করে বলল, "না মানে, এমন ভিজে আছিস তাই বললাম।"

"বাজে না বকে যে কাজে পাঠিয়েছি তার আপডেট বল।"

"আপডেট আর কী? কেউ কিছু বলতে পারছে না। অথবা ইচ্ছে করেই মুখ খুলছে না। কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।"

তাদের কথার মাঝেই একজন গার্ড ছুটে এসে বলল, "স্যার, গেইটের বাইরে প্রেসের লোক জড়ো হয়ে গেছে। আপনার সাথে কথা বলতে চাইছে।"

"এদিকটা আমি দেখছি। তুই আর আংকেল ভেতরে যা।"

আশমিন সায় জানাল। অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা সানভিকে বলল, "আলির সাথে যাও, সান। এ ব্যাপারটা শেষ হলে ভেতরে এসো। একসাথে ডিনার করব।"

সানভি দ্রুত পায়ে আলির পিছু ছুটল। আমজাদ চৌধুরী আফসোস করে বললেন, "এসব কী হচ্ছে আমাদের সাথে? এর আগেও একবার মেয়ে ঘটিত বিষয়ে বদনাম হতে হয়েছে। এখন আবার সেই একই ঘটনা। সারাজীবন মানুষের সম্মান পেয়ে এসেছি। শেষ বয়সে এসে এসব দেখতে হচ্ছে!"

আশমিন সোজা হয়ে বসল। গম্ভীর চোখে আমজাদ চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বলল, "সেটা তো সুন্দরী মেয়ে নিয়ে হোটেল রুমে যাওয়ার আগে ভাবা উচিত ছিল। এখন এমন নাদান বাচ্চা সেজে কী প্রমাণ করতে চাইছ? তুমি ভালো ছেলে? তোমার এই কপটতা জনগণ মানবে কেন? তাও যদি এক্সাইটেড কিছু করতে। সুন্দরী রমণী সামনে রেখে কেমন ভোস ভোস করে ঘুমাচ্ছিলে! ভাবতেই আমার নাক কাটা যাচ্ছে। তুমি জানো, কত মানুষ তোমার ছবির নিচে মন্তব্য করেছে, আমজাদ সাহেবের বয়স হয়ে গেছে। এখন আর যৌবনের তেজ নেই। কয়েকজন তো এও লিখেছে, বুড়ো বয়সে কচি মুরগি খেতে গিয়ে আংকেল নেতিয়ে পড়েছেন।"

আমজাদ চৌধুরী আর শুনতে পারলেন না। কানে হাত রেখে চ্যাঁচিয়ে উঠলেন, "চুপ করো, বেয়াদব ছেলে! আরেকটা কথা বললে এক থাপ্পড়ে তোমার দাঁত ফেলে দেবো। বাবা হই তোমার! বাবার সামনে এমন বেহায়া কথা বলতে লজ্জা করছে না?"

"লজ্জা করবে কেন? কথাগুলো তো আর আমি বলিনি। জনগণ বলেছে। আমি শুধু হুবুহু কপি করে তোমকে বললাম।"

আমজাদ চৌধুরী হতাশ হলেন। ছেলের টিপ্পনীতে অতিষ্ট হয়ে হনহন করে ভেতরে চলে গেলেন তিনি। আশমিনের এখন একটু ভালো লাগছে। একা একা মেজাজ খারাপ করতে ভালো লাগছিল না তার। তাই বাবার মেজাজ খারাপ করে ব্যাপারটা ব্যালেন্স করার চেষ্টা করল সে। প্রধান ফটকে উপচে পড়া ভিড়ের দিকে এক পলক তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। ভেতরে গিয়ে চেইঞ্জ করতে হবে। নুরের সাথে এই অশান্তি আর ভালো লাগছে না তার। তপ্ত শ্বাস ছেড়ে ধীর পায়ে বাসার দিকে গেল সে।

আমজাদ চৌধুরী নিজের রুমে ফিরে দেখলেন কামিনী চৌধুরী বিছানায় শুয়ে আছেন। আভিজাত্যপূর্ণ চেহারায় মলিনতার ছাপ স্পষ্ট। আমজাদ চৌধুরীর ভেতর থেকে দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে এলো। হাতঘড়ি খুলে বেডসাইড টেবিলে রাখলেন তিনি। বিছানার এক পাশে বসে ধীর গলায় বললেন, "এই অসময়ে শুয়ে আছ যে? শরীর ঠিক আছে তো?"

কামিনী চৌধুরী জবাব দিলেন না। আগের মতোই নীরব রইলেন। আমজাদ চৌধুরী তাঁর মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে নরম গলায় বললেন, "তুমি ছেলের সাথে অন্যায় করেছ, কামিনী। মিজুর কথা শুনে এমন ঘৃণ্য কাজ করা উচিত হয়নি তোমার। দেখছ তো, কষ্টটা কিন্তু তোমারই হচ্ছে। তারা তো এখন তোমার খোঁজটুকুও নেয় না। আসলে লোভী মানুষ নিজের স্বার্থ হিসেব করে চলে। ওরাও ব্যতিক্রম নয়। এখন তোমাকে দিয়ে তাদের স্বার্থ উদ্ধার হচ্ছে না বলে কেটে পড়েছে।"

কামিনী চৌধুরী উঠে বসলেন। স্বামীর দিকে তাকিয়ে তেজি গলায় বলল, "ওদের দোষ দিচ্ছেন কেন? সব হয়েছে ওই শিকদারের মেয়ের জন্য। আমার জীবনটা আরও একবার তছনছ করে দিলো এই কালনাগিনি। ছেলের কানে মন্ত্রণা দিয়ে আমার ছেলেকে আমার থেকে দূরে সরিয়েছে। সব বুঝি আমি। রক্ত বলেও একটা কথা আছে। শিকদারদের রক্তে বিষ আছে। যেখানে যাবে সেখানকার সব কিছু তছনছ করে তবেই দম নেবে।"

স্ত্রীর ক্ষোভ দেখে অবাক হলেন না আমজাদ চৌধুরী। এই ক্ষোভ একদিনের নয়। চোখের সামনে নিজের পরিবারকে ছন্নছাড়া হতে দেখে হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে তাঁর।

"অযথা অন্যকে দোষ দিয়ো না, কামিনী। তোমার ভাই আর তার পরিবার কেমন তা তুমি নিজেও ভালো করে জানো। তোমার কথাতেই বিজনেসে ওকে শেয়ারহোল্ডার করেছিলাম। তোমার প্রশ্রয়ে ও এ বাড়িতে আসন গেঁড়ে বসেছে। তা না হলে ওর মতো নরকের কীটকে আমার বাড়িতে

কখনোই ঢুকতে দিতাম না। শিকদার-বাড়ির ওপর তোমার রাগ-ক্ষোভ পুরোটাই বুঝি আমি, কিন্তু যার ওপর রাগ ছিল সে তো আর এই পৃথিবীতে নেই। তাহলে এই রাগের কারণটা কী? তুমি কি তোমার জীবনে সুখী নও? আমি কি তোমাকে সুখী করতে পারিনি? উত্তর দাও।"

কামিনী চৌধুরী থমথমে মুখে চুপ করে বসে রইলেন। আমজাদ চৌধুরী ক্লান্ত গলায় বললেন, "তোমার ভেতরের ক্ষোভ তুমি পুষে রেখেছ, কামিনী। মানুষের কথায় প্ররোচিত হয়ে নিজের পরিবারকে ধ্বংস করছ। একবার ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখো। নুরের জায়গায় নিজেকে রেখে তারপর বিচার করো। সবটা সহজ হয়ে যাবে।"

কামিনী চৌধুরী গম্ভীর হয়ে রইলেন। আমজাদ চৌধুরী আর কথা বাড়ালেন না। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন রুম থেকে। পারিবারিক দ্বন্দে নেতিয়ে পড়েছেন তিনি। এবার একটু স্বস্তি চান।

আশমিন রুমে গিয়ে দেখল নুর ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে মার্ডার কেসের আসামি বানিয়ে এই মেয়ে শান্তির ঘুম দিচ্ছে! এই না হলে তার বউ! আশমিন চশমার ফাঁকে সচেতন চোখে তাকাল। বেহায়া মন আবারও কেমন কেমন করছে! মনকে কড়া চোখে শাসাল সে। লজ্জা থাকলে আর বউয়ের দিকে প্রেম প্রেম চোখে তাকাবে না কখনো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফ্রেশ হতে চলে গেল সে।

নুর জেগেই ছিল। আশমিনকে দেখে ঘুমের ভান করে ছিল। আশমিন ওয়াশরুমে যেতেই চোখ খুলে তাকাল সে। চোখ দুটো রক্তজবার মতো লাল হয়ে আছে তার। বাবার মৃতদেহ শুকনো চোখে বিদায় দেওয়া মেয়েটা আজ নিজের অশ্রু আটকে রাখতে পারেনি। ভালোবাসার মানুষের দ্বারা ঠকে নিজেকে সামলাতে পারেনি সে। সবকিছু জেনেও চুপ থাকার শাস্তি আশমিনকে পেতে হবে। এতে তার মৃত্যু হলেও পিছপা হবে না। প্রাণের বদলে প্রাণই দিতে হবে। হারানোর যন্ত্রণা আশমিনকেও সহ্য করতে হবে। বিছানা থেকে নেমে কাবার্ড খুলল নুর। ড্রয়ার খুলে আশমিনের লাইসেন্স করা রিভলবারটা হাতে নিল সে। চোখমুখ শক্ত করে রিভলবার বালিশের নিচে রেখে আগের মতো শুয়ে পড়ল।

গোসল সেরে বেরিয়ে ভ্রু কুঁচকে ফেলল আশমিন। তার কাবার্ডের একটা পাট খোলা। সন্দিহান চোখে নুরকে দেখে সেদিকে এগিয়ে গেল সে। প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো চেক করতে গিয়ে নিজের রিভলবার না দেখে কপালে

সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ল তার। বউ আবার তাকে মেরে দেওয়ার নীল নকশা করেছে না তো? ভেজা চুল মুছতে মুছতে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল সে। উঁকি দিয়ে নুরের গতিবিধি লক্ষ করে এসির পাওয়ার কমিয়ে দিয়ে বারান্দায় চলে গেল।

রুমের তাপমাত্রা আচানক কমে যাওয়ায় কপাল কুঁচকে গেল নুরের। বিছানা হাতড়ে কমফোর্টারটা টেনে গায়ে জড়িয়ে নিতেই আশমিন এসে সেখানে ঢুকে পড়ল। আতর্কিত ঘটনায় হচকচিয়ে গেল নুর। কয়েক মুহূর্ত লাগল বিষয়টা বুঝতে। ঘটনা আঁচ করতে পেরে শরীর অবশ হয়ে এলো তার। আশমিন নিজের করা প্রতিজ্ঞা ভুলে মুহূর্তেই নিজেকে নির্লজ্জ প্রমাণ করে নুরের গায়ের সাথে লেপটে গেল। হালকা চিৎকার দিয়ে ছিটকে গেল নুর।

"কী হলো!"

কটমট করে তাকিয়ে রইল নুর। আশমিন কিছু না জানার ভান করে বলল, "এভাবে দূরে সরে গেলে কেন, বউ? বরের স্পর্শ পছন্দ হয়নি বুঝি?"

নুর চিৎকার করে উঠল, "চুপ করুন, অসভ্য মন্ত্রী! একটা মেয়ের সাথে নোংরামি করতে বিবেকে বাধল না আপনার? এভাবে উলঙ্গ হয়ে, ছি ছি ছি! ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে আমার।"

আশমিন হতভম্ব হয়ে গেল। ঝটপট উঠে বসল সে। নিজের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত গলায় বলল, "কী বলছ, বউ? এসব অশ্লীলতার ভয়ে আমি এখন পর্যন্ত নিজের আপন বউকে পর্যন্ত ওসব করিনি। আর তুমি আমার গায়ে এই ভয়ংকর অপবাদ দিচ্ছ! জনগণ কিন্তু মেনে নেবে না।"

নুর তেড়ে এলো। আশমিনের দিকে আঙুল তুলে কটমট করে বলল, "একদম কথা প্যাঁচাবেন না। এটা কী পরে আছেন আপনি? এ রুমে যে একটা মেয়েও থাকে সে খেয়াল আছে আপনার? এভাবে টাওয়াল পরে মেয়েদের সাথে ঘষাঘষি করতে ভালো লাগে আপনার?"

রাগে লাল হয়ে যাওয়া নুরের দিকে শান্ত চোখে তাকিয়ে রইল আশমিন। কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা নুরের কাছে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে বিছানায় ফেলল তাকে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় নুর কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার ওষ্ঠ আশমিনের দখলে চলে গেল। ছোটার জন্য ছটফট করতে থাকা নুরের ছোটো দেহটা মুহূর্তেই নিজের মাঝে আবৃত করে নিয়েছে আশমিন। সারা শরীরে নিজের রাজত্ব চালিয়ে নিজের কর্তৃত্ব জাহির করতে ব্যস্ত আশমিন। সহ্য করতে না পেরে ফুঁপিয়ে উঠল নুর। সাথে সাথেই তাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আশমিন।

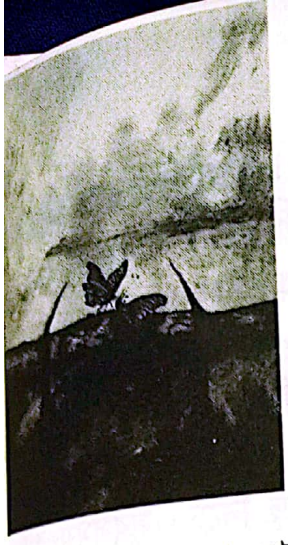
বিধ্বস্ত নুরের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল, "আবার চ্যাঁচামেচি করলে পরেরবার ডাবল হবে।"

নুর রেগে বালিশ ছুড়ে মারল। আশমিন এক হাতে ধরে দাঁত বের করে হাসল। হাসতে হাসতে ড্রেসিংরুমে চলে গেল সে। শরীরের বিভিন্ন স্থানে জ্বালা করছে নুরের। রাগে কষ্টে দিশেহারা লাগছে নিজেকে। কোনো একদিন সে এই বর্বর মন্ত্রীকে খুন করে নিজ দায়িত্বে জেলে চলে যাবে। বালিশের নিচ থেকে যন্ত্রটা নিয়ে কি এখনই একটা গুলি করে দেবে? নাকি কাপড় পরা অবধি অপেক্ষা করবে?

FREE PDF PETE FOLLOW TELEGRAM, CLICK KORUN

@ebook_bangla_robinhood

CamScanner



সকাল সকাল বাসা থেকে বেরিয়ে গেছে নুর। আশমিন তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। নুরের সাথে তার ব্যক্তিগত গার্ড যেতে চাইলে অসম্মতি জানাল সে। গাড়ি নিয়ে একাই বেরিয়ে পড়ল গন্তব্যে। ঘুম থেকে ওঠার পর সবটা জানতে পেরে নীরব রইল আশমিন। নুরকে নজরে নজরে রাখতে নির্দেশ করল সানভিকে। কালকের ঘটনার পর আর কোনো রিস্ক নেওয়া যাবে না। রেডি হয়ে নিচে নেমে কপাল কুঁচকে গেল তার। প্রতিদিন কামিনী চৌধুরী তার জন্য নাশতা নিয়ে অপেক্ষা করেন। আজ ব্যতিক্রম দেখে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল তার। মায়ের জন্য মন খানিকটা উতলা হয়ে উঠল। কিচেনে কাজ করতে থাকা ফুলিকে ডেকে বলল, "আম্মু কোথায়, ফুলি?"

"বড়ো ম্যাডাম তো ইকটু আগেই বাইর হইল। অনেক তাড়াহুড়া কইরা গেল দেকলাম।"

আশমিনের কপালের ভাঁজ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে দ্রুত ফোন করল সানভিকে, "নুর কোথায়, সান?"

সানভি চিন্তিত গলায় বলল, "এখনো ট্রেস করতে পারিনি, স্যার। ম্যামের ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করে আপনাকে জানাচ্ছি।"

স্বভাবের বাইরে গিয়ে চ্যাঁচিয়ে উঠল আশমিন। চিৎকার করে বলল, "নুর কোথায় এক্ষুনি আমাকে জানাও, সান। এক্ষুনি মানে এক্ষুনি।"

সানভি ভড়কে গেল। ভীত গলায় "জি স্যার" বলে কল কাটল সে।

"বাহাদুর।"

আশিমিনের চিৎকারে কয়েক সেকেন্ডের মাথায় বাহাদুর হাজির হলো। আমজাদ চৌধুরীও নিজের রুম থেকে ছুটে এসেছেন। ছেলের লাল হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে চিন্তিত গলায় বললেন, "কী হয়েছে? তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?"

আশমিন উত্তর দিলো না। বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে কঠোর গলায় বলল, "আম্মুর সাথে কে আছে? তাকে কল করে লোকেশন জানো।"

বাহাদুর ভীতু চোখে তাকাল আশমিনের দিকে। মাথা নিচু করে আমতা আমতা করে বলল, "ম্যাডাম তো কাউকে নিয়ে জাননি, স্যার।"

আশমিন ভয়ংকর রেগে গেল। সামনে থাকা অ্যান্টিক ফুলদানিটা ছুড়ে মারল ডাইনিং টেবিলে। মুহূর্তেই ভেঙে চুরমার হয়ে সমস্ত খাবার নিচে পড়ে গেল। আমজাদ চৌধুরী হতভম্ব ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বাহাদুর কয়েক পা পিছিয়ে গেল। আশমিনের চ্যাঁচামেচিতে ছুটে আসা গার্ডরা ভয়ে চুপসে গেছে। ফুলি দুহাতে কান চেপে বসে পড়েছে নিচে। সবসময় শান্ত থাকা আশমিনের এমন রূপ হজম হচ্ছে না কারোর। আশমিনের হুংকারে আরও একবার কেঁপে উঠল সবাই।

"এতগুলো গার্ড থাকতে বাড়ির দুজন মানুষ একা কীভাবে বেরিয়ে গেল? সারাদিন কী করো তোমরা? আজ যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে প্রত্যেকের জান নিয়ে নেব আমি।"

আমজাদ চৌধুরী ছুটে এলেন। রাগে কাঁপতে থাকা আশমিনকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বিচলিত গলায় বললেন, "শান্ত হও! এভাবে রেগে আছ কেন? কী হয়েছে একবার বলবে?"

আশমিন কিছু বলল না। চোখ বন্ধ করে নিজেকে শান্ত করতে চাইল সে। তৎক্ষণাৎ ফোন বেজে উঠল তার, "বলো সান, কোনো খবর পেলে?"

আশমিনের গলায় অস্থিরতা। সানভি নিজেও অস্থির হয়ে আছে, "স্যার, নুর ম্যাম উত্তরা আছেন।"

সানভি একটু থামল। কপালের ঘাম মুছে ভীত গলায় বলল, "বড়ো ম্যামকেও কিছুক্ষণ আগে সেখানে দেখা গেছে।"

আশমিন চোখ বুজে ফেলল। ফোন কান থেকে নামিয়ে ক্লান্ত চোখে তাকাল আমজাদ চৌধুরীর দিকে। আমজাদ চৌধুরী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আশমিন ক্লান্ত ভঙ্গিতে বাহাদুরকে বলল, "গাড়ি বের করো বাহাদুর।"

আমজাদ চৌধুরী অস্থির গলায় বললেন, "আরে কী হয়েছে একবার বলবে তো! আমার টেনশন হচ্ছে আশমিন। কারোর কোনো ক্ষতি হয়নি তো? তোমার আম্মু কোথায়? আর নুর? সে কোথায়? সবাই ঠিক আছে তো?"

এতগুলো প্রশ্ন একসাথে করায় আশমিন বিরক্ত হলো। চশমা খুলে রাগী গলায় বলল, "আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? নিজের বউয়ের খোঁজ আরেকজনের কাছে চাইতে লজ্জা করছে না তোমার? কেয়ারলেস হাসবেন্ড একটা! নাকি সুন্দরী মেয়ে পেয়ে এখন আর আমার আম্মুকে ভালো লাগছে না? এমন কিছু যদি হয় তাহলে আমি তোমার নামে প্রতারণার মামলা করব।

তোমার নিভু নিভু যৌবন তখন জেলের কুঠরিতে হাবুডুবু খেয়ে পরপারে পাড়ি দেবে। নানার মেয়েজামাই হিসেবে আমি তোমাকে রিজেক্ট করছি। তুমি ক্যান্ডিডেট হিসেবে যোগ্য নও।"

আশমিন আরও কিছু বলত। গাড়ি রেডি হওয়ায় আর কিছু বলতে পারল না সে। বাবার দিকে নাক উঁচু করে তাকিয়ে হনহন করে বেরিয়ে গেল সে। এতগুলো স্টাফের সামনে ছেলের কাছে রিজেক্ট হয়ে আহত হলেন আমজাদ চৌধুরী। ছেলের অহেতুক রাগের কারণ বুঝতে অপারগ তিনি। ফ্যালফ্যাল করে ছেলের চলে যাওয়া দেখলেন।

একটা পুরোনো বিল্ডিংয়ের সামনে গাড়ি থামল আশমিনের। সামনের সিটে যথারীতি সানভি আর আলি বসে আছে। আশমিন বিল্ডিংয়ে সতর্ক চোখ বুলিয়ে থমথমে গলায় বলল, "ভেতরের পরিস্থিতি কী? আম্মু বা নুর, কারোর কিছু হয়নি তো?"

সানভি হাসিহাসি মুখ করে বলল, "না, স্যার। দুজনেই ঠিক আছেন। আমাদের লোক পুরো বিল্ডিং ঘিরে রেখেছে। তবে দুজন যে রুমে আছে সেখানকার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।"

আশমিন শান্ত চোখে সানভিকে দেখল। আলি কপাল চাপড়াল। এই ছেলের কপালে আজ দুঃখ আছে নিশ্চিত! থমথমে পরিবেশ ভারি করে ফোন বেজে উঠল সানভির। স্ক্রিনে সাবানা নামের সাথে হার্টশেপ দেখে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল আশমিনের। কটমট করে তাকিয়ে রইল সানভির দিকে। সানভি ভীত চোখে এক পলক আশমিনকে দেখে দ্রুত কল কাটল। পরিস্থিতি হালকা করতে আলি বলল, "এবার ভেতরে যাওয়া যাক?"

আশমিন সায় জানিয়ে মাস্ক পরল। গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, "এই ব্যাপারটা ঠিকঠাক শেষ হোক, এই সাবানার আলমগিরকে আমি নিজ দায়িত্বে আর্কটিক রেখে আসব।"

সানভি চুপসে গেল। আশমিন তার ওপর রেগে আছে তা স্পষ্ট, কিন্তু তার অপরাধটা কী?

জীর্ণশীর্ণ হয়ে থাকা বিল্ডিংয়ে ঢুকে মাথা ধরে গেল আলির। চারিদিকে ভ্যাপসা গন্ধে দম আটকে আসছে তার। আশমিন পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে ধুপধাপ পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। শেষের কামরায় পৌঁছতেই দাঁড়িয়ে পড়ল আশমিন। সাথে থাকা বাহাদুর ইশারায় বোঝাল এখানে আছে তারা। দরজায় হালকা ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। পুরোনো চেয়ারের সাথে বাঁধা কামিনী

চৌধুরীকে দেখে বিরক্ত গলায় বলল, "এই চেয়ার এখানে ফেলে যাওয়ার মানে কী? নিজের জিনিস কেউ এভাবে ফেলে যায়? ইরেস্পন্সিবল পিপলস!"

কামিনী চৌধুরীর মুখ বাঁধা। মায়ের এমন হাল দেখে রাগ হলো আশমিনের। নিজেকে শান্ত রেখে ভেতরে ঢুকল সে। সামনে রিভলবার হাতে দাঁড়িয়ে থাকা নুরকে এক পলক দেখে শান্ত গলায় বলল, "আম্মুকে ছেড়ে দাও, নুর। তুমি অনেক বড়ো ভুল করতে যাচ্ছ।"

নুর হাসল। রিভলবারের আগা দিয়ে কপাল চুলকে অশ্রুসিক্ত চোখে মুচকি হেসে বলল, "আমি খুশি মনে এই ভুলটা করতে চাই, মন্ত্রী সাহেব। আমি বুঝে গেছি। আপনি কখনোই আপনার মায়ের অন্যায়ের শাস্তি তাকে দেবেন না। সব জেনেও আপনি না জানার নাটক করে গেছেন সবসময়। নিজের এই খুনি মাকে বাঁচাতে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন। আমি জানি, আমার নিরপরাধ বাবার মৃত্যুতে আপনাদের কিছু যায় আসে না। এতে আপনাদের তো কোনো ক্ষতি হয়নি। যা হারানোর আমার পরিবার হারিয়েছে। একবার ভাবুন তো মন্ত্রী সাহেব, আপনার অপরাধী মাকে বাঁচাতে আপনি যদি এত মরিয়া হয়ে থাকেন, তাহলে আমি আমার নিরপরাধ বাবা আর চাচ্চুর খুনিকে নিজ হাতে শাস্তি দিতে কতটা মরিয়া হয়ে আছি!"

আশমিন সাবধানে এক পা এগিয়ে গেল। ছটফট করতে থাকা কামিনী চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে অসহায় গলায় বলল, "আম্মু কিছু করেনি, নুর। প্লিজ আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি সব খোঁজ নিয়েছি। কয়েকদিনের মধ্যেই আসল অপরাধী তোমার সামনে থাকবে। রিভলবার হাত থেকে ফেলে দাও, নুর।"

কথার ছলে আশমিনকে এগিয়ে যেতে দেখে তার পায়ের কাছে গুলি করল নুর। আশমিন থমকে দাঁড়াল। পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা আলি আর সানভির দিকে চোখ বড়ো বড়ো তাকিয়ে বলল, "এই, আমার বউকে গুলি করা শিখিয়েছে কে?"

আলি অপরাধী ভঙ্গিতে এক হাত উঁচু করল। অফিসে একদিন খুব করে ধরে ছিল নুর। না শিখে ছাড়ছিলই না। সে কীভাবে জানবে যে, এই কাণ্ড ঘটাবে? আশমিন কটমট করে তাকাল। রাগে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "আলমগিরের সাথে তোকেও ফেলে আসব, বেইমান! একবার শুধু বউয়ের হাত থেকে বেঁচে ফিরি।"

সানভি মলিন মুখ করে আলির দিকে তাকাল। আলি সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "কোনো ব্যাপার না, সান। দুপুর আর রাতের রান্না তুমি করবে। সকালেরটা আমি সামলে নেব।"

সানভির দুঃখী মুখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল সে। এদিকে আশমিন নুরকে বোঝাতে ব্যস্ত। সবার হাবভাব দেখে নিঃশব্দে হাসল নুর। সবার ধারণা নুর ফাঁকা আওয়াজে ভয় দেখাচ্ছে। রিভলবার কামিনী চৌধুরীর দিকে তাক করে হাসি মুখে বলল, "হ্যাভ আ গুড জার্নি টু হেল, মিসেস চৌধুরী!"

নুরের পরিকল্পনা বুঝতে পেরে দ্রুত কামিনী চৌধুরীর দিকে ছুটে গেল আশমিন। সাথে সাথেই গুলির আওয়াজে থমকে গেল সবাই। কামিনী চৌধুরীর দিকে তাক করা হাতটা হালকা কেঁপে উঠল। কামিনী চৌধুরী কান্না গোঙানির মতো বেরিয়ে আসছে। হাত খোলার জন্য পাগলের মতো ছটফট করেছেন তিনি। আশমিনের শুভ্র পাঞ্জাবি রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে ততক্ষণে। আলি আর সানভি দ্রুত পায়ে ছুটে এসেছে। আশমিন তখনো কামিনী চৌধুরীকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। গুলি পাঁজরের একটু নিচে লেগেছে। আলি দ্রুত এসে জাপটে ধরল আশমিনকে। হতভম্ব নুর এক দৃষ্টিতে আশমিনের দিকে তাকিয়ে রইল। আলি চিৎকার করে ডাকল, "বাহাদুর।"

ডাকের সাথে সাথেই বাহাদুর হাজির হয়েছে। রক্তাক্ত আশমিন ততক্ষণে জ্ঞান হারিয়েছে। বাহাদুর আর আলি দ্রুত তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে আলির দেওয়া ক্ষোভের দৃষ্টি ভেতর থেকে নাড়িয়ে দিলো নুরকে। সানভি দ্রুত হাতে কামিনী চৌধুরীর বাঁধন খুলে বাইরে ছুটেছে।

রাগে ক্ষোভে পাগল হয়ে যাওয়া কামিনী চৌধুরী তেড়ে গিয়ে নুরের গালে সজোরে চড় বসালেন। কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে বললেন, "আমার ছেলের যদি কিছু হয়, আমি নিজ হাতে তোদের সবাইকে জ্বালিয়ে দেবো। আজ তুইও প্রমাণ করে দিলি, শিকদারদের রক্তে বিষ আছে। যা মানুষের সুখ-শান্তি কেড়ে তাদের জীবন বিষাক্ত করে দেয়।"

নুরের সাথে কথা বাড়িয়ে সময় নষ্ট করলেন না তিনি। ঘৃণার চোখে এক পলক দেখে দৌড়ে ছুটে গেলেন অচেতন ছেলের পিছু পিছু। স্তব্ধ নুর হাতের রিভলবারটা ফেলে দিলো। হাঁটু ভেঙে বসে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। এই মুহূর্তে নিজেকে শেষ করে দিতে ইচ্ছে হলো তার। নুরের গার্ড অনেক আগেই কল করেছিল অমিকে। অমি পৌঁছতে পৌঁছতে যা ঘটার ঘটে গেছে। ময়লা মেঝেতে বিধ্বস্ত নুরকে দেখে বুকের সাথে আগলে নিল তাকে। মাথায় হাত বুলিয়ে অস্থির গলায় বলল, "কিচ্ছু হবে না। ভাইয়া আছি তো। চল এখান থেকে। আমাদের হসপিটালে যেতে হবে।"

নুর উঠল না। আগের মতো ঠায় বসে রইল। অমি দুহাতে টেনে দাঁড় করাল তাকে। এক হাতে আগলে ধরে ধীর পায়ে বেরিয়ে এলো তারা।



হসপিটালে আনার সাথে সাথেই ট্রিটমেন্ট শুরু হয়ে গেছে আশমিনের। অপারেশন থিয়েটারের সামনে বসে বিলাপ করে কাঁদছেন কামিনী চৌধুরী। পুরো করিডোরে উপচে পড়া ভিড়। হাসপাতালের বাইরে প্রেসের লোক গিজগিজ করছে। একের পর এক ব্রেকিং নিউজ টেলিকাস্ট হচ্ছে। গতকাল বিখ্যাত মডেল সাবা খানের খুনের পর আজ মিনিস্টার আশমিন জায়িন চৌধুরীর ওপর হামলা—চারদিকে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। এর মধ্যেই সাবার অন্তরঙ্গ ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। কাল পর্যন্ত যারা আশমিনকে খুনির তকমা লাগিয়েছিল আজ তারাই আশমিনের গুণগান গাইছে। পুরো হাসপাতাল র‍্যাবের দখলে। কেউ এদিক ঘেঁষতে পারছে না।

আমজাদ চৌধুরী সমানে পায়চারি করে যাচ্ছেন। প্রিয় বন্ধুর বিপদে আট মাসের উঁচু পেট নিয়ে মৌরিও ছুটে এসেছে। কামিনী চৌধুরীকে সামলাচ্ছে সে। সানভি আর আলি এক মুহূর্তও বসার সময় পায়নি। মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব থেকে শুরু করে সহকারী সচিব, সবাই ছুটে এসেছেন। আমজাদ চৌধুরী তাদের সাথে কথা বলছেন।

আলি মৌরিকে এক পাশে ডেকে বলল, "আন্টিকে পাশের কেবিনে নিয়ে যাও। এখানে থাকলে কখন কী বলবে তার ঠিক নেই। নুরের নাম আসলে অনেক ঝামেলা হয়ে যাবে।"

মৌরি সম্মতি দিলো। কামিনী চৌধুরীকে কেবিনে নিয়ে গেল সে। বহু বছর রাজনৈতিক পরিবারে থাকার সুবাদে এই বিষয়গুলো ভালো করেই বোঝে সে। তাই কথা বাড়ায়নি। তবে নুরের মুখোমুখি সে হবে। শুধু আশমিনের সুস্থ হওয়ার অপেক্ষা। কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে লাগল সে।

পিবিআই প্রধান রিয়াদ হোসেন আমজাদ চৌধুরীকে ভরসা দিয়ে বলল, "আপনি চিন্তা করবেন না, স্যার। আসল অপরাধীকে আমরা খুব শীঘ্রই খুঁজে বের করব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

আমজাদ চৌধুরী চুপ রইলেন। শান্ত চোখে তাকালেন রিয়াদ হোসেনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আশিয়ানের দিকে। আশিয়ান চোখ নামিয়ে নিল। আমজাদ চৌধুরী সেদিনের মতো আশিয়ানের কাঁধে হাত রাখলেন। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললেন, "আমার সম্মানে যেন এক চিমটিও আঘাত না লাগে। আমার সম্মান কে, তা বোঝাতে হবে না নিশ্চয়ই?"

আশিয়ান মাথা নিচু করে ঘাড় নাড়ল। অমির কাছ থেকে সব শুনেছে সে। এত কিছুর পরও তারা নুরকে বাঁচাতে চাইছে দেখে অবাক হচ্ছে আশিয়ান। যদি সত্যিই তারা তাদের ক্ষতি চাইত তাহলে এটাই তাদের মোক্ষম সুযোগ ছিল। ক্ষমতা আর আইন তাদের হাতে। চাইলেই নুরকে চরম শাস্তি দিতে পারত। অথচ তারা আশমিনের কথা না ভেবে নুরের কথা ভাবছে। আশমিনের লোকেরা আসল ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ায় ব্যস্ত। তাহলে কি এতদিন তারা ভুল বুঝে আসছে? এলোমেলো চিন্তায় মাথা ধরে যাচ্ছে আশিয়ানের।

আশমিনের অপারেশন সাকসেসফুলি সম্পন্ন হয়েছে। কয়েক ঘণ্টা অবজারভেশনে রেখে তাকে কেবিনে শিফট করা হবে। মিজু সিদ্দিক হাসপাতালে রয়ে-সয়ে এসেছেন। তার সাথে সুমা সিদ্দিক আর লিনাও আছে। এতদিন পর তাদের দেখে আবেগী হলেন কামিনী চৌধুরী। সুমা সিদ্দিক সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে গেলেন। কামিনী চৌধুরীকে জড়িয়ে ধরে ন্যাকা কান্না করে বললেন, "কাঁদবেন না, আপা। আমি তো আগেই বলেছিলাম, ওই রাক্ষসী আমাদের ছেলেকে খেয়েই দম ফেলবে। মিলল তো আমার কথা?"

কামিনী চৌধুরীর পাশে বসে থাকা মৌরি বিরক্ত হলো। এই মহিলা তার সৎ-শাশুড়ি ভাবতেই গা গুলিয়ে উঠল তার। লিনা এসে মৌরির পাশে বসল। মৃচকি হেসে মৌরির উঁচু পেটে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিলো সে। বিনিময়ে মৌরিও হাসল। সুমা সিদ্দিক মৌরিকে দেখে নাট সিটকাল। চোখে মুখে বিতৃষ্ণা নিয়ে বলল, "এই মেয়ে, আমার মেয়ের কাছ থেকে সরে বসো। তোমাদের ছায়াও অলক্ষুনে।"

মৌরি হতভম্ব হয়ে গেল। অবাক গলায় বলল, "কী বলছেন আপনি? আমার জানা মতে আমি তো আপনার কোনো ক্ষতি করিনি।"

সুমা সিদ্দিক যেন এই অপেক্ষায়ই ছিলেন। ছেলের চিন্তায় বেহাল কামিনী চৌধুরীকে ছেড়ে মৌরির দিকে তেড়ে গেলেন। ফোঁসফোঁস করে বললেন, "তোমার কিছু করতে হবে কেন? যার গলায় ঝুলেছ সে কি কিছু কম করেছে? মায়ের মতো হাড় জ্বালানো শয়তান হয়েছে। ওই শয়তান মহিলা তো মরে

আমাদের মুক্তি দিয়েছে। রেখে গেছে তার ইবলিশ পেয়াদা। আমাদের শান্তি দেখলে তো সহ্য হয় না শয়তানটার। মায়ের সাথে এটাও যে কেন মরল না কে জানে। তাহলে সব ঝামেলা একেবারে চুকে যেত।"

মৌরি দাঁতে দাঁত চেপে ধারালো দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সুমা সিদ্দিকের দিকে। লিনা মায়ের ব্যবহারে লজ্জা পেল। আহত গলায় বলল, "আম্মু প্লিজ, সিনক্রিয়েট করো না। এই কথাগুলো বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না।"

সুমা সিদ্দিক ফুঁসে উঠলেন। মেয়েকে ধমকে বললেন, "তুমি চুপ করো। কতদিন বলেছি এসব মানুষের কাছ ঘেঁষবে না? কথা কানে যায় না? এখন তো আবার পেটে একটা আছে। এটাও ওই শয়তানের মতোই হবে। কালসাপ সব। সুযোগ পেলেই কামড়ে দেবে। ইচ্ছে করছে পেটেই মেরে ফেলি!"

এবার আর মৌরি সহ্য করতে পারল না। বাঘিনির ন্যায় গর্জে উঠল সে। আগুন চোখে সুমা সিদ্দিককে দেখে বলল, "আরেকটা বাজে কথা বললে আপনার চেহারার মানচিত্র বদলে দেবো, মহিলা! আপনার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি! নিজে দুশ্চরিত্র হয়ে আরেকজনের দিকে আঙুল তুলছেন কোন সাহসে? আমার স্বামী আর মরহুমা শাশুড়ির নামে আর একটা বাজে কথা বললে আপনার ওই নোংরা মুখ আমি ভেঙে দেবো। অসভ্য মহিলা! বিবাহিত লুচ্চা পুরুষের সাথে পরকীয়া করে তাকে বিয়ে করেছেন। এত বড়ো বড়ো কথা মুখ দিয়ে আসে কী করে? লজ্জা একেবারেই নেই, তাই না?"

অতিরিক্ত রাগে কাঁপছে মৌরি। সুমা সিদ্দিক তেড়ে যেতে নিলেই তাকে আটকে দিলেন কামিনী চৌধুরী। শক্ত গলায় বললেন, "এটা হসপিটাল, সুমা। এখানে এসে তোমার এমন ব্যবহার করা মোটেও উচিত হয়নি। যে নেই তাকে নিয়ে খারাপ মন্তব্য করে তুমি নিজেকে ভালো প্রমাণ করতে পারবে না।"

অতিরিক্ত উত্তেজিত হওয়ার কারণে দ্রুত নিঃশ্বাস নিচ্ছে মৌরি। কামিনী চৌধুরী তাকে শান্ত হতে অনুরোধ করে বললেন, "এখানে আর কোনো কথা বাড়িয়ো না, মৌরি। তোমার শরীরের অবস্থাটাও একবার চিন্তা করো। আমার ছেলেটা অসুস্থ। নিজেদের মধ্যে ঝামেলা না করে সবাই ওর জন্য দোয়া করো।"

সুমা সিদ্দিক আড়ালে মুখ বাঁকালেন। মনে মনে প্রার্থনা করলেন আজই যেন আশমিনের মৃত্যু হয়। মায়ের এমন কদর্য ব্যবহারে লজ্জায় কেবিনের বাইরে চলে গেছে লিনা। করিডোরে আলিকে দেখে নিজের ভেজা চোখ মুছে নিল সে। জীবনে প্রথমবারের মতো আলির সামনে দাঁড়িয়ে ধরা গলায় বলল,

"ভাবিকে এখান থেকে নিয়ে যাও, ভাইয়া। আম্মু তার জন্য বিপদজনক। কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারে।"

আলি ভ্রু কুঁচকে তাকাল। কৌতূহলী গলায় বলল, "কী বলতে চাইছ? কী করেছে ওই মহিলা?"

লিনা মাথা নিচু করে ফেলল। অপরাধী গলায় বলল, "এখানে থাকলে সে ভাবির ক্ষতি করবে। প্লিজ, ভাবিকে বাসায় পাঠিয়ে দাও, ভাইয়া।"

আলি শান্ত চোখে লিনার নিষ্পাপ সরল মুখের দিকে তাকাল। কড়া গলায় কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল সে। যাওয়ার আগে থমথমে গলায় বলল, "আমাকে ভাইয়া ডাকবে না। আমি তোমার ভাইয়া নই।"

লিনা আহত হলো খুব। অভিমানী চোখে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। আলির কথায় কষ্ট পেয়েছে সে।

আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে বিদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে সূর্য। চারদিকে তখন গোধূলির আলো-আঁধারের আবছায়া খেলা। অন্ধকার রুমের এক কোনায় দেওয়াল হেলান দিয়ে বসে আছে নুর। চোখের পানি শুকিয়ে আছে গালে। মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা কেশগুচ্ছ দিয়ে ডেকে আছে মুখাবয়ব। অন্ধকার ঘরে আলো জ্বলে উঠতেই চোখ তুলে তাকাল নুর। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মাকে দেখে অপরাধীর ন্যায় চোখ নামাল সে।

নাফিজা শিকদার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। ধীর পায়ে গিয়ে মেয়ের সামনে দাঁড়ালেন। এক হাতে টেনে দাঁড় করালেন তাকে। আজ বহুদিন বাদে মেয়ের মুখোমুখি তিনি। তাও এমন ভাঙাচোরা অবস্থায়।

"বাইরে এসো। কিছু কথা আজ পরিষ্কার হওয়া উচিত।"

"আমি হসপিটাল যাব।"

নাফিজা শিকদার রেগে গেলেন। মেয়ের গালে সজোরে চড় মেরে হিসহিসিয়ে বললেন, "আরেকবার এ কথা মুখে আনলে আমি তোমার মুখ ভেঙে ফেলব। লজ্জা করছে না এই কথা বলতে? কী করে পারলে এমন নিকৃষ্ট কাজটা করতে? এজন্যই আমি এ বিয়েতে মত দিইনি। আমি জানতাম এমন কিছুই ঘটবে। বহু বছর আগেও এভাবেই একজন শেষ হয়েছে। তুমি কি ভেবেছ, আমি কিছুই জানি না? তোমার চাচারা তোমার কানে কি বিষ ঢেলেছে তা জানি না ভেবেছ? সব খবরই আমার কানে এসেছে। আমি বুঝিয়ে ছিলাম আশমিনকে। বারবার বলেছিলাম তোমাকে সব জানাতে, কিন্তু ও সেটা করেনি। আমি ওর অপারগতা বুঝি। কোনো ছেলের জন্যই মায়ের প্রাক্তন নিয়ে কথা বলা স্বস্তিদায়ক নয়।"

তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বললেন, "এছাড়া ও আমাকে বলেছে, তুমি ওর কথা বিশ্বাস করবে না। আহ, কতটা অসহায়ই না লাগছিল তাকে!"

নুর ফুঁপিয়ে উঠল। নাফিজা শিকদার দমে গেলেন না। টেনে রুম থেকে বের করে আনলেন নুরকে। ড্রয়িংরুমে স্বয়ং কামিনী চৌধুরী বসা। তার চোখেমুখে এখন আর কোনো রাগ বা ক্ষোভ নেই। নুর অবাক হলো। বিস্মিত চোখে তাকাল মায়ের দিকে। কামিনী চৌধুরী শান্ত গলায় বললেন, "বসো। কিছু কথা বলতে এসেছি। তোমার মাও সামনে আছে। সত্য-মিথ্যা তার কাছ থেকেই না-হয় যাচাই করে নেবে।"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় নুর ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। নাফিজা শিকদার জোর করে তাকে বসিয়ে দিলেন। টেবিল থেকে পানির গ্লাস তুলে গলা ভেজালেন কামিনী চৌধুরী। নুরের দৃঢ় মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার বয়স যখন সবে ষোলো, তখন তোমার বড়ো চাচার সাথে আমার পরিচয়। খুব শান্তশিষ্ট নরম স্বভাবের মানুষ ছিলেন তিনি। আমাদের গ্রামে ব্যাবসার কাজে গিয়েছিলেন। আমাদের শ্যামলপুরে পাটের আবাদ খুব ভালো হয়। তাই সে সেখান থেকে কমদামে পাট কিনে নিয়ে আসতেন। কয়েকবার যাওয়া–আসার ফলস্বরূপ বাবার সাথে ভালো সম্পর্ক হয়ে যায় তাঁর। তখন সদ্যই আমার মা মারা গেছেন। মায়ের মৃত্যুতে বাবা তখন সংসার বিমুখ। দিশেহারা আমি বাবার ছোটো মুদি দোকানে বসতাম। সেখানেই তাঁর সাথে প্রথম দেখা। তাঁর সুন্দর ব্যবহার আর অমায়িক ব্যক্তিত্বের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম আমি। কিশোরী বয়সের প্রেম। তাঁকে ছাড়া কিছুই ভাবতে পারি না। তিনিও আমার মনের কথা বুঝলেন কম সময়ে। বাবার কাছে প্রস্তাব রাখলেন বিয়ের। বাবার তখন আমাকে নিয়ে এত কিছু ভাবার সময় নেই। একবাক্যে রাজি হয়ে গেলেন তিনি। খুব সাদামাটা ভাবে বিয়ে হলো আমাদের। সবকিছু যেন স্বপ্নের মতো হয়ে গেল! আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর স্বপ্ন। যে মানুষটাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আমার দিন কাটত, এক পলকেই যেন সৃষ্টিকর্তা তাঁকে আমার ঝুলিতে ঢেলে দিলেন। তিনিও আমাকে চোখে হারাতেন। রানির মতো সম্মান করতেন আমাকে। আমাদের সংসার ভালোই চলছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমাদের বিয়ের কথা তাঁর পরিবার জানে। পরিবারের সম্মতি নিয়েই তিনি বিয়ে করেছেন। তাই আমিও নিশ্চিন্ত ছিলাম; কিন্তু আমার সেই স্বস্তি বেশিদিন দীর্ঘস্থায়ী হলো না। তাণ্ডবের মতো উপস্থিত হলেন তোমার দাদি। কী কঠিন তাঁর ধারালো চাউনি! তোমার চাচা তখন মুন্সিগঞ্জ গেছেন। আমাকে দেখেই অবজ্ঞায় নাক সিটকালেন তোমার দাদি। লোক দেখানো আহাজারি করে পাড়ার মানুষ জড়ো করলেন তিনি। সবাইকে ধরে ধরে বললেন, আমি তাঁর ছেলেকে ফাঁসিয়েছি। তাঁর অমন রাজপুত্র ছেলেকে শরীর

দেখিয়ে বশ করেছি। তাঁর ছেলের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে বহু আগে থেকেই। পরের মাসে বিয়ে। তাই তিনি আর আমার সাথে সংসার করবেন না। তালাক দেবেন আমাকে। আমার মতো বাজারি মেয়ে মানুষ কখনোই শিকদার–বাড়ির বউ হতে পারে না। শিকদার–বাড়ির কাজের লোক হওয়ার যোগ্যতাও আমার নেই। দোকানে বসে শরীর দেখিয়ে ব্যাটাছেলেদের মাথা খারাপ করি। এছাড়া আরও কত কলঙ্ক সেদিন আমার গায়ে লেগেছে তার কোনো হিসেব নেই।"

এটুকু বলেই থামলেন তিনি। চোখ তুলে তাকালেন নুরের দিকে। নুর অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। কিছুই বিশ্বাস হচ্ছে না তার! কামিনী চৌধুরী টলটলে চোখে হাসলেন। শান্ত গলায় বললেন, "তোমার মা সামনেই আছে। জিজ্ঞেস করো, আমি কিছু মিথ্যা বলেছি কি-না?"

নুর মায়ের দিকে তাকাতেই তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কামিনী চৌধুরী দৃঢ় গলায় বললেন, "তোমার কাছে বানোয়াট গল্প বলে এখন আর কোনো লাভ নেই আমার। আমি শুধু নিজের মাথা থেকে মিথ্যা অপবাদ সরাতে এসেছি। এতগুলো বছর এই অপবাদ বয়ে আমি ক্লান্ত।"

কামিনী চৌধুরী আরেক ঢোক পানি খেলেন। আগের ন্যায় বললেন, "সেদিন তোমার দাদির অভিনয়ে আমার সাজানো সংসার, স্বপ্ন, সব তছনছ হয়ে গিয়েছিল। তোমার বাবা নতমুখী হয়ে মায়ের কাণ্ড দেখছিল শুধু। আমি সমস্ত শরীর ছেড়ে মাটিতে বসে শুধু ওই মহিলার নাটক দেখছিলাম। স্বামী নামক মানুষটার জন্য ঘৃণায় মন বিষিয়ে যাচ্ছিল। প্রতিবাদ করার ভাষা বা শক্তি কোনোটাই ছিল না আমার। তোমার বাবা অনেক বুঝিয়ে আমাদের বাড়ি থেকে নিয়ে আসে তোমার দাদিকে। আমার বিধ্বস্ত বাবা বোবার মতো সব শুনে গিয়েছেন। কোনো খোঁজ না নিয়ে মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার গ্লানিতে মুখের ভাষা হারিয়েছেন তিনি। তোমার বাবা আর দাদি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেই পাড়া-প্রতিবেশীর একের পর এক কটুবাক্য আমাদের বাপ-মেয়ের অন্তর ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। পুরো একটা দিন ঘরের দাওয়ায় বসে কাটিয়ে দিয়েছিলাম আমরা। চোখের পানি বাধ মানছিল না আমার। বারবার নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিলাম। এমন একজন মানুষকে ভালোবাসার অপরাধে নিজেকে শেষ করার পরিকল্পনা করার আগেই বাবার গোঙানির শব্দ কানে এলো। আমার বাবা মাটিতে শুয়ে বুকে হাত রেখে কাতরাচ্ছেন। ছুটে গিয়ে বাবাকে আগলে ধরতেই তাঁর মুখ বাঁকা হয়ে চোখ উলটে গেল। পাগলপ্রায় আমি ছুটে গিয়েছিলাম প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজনের কাছে। কেউ এগিয়ে আসেনি। সবাই বেশ্যা বলে ধুর ধুর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। সেদিন ফিরে এসে আর বাবাকে পাইনি। খালি বাড়িতে একা একাই দেহ ছেড়ে পাড়ি জমাতে হয়েছে তাঁকে। শক্ত মাটিতে আমার বাবা মরে পড়েছিলেন। আমি তাঁর পাশে ছিলাম না। এই

শোক কি এক জীবনে ভোলার মতো? শিকদার–বাড়ির প্রত্যেকটা মানুষকে ঘৃণা করার জন্য অন্য কোনো কারণ প্রয়োজন আছে কি?"

নুর হতভম্ব হয়ে বসে আছে। কামিনী চৌধুরী থামতেই সে থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল, "চাচ্চু কি পরে আর আপনার কাছে ফিরে যায়নি?"

"গিয়েছিলেন। তবে আমি আর তাঁকে নিজের জীবনে ফিরিয়ে নিইনি। ষোড়শী আমার মনে তখন তাঁর জন্য প্রচণ্ড ঘৃণা আর আক্রোশ। তিনি বারবার বোঝাতে চেয়েছেন, তিনি নির্দোষ। আমি শুনিনি। ফিরিয়ে দিয়েছি তাঁকে। তখন পাগলপাড়া হয়ে আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। নিজের বলা মিথ্যার জন্য অনুতপ্ত হয়েছেন, কিন্তু আমার মন গলেনি। সত্যি বলতে আমি তাঁকে আর আমার জীবনে চাইনি। তাঁর সাথে সংসার করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁকে দেখলেই বাবার মৃত মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠত। সিদ্ধান্ত নিলাম কিছুদিন নিজেকে লুকিয়ে রাখব। কাউকে কিছু না বলে রাতের অন্ধকারে পাশের জেলায় থাকা খালার কাছে চলে গেলাম। খালার বাসায় গিয়েও শান্তিতে ছিলাম না। খালাতো ভাইয়েরা সুযোগ পেলেই গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করত। তবুও মুখ বুজে পড়ে ছিলাম। তাদের বড়ো গৃহস্থ বাড়ি। কাজ করতে করতে শরীর ভেঙে আসত, কিন্তু কিছু করার ছিল না। কাজের বিনিময়েই তো খাবার জুটত। এভাবে এক মাস কেটে গেল। এর কয়েকদিন পরই খবর পেলাম তোমার চাচা আত্মহত্যা করেছেন। আমদের তখনো তালাক হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই আহত হলাম খুব। লোকটাকে তো ভালোবাসে ছিলাম! তাঁর মৃত্যুতে মুষড়ে পড়েছিলাম। সতেরোতে বিধবা হওয়া আমাকেই তোমার চাচার মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হলো! তোমার দাদি আর তোমার চাচারা মামলা করলেন আমার নামে। আমার শেষ আশ্রয় থেকে টেনে-হিঁচড়ে আমাকে থানায় নেওয়া হলো। এ পর্যন্তই থেমে থাকেননি তাঁরা। থানার ওসিকে দিয়ে আমার সম্মানহানীর চেষ্টা করতেও পিছ পা হননি তোমার চাচারা। সেদিন রাফসানের জন্যই আমি নিজের ইজ্জত বাঁচাতে পেরেছিলাম। সেই রাতেই সে আমাকে ওই অমানুষের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। তখন সে যুবক ছেলে। বিয়েশাদি করেনি। আমার হাতে একটা টাকার খাম তুলে দিয়ে আমাকে ঢাকার বাসে তুলে দেয়। পাঁচ বছর আমি ঢাকায় ছিলাম। আমজাদের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রিতা হয়ে ছিলাম। ওই বাড়ির কর্ত্রীর বৃদ্ধা মাকে দেখাশোনা করতাম। এরপর আমি শ্যামলপুর চলে গিয়েছিলাম। আমজাদ আমাকে সেখানেই প্রথম দেখে। আমি অবশ্য তাঁর কাছে কিছু লুকাইনি। আমজাদ সব জেনেই আমাকে বিয়ে করেছে। তখন অবশ্য সে তাঁর বাড়ি ঢাকায় বলেছিল। কারণ ওরা ঢাকায়ই থাকত। আমজাদের বাবা আমাদের বিয়েটা মন থেকে মানতে পারেনি। তবে

ছেলেকেও বাধা দেয়নি। আমাদের সংসার কোনো ঝামেলা ছাড়াই চলছিল। কিন্তু অতীত আমার পিছু ছাড়েনি। আমি আমজাদকে সব বললেও তোমার চাচার নাম-ঠিকানা কখনো বলিনি। সেও কখনো জানতে চায়নি, কিন্তু অতীত মেঘে ঢাকা সূর্যের মতো আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো। আমাকে দেখে তোমার চাচারা আমজাদকে নানাভাবে অপমান করেছে। পদে পদে হেনস্তা করেছে। আমজাদ সব জেনে মুষড়ে পড়েছিল। আমার সংসারে আবার ভাঙনের ঢেউ লাগল। তখন আশমিন আমার গর্ভে। একমাত্র সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে আমজাদ আমাকে ছাড়েনি।"

যন্ত্রের মতো কথাগুলো বলে থামলেন কামিনী চৌধুরী। নুর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। লম্বা শ্বাস টেনে কামিনী চৌধুরী আবার বললেন, "এবার বলো, আমি শিকদার-বাড়ির মানুষগুলোকে ঘৃণা করব না কেন? কেন চাইব, আমার একমাত্র ছেলের বউ শিকদার–বাড়ির মেয়ে হোক? আমি ঘৃণা করি তোমাদের। আমার জীবনটা তছনছ হওয়ার পিছনে একমাত্র শিকদাররা দায়ী। তাদের মেয়েকে আমার ঘরের বউ হিসেবে আমি কীভাবে মেনে নেব?"

"আমি আপনার ছেলেকে বিয়ে করতে চাইনি, মিসেস চৌধুরী। আমি একবারও তাকে বলিনি, আমি তাকে ভালোবাসি। তাহলে? আমার বাবাকে কেন মরতে হলো? এর উত্তর আছে আপনার কাছে?"

কামিনী চৌধুরী মলিন হাসলেন। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দৃঢ় গলায় বললেন, "আমার ইজ্জত বাঁচানো মানুষটার ওপর আমি তার পরিবারের ক্ষোভ ঝাড়তে পারি। দু-চারটা কটু কথাও বলতে পারি। তবে তাঁকে খুন করাতে পারি না। বিশ্বাস অবিশ্বাস পুরোটা তোমার কাছে। আসছি। আমার ছেলের কাছে যেতে হবে।"

কামিনী চৌধুরী স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে গেলেন। স্তব্ধ নুর থমথমে মুখে বসে রইল। নাফিজা শিকদার মেয়ের মুখভঙ্গি দেখে কড়া গলায় বললেন, "অনেক হয়েছে এই প্রতিশোধ প্রতিশোধ খেলা। নিজের মন-মর্জিমাফিক অনেক চালিয়েছ। এবার ক্ষান্ত দাও। আমি চাই না তুমি আর চৌধুরী-বাড়িতে ফিরে যাও।"

"আম্মু!"

"কী আম্মু? নিজের চাচাদের কথা শুনে সংসার সংসার খেলতে নেমে গেলে। জানো না প্রত্যেকটা গল্পের দুটো দিক থাকে? উনি এইমাত্র যা বলে গেছেন তার একবিন্দুও মিথ্যা নয়। তোমার দাদি আত্ম-অহংকারী মানুষ ছিলেন। মুদির দোকান চালানো মেয়েকে তিনি শিকদার-বাড়ির বউ হিসেবে

মানতে পারেননি। মৃত মানুষের নামে আর কিছু বলতে চাই না। যথেষ্ট বড়ো হয়েছ। আশা করি আমার কথাটা বুঝতে পারবে।"

নাফিজা শিকদারের শক্ত গলায় দমে গেল নুর। চোখের পানি মুছে ভাবল, আসলেই সে আশমিনের জন্য সঠিক নয়। আজ আশমিনকে গুলি করেছে সে। এ কেমন ভালোবাসা তার, যা শুধু ধ্বংস করতে জানে? নিজের চুল খামচে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল নুর। মায়ের কড়া আদেশে তাকে বাসায় নামিয়ে অমি সোজা হসপিটাল চলে গেছে। আশমিনের খোঁজ জানার জন্য অস্থির হয়ে আছে নুর, কিন্তু অমিকে কল করার সাহস পাচ্ছে না। নিজের অপরাধবোধ তাকে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে, সে অধিকার হারিয়েছে।

FREE PDF PETE FOLLOW TELEGRAM, CLICK KORUN



CamScanner



আশমিনের জ্ঞান ফিরেছে রাত আটটায়। জ্ঞান ফেরার পর পরই তাকে কেবিনে শিফট করা হয়েছে। একজন একজন করে দেখে যাচ্ছে তাকে। আমজাদ চৌধুরী ছেলের পাশে বসা। ছেলেকে চোখের সামনে দেখেই স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়েছেন তিনি। বুকের ভেতরের অস্থিরতা কমেছে একটু। একটু পরেই নার্স আর কাউকে ভেতরে এলাউ করল না। পরিবারের লোক ছাড়া আর সবার প্রবেশ নিষেধ। লুবানা আসার পর থেকেই আশমিনের মাথার পাশে বসে আছে। কেঁদে কেটে মুখের অবস্থা নাজেহাল। সানভি মলিন চোখে লুবানার দিকে তাকাতেই আশমিন কটমট করে চোখ রাঙাল। হতভম্ব সানভি সাথে সাথেই চোখ সরিয়ে নিয়েছে। তার আর এই জীবনে বিয়ের সাধ পূরণ হবে না সেটা পরিষ্কার। সারাজীবন প্রেমিকার ভাইয়ের আতঙ্কে থাকার চেয়ে সে নির্বাসনে যাবে সেই ভালো। আশমিন সুস্থ হলেই তল্পিতল্পা নিয়ে বেরিয়ে পড়বে সে। সিদ্ধান্ত ফাইনাল।

আমজাদ চৌধুরী আশমিনের মাথায় হাত বুলিয়ে নরম গলায় বললেন, "এখন কেমন লাগছে? শরীরে কেমন বোধ করছ?"

আশমিন থমথমে গলায় বলল, "বউয়ের হাতে গুলি খেয়ে খুব প্রফুল্ল বোধ করছি। খুশিতে কোমর দুলিয়ে নাচতে ইচ্ছে করছে। একটু পরে নাচব। চাইলে তুমিও জয়েন করতে পারো।"

আমজাদ চৌধুরী মুখ কুঁচকে ফেললেন। ছেলেকে ধমক দিতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন। লুবানা নাক টেনে বলল, "এভাবে বলছ কেন, ভাইয়া? চাচ্চু কত টেনশন করছিল, জানো।"

আলি আর সানভি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কখন তির ঘুরে তাদের দিকে চলে আসে ঠিক নেই। এই মুহূর্তে মুখ বন্ধ রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। কামিনী চৌধুরী কেবিনে ঢুকেই ছেলেকে জড়িয়ে কেঁদে উঠলেন। আশমিন ব্যথা পেলেও বাধা দিলো না। এক হাতে সামলে নিল মাকে। দায়িত্বে থাকা নার্স দ্রুত সরিয়ে নিল তাঁকে। নরম গলায় বলল, "এভাবে ধরবেন না, ম্যাম। সমস্যা হবে।"

কামিনী চৌধুরী বুঝলেন। ছেলের পাশে বসে গায়ে হাত বুলিয়ে কেঁদে উঠলেন। আশমিন আগলে ধরল তাঁকে। নরম গলায় বলল, "আমি ঠিক আছি, আম্মু। কাল-পরশু বাড়িতে চলে যেতে পারব। কেঁদো না।"

আমজাদ চৌধুরী মনে মনে ফুঁসে উঠলেন। হিংসাত্মক চোখে তাকিয়ে রইলেন তার বেয়াদব ছেলের দিকে। মায়ের সাথে মধু মাখিয়ে কথা বলছে। আর তাঁকে কিনা অনর্থক কতগুলো কথা শুনিয়ে দিলো!

মিজু সিদ্দিক আর সুমা সিদ্দিককে আশমিনের কাছে যেতে দেওয়া হয়নি। নিয়মের বাহানা দিয়ে তাদের দূরে রাখা হয়েছে। মিজু সিদ্দিক অপমানিত বোধ করছেন। আশমিন আর সাবার ব্যাপারটা বিরোধী দলের ওপর চাপিয়ে দিয়ে দায়সারা হয়েছেন আমজাদ চৌধুরী। গুলি খেয়ে মিজু সিদ্দিকের বানানো ফাঁদ থেকে খুব সহজেই বেরিয়ে গেছে আশমিন। আশমিনকে গুলি কে করেছে সেই ব্যাপারে তার কাছে কোনো ইনফরমেশন নেই। কাজটা কায়সার কামালের নয় তো! কেবিনের বাইরে ফোঁসফাঁস করতে থাকা সুমা সিদ্দিককে বাসায় যেতে বলে তিনি কায়সার কামালের পার্টি অফিসের উদ্দেশে বেরিয়ে গেলেন।

"নুর ঠিক আছে?"

আশমিনের প্রশ্নে মলিন হাসল অমি। মাথা নেড়ে নিচু গলায় বলল, "ভালো আছে, ভাইয়া। মায়ের কাছে আছে।"

আশমিনের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। থমথমে গলায় বলল, "কেন? হঠাৎ তোমাদের বাসায় যাওয়ার কারণ?"

অমি মাথা নিচু করে বলল, "যা ঘটছে তা ঠিক নয়, ভাইয়া। আব্বুর মৃত্যুতে আমরা সবাই কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু আলো মানসিকভাবে আঘাত পেয়েছে। আব্বুর চলে যাওয়ায় নিজেকে দায়ী করেছে ও। আপনাদের সবাইকে আব্বুর খুনি ভাবছে। ওর ভাবনাটাও অমূলক নয়। ডাকাত দলের একজন আপনাদের নাম নিয়েছিল। বলে ছিল, কিছু হলে চৌধুরীরা সামলে নেবে। ব্যাপারটা ওর মস্তিষ্কে গেঁথে গেছে। ও আপনাদের জন্য বিপদজনক, ভাইয়া। আজ এমন একটা অঘটন ঘটিয়েছে। ভবিষ্যতে আরও খারাপ কিছু করতে পারে। আম্মু আপাতত ওকে আমাদের বাড়িতেই রাখতে চাইছে। এতে আম্মুর সাথে ওর সম্পর্কটাও স্বাভাবিক হবে। আপনি চিন্তা করবেন না। আমরা ওকে সামলে নেব।"

আশমিন চোখ বন্ধ করে ফেলল। আপাতত নুরের দূরে থকাই শ্রেয়।

"নুরের খেয়াল রেখো। কয়েকদিন বাসা থেকে বের হতে নিষেধ করবে। আমি সুস্থ হয়ে ব্যাপারটা দেখছি।"

অমি ঘাড় নেড়ে সায় জানাল। লুবানা আর লতিফা চৌধুরী বাসায় চলে গেছেন। কামিনী চৌধুরী-সহ বাকি সবাই হসপিটালেই থাকবেন। অমি আর আলি রাতের খাবার আনতে বেরিয়ে গেল। আশমিন সানভিকে ইশারায় কাছে ডাকল। সানভির হৃৎস্পন্দন কয়েকগুণ বেড়ে গেল। আশমিনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখে এগিয়ে যাওয়ার সাহস হচ্ছে না তার। আশমিন ভ্রু বাঁকিয়ে তাকাতেই ধীর পায়ে এগিয়ে গেল সে।

"আমার বোনের দিকে দুষ্টু নজর দেওয়ার সাহস কী করে হলো তোমার? তোমাকে এভাবেই ছেড়ে দেবো, ভেবেছ? আমাকে একবার সুস্থ হতে দাও। তোমাকে বুর্জ খলিফার সফর করিয়ে আনব।"

"ওখানে কেন যাব, স্যার?"

"আমি হানিমুনে যাব।"

সানভি অবাক হয়ে বলল, "তাহলে আমি গিয়ে কী করব, স্যার?"

"কিছু করবে না। চুপচাপ রেলিং ঘেঁষে দাঁড়াবে। তারপর চুপচাপ কাঁপতে কাঁপতে অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়ে নিচে পড়ে যাবে। ব্যাপারটা নিঃশব্দে ঘটাতে হবে। বুঝতে পেরেছ?"

সানভি অসহায় মুখে ঘাড় নাড়ল। আশমিন থমথমে গলায় বলল, "এবার যাও, মিলনকে খবর দাও। দলের ছেলেদের ক্লাবে ডাকো। কাল দেখা হচ্ছে।"

"আপনি অসুস্থ, স্যার।"

"আমি ঠিক আছি, সান। এভাবে শুয়ে থাকলে শত্রুরা সারাজীবনের জন্য ঘুম পাড়িয়ে দেবে। কথা বাড়িয়ো না, সান। যা বলেছি তা করো।"

সানভি বেরিয়ে গেল। আশমিন আঘাতের জায়গায় হাত বুলিয়ে মলিন হাসল। জীবনের প্রথম গুলিটা তাকে তার ডাকাত–রানিই করেছে।

পরের দিন হাসপাতাল থেকে খুব গোপনে বেরিয়ে গেছে আশমিন। ডাক্তার বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও তাদের কথায় কান দেয়নি সে। সানভি আর বাহাদুর আশমিনের সাথেই আছে। অমি পার্টি অফিসে সবার সাথে আছে। আজ আলিকে সাথে নেয়নি আশমিন। আজকে আলির দূরে থাকাই ভালো। আশমিন পৌঁছে মিলনকে কাছে ডাকল। মিলন গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এলো তার কাছে।

"লারা কোথায়?"

"নিয়া আইছি, বস। ভেতরের রুমে আছে।"

"কিছু স্বীকার করেছে?"

মিলন মাথা নিচু করে বলল, "করে নাই, বস। মেলা ধুতা মাল! হারামজাদিরে যে অত্যাচার করছি! হের পরেও মুখ খুলে নাই। শালি আস্ত একটা বেশ্যা, ভাই। আমাগো বস্তির বেবাগ বেডাগো লগে বিছানা গরম করছে। একটা শেষ হইলেই আরেক বেডার কাছে গেছে। মাইয়া মাইনসের ইজ্জতের ডর না থাকলে আর কী দিয়া ডর দেখামু, কন?"

আশমিন হাসল। চেয়ারে গা এলিয়ে বসে বাহাদুরকে বলল, "বাহাদুর, গিয়ে একটু আদর সোহাগ করে আসো তো। আমার ইনফরমেশন চাই। যেভাবে পারো বের করে আনো।"

বাহাদুর এসিডের বোতল হাতে নিয়ে লারাকে রাখা রুমের দিকে এগিয়ে গেল। সানভি শুকনো মুখে অমিকে বলল, "এসিড দিয়ে কী হবে, স্যার?"

অমি হাসল। ফিসফিস করে বলল, "গোপন জায়গায় ঢালবে, সান। তুমি এসবে চোখ দিয়ো না। বাহাদুর সামলে নেবে।"

সানভি শিউরে উঠল। ভয়ার্ত চোখে আশমিনের দিকে তাকাল সে। আশমিন দলের ছেলেদের নিয়ে ড্রাগসের ব্যাপারে আলোচনা করছে। কাস্টমস কর্তৃপক্ষ থেকে তাকে এই ব্যাপারে জানানো হয়েছে। পুলিশের কাছে ব্যাপারটা পৌঁছানোর আগেই নিজকে এই জঞ্জাল থেকে বের করতে হবে।

ভেতর থেকে লারার আর্তস্বর ভেসে আসছে। অমির মুখ শুকিয়ে গেছে। আশমিনের নির্দয় হওয়ার গল্প সে অনেক শুনেছে। আজ নিজ চোখে দেখেও নিল।

বাহাদুর বিরক্ত মুখে বেরিয়ে এলো। আশমিন কপাল কুঁচকে বলল, "কিছু বলেছে?"

"থাইল্যান্ডে ব্রোথেল চালায় এই মেয়ে। মিজু সিদ্দিকের থেকে এই ব্যবসায় বেশি পারদর্শী সে। মেয়ে পাচারের বিজনেসও দেখাশোনা করে। এই পর্যন্ত কয়েক হাজার মেয়েকে বাইরের দেশে পাচার করেছে তারা। ও নিজেও এই ব্যাবসার সাথে জড়িত।"

"মেরে দাও।"

বাহাদুর মাথা নেড়ে সায় জানাল। সানভি শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে রইল। মাথা ঘুরছে তার। এই চাকরি একদিন তাকে হার্ট অ্যাটাক করিয়ে ছাড়বে!

মিজু সিদ্দিককে অনুসরণ করে কায়সার কামালের পার্টি অফিস পর্যন্ত পৌঁছে গেছে লিনা। বাবার গতিবিধি যথেষ্ট সন্দেহজনক। মিজু সিদ্দিক ভেতরে চলে গেলেও সে বাইরেই রয়ে গেছে। জায়গাটা শহর ছেড়ে অনেকটা দূরে। এমন নির্জন জায়গায় বাবার আসার কারণ কিছুটা আন্দাজ করতে পারছে সে। পুরোনো একতলা এই বিল্ডিংয়ের সামনে কয়েকটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ধীর পায়ে সে বিল্ডিংয়ের পিছনের দিকে চলে গেল। ভেজা স্যাঁতসেঁতে মাটিতে পা রাখতেই কিছু একটা ছুটে গেল। লিনা পাত্তা দিলো না। এগিয়ে গিয়ে জানালার খোঁজ করল সে। কয়েক মিনিটে পেয়েও গেল। ভেতর থেকে কয়েকজনের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

"আর সহ্য করা যাচ্ছে না, কামাল ভাই। এবার তো কিছু একটা করেন। আপনি তো শুধু মুখে মুখেই বড়ো বড়ো বুলি ছুড়েন। কাজের বেলায় কিছুই না।"

কায়সার কামাল লাথি মেরে মিজু সিদ্দিকের পাশের চেয়ারটা ফেলে দিলেন। রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে বললেন, "তুমি মিয়াঁ লম্বা কথা কইয়ো না। তোমার মাইয়ারে তো খাইয়া গুম কইরা দিছে। কোনো খোঁজ আইজ পর্যন্ত পাইলা না। আমারে আবার তেজ দেহাও। তোমার জন্মের পোলা তো ওগো দলের লোক। এদিক দিয়া কোটি টাকার মাল কাস্টমস অফিসারের হাতে ধরা পড়ছে। আমার তো মিয়াঁ সামনে পিছে দুই দিক দিয়াই বাঁশ। কয়মাস ধইরা তো মাইয়াও সাপ্লাই দিতাছ না। হুদাই তোমার ওপরে ভরসা কইরা বিদেশি ক্লাইন্টের কাছে বদনাম হইলাম মিয়াঁ।"

"আমি কী করব, বলেন? আশমিন সব দিকে চিলের মতো নজর দিয়ে রেখেছে। ওই মডেল দিয়া হাত করতে চাইছিলাম। মাগি তো আশমিনের দিওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। তাই ওরে পথ থেকে সরাতে হলো। সেই কেস থেকেও তো এই ঘটনার জন্য বেরিয়ে গেল।"

কায়সার কাদের মিজু সিদ্দিকের মুখোমুখি হয়ে বললেন, "এবার কী করতে চাও?"

"যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গেছে। এবার ওদের মরতে হবে। সবার আগে আমার জন্ম দেওয়া কালসাপটারে মারতে হবে। বউ-বাচ্চাসহ শেষ করে দেন। আর শিকদারের মেয়েরও একটা ব্যবস্থা করতে হবে। বিদেশে পাচার করে দিলে কেমন হয়?"

কায়সার কামাল কিটকিটিয়ে হাসলেন। ফ্লোরে থুতু ফেলে বললেন, "তুমি মিয়াঁ বহুত হারামি। সাবার লগে তো কম ফুর্তি করলা না। এই বয়সে এত জোর পাও কই? নিজের পোলারেও ছাড় দিলা না। যাও, কাম হইয়া যাইব। মন্ত্রীর বউরে আমি সামলায় নিমু। শরীলে আমার তেজও কিন্তু কম নাই। মন্ত্রীর মতো জোয়ান না হইলে কী হইব, সুখ কম দিমু না।"

কথা শেষ করেই কায়সার কামাল খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসলেন। লিনা আর কিছু শুনতে পারল না। মুখে হাত দিয়ে কান্না আটকে দ্রুত কল করল আলির কাছে। অফিসের মিটিংয়ে থাকায় ফোন সাইলেন্ট করে রেখেছে আলি। কয়েকবার কল করে আলিকে না পেয়ে হতাশ হয়ে গেল লিনা। নিজের বাবার প্রতি ঘৃণায় গা গুলিয়ে উঠল। এমন বাবার মেয়ে হওয়ার অপরাধে নিজেকে শেষ করে দিতে ইচ্ছে হলো তার। ধীর পায়ে বেরিয়ে এলো সেখান থেকে। আলির কাছে ম্যাসেজ লিখে গাড়িতে উঠে বসল। ঝাপসা চোখে স্টেয়ারিং ধরে রেখেছে সে।

মিটিং শেষ করে হসপিটালে ফিরে এসেছে আশমিন। অতিরিক্ত নড়াচড়া করার দরুন ক্ষতস্থানে ব্যথা করছে তার। কামিনী চৌধুরী ছেলের ওপর রেগে আছেন। আশমিন আসতেই কয়েক দফা ঝেড়েছেন তাকে। আশমিন মুচকি হেসে মাকে সামলে নিয়েছে। অমির সাথে তাঁকে বাসায় পাঠিয়েছে ফ্রেশ হতে। হাসপাতালে ফিরে নিজের ফোন চেক করল আলি। তিন ঘণ্টা আগে একটি আননোন নাম্বার থেকে অনেকগুলো মিসড কল এসেছে। নোটিফিকেশনে ম্যাসেজ দেখে ম্যাসেজ অপশনে ঢুকল আলি। লিনার করা ম্যাসেজ দেখে পায়ের নিচের মাটি দুলে উঠল তার। দ্রুত কল করল লিনার নাম্বারে। রিং হয়ে বারবার কেটে যাচ্ছে। আলির বিচলিত মুখ দেখে আশমিন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? এমন দেখাচ্ছে কেন তোকে?"

"ভাই, মিজু সিদ্দিক মৌরি আর আমাদের সন্তানকে মারার জন্য লোক ঠিক করেছে। কায়সার কামালের সাথে হাত মিলিয়েছে সে।"

তাকে ড্রেসিং করতে থাকা নার্সকে থামিয়ে দিলো আশমিন। ইশারায় বাইরে যেতে বলল তাকে। নার্স বেরিয়ে যেতেই ভ্রু কুঁচকে বলল, "তোকে কে বলল?"

আলির গলা কাঁপছে। সে দ্রুত ফোন পকেটে গুঁজে বলল, "লিনা জানিয়েছে। মেয়েটা একা একা ওই অমানুষটাকে ফলো করে সাভার পৌঁছে গেছে। ওই হায়েনার দলের হাতে পড়লে কী হবে, ভাবতে পারছিস? লিনাকে

খুঁজতে লোক পাঠা। ওর ফোন বন্ধ বলছে। আমাকে এক্ষুনি মৌরির কাছে যেতে হবে। হাতে সময় নেই।"

আশমিন আলিকে থামিয়ে দিলো। ফোন নিয়ে কল করল থানায়। কথা শেষ করে আলিকে বলল, "মাথা ঠান্ডা রাখ। তোর আগে পুলিশ পৌঁছে যাবে। তারা মৌরি আর আংকেলকে সেইফলি চৌধুরী-বাড়িতে পৌঁছে দেবে। মৌরিকে কল করে সাবধান করে দে।"

আলি মৌরিকে কল করল।

মৌরি বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিল। সারাদিন পরে আলির কল পেয়ে অভিমানে গাল ফোলাল সে। আলির কল কেটে ফোন বন্ধ করে দিলো। কথা বলবে না সে। মৌরির ফোন বন্ধ পেয়ে অস্থির হয়ে উঠল আলি। "ফোন বন্ধ বলছে। আমি যাচ্ছি, ভাই। তুই নিজের খেয়াল রাখিস।"

"দাঁড়া। বাহাদুর, তুমি আলির সাথে যাও।"

আলি আর বাহাদুর বেরিয়ে যেতেই আশমিন সানভিকে বলল, "নুরের বাড়ির বাইরে পাহারা বসাও, সান। অচেনা কেউ যাতে সেখানে ঢুকতে না পারে, খেয়াল রাখতে বলো।"

"ঠিক আছে, স্যার।"

মাথার উপর নিশাকর মেঘের সাথে লুকোচুরি খেলছে। সাত তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে একমনে চাঁদ দেখে যাচ্ছে নুর। দুদিন হলো আশমিনের দেখা পায়নি সে। অমির থেকে জেনেছে আশমিন ভালো আছে। হসপিটাল থেকে আজ বাসায় চলে গেছে। মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল সে। লোকটার কাছে সে অপরাধী। বারবার ফোন হাতে নিয়েও রেখে দিচ্ছে সে। কল করার সাহস হচ্ছে না তার। সে নিজেও নাফিজা শিকদারের কথা মেনে নিয়েছে। আশমিনের জীবনে সে সঠিক মানুষ নয়। লোকটা তাকে শর্তহীন ভালোবেসে অবজ্ঞা আর অবহেলা ছাড়া কিছুই পায়নি। সে তো আশমিনের প্রেমে পড়েছিল। এক সুদর্শন চেহারার ব্যক্তিত্ববান পুরুষকে দেখে তার মনের ভেতর অনুভূতির জন্ম হয়েছিল। প্রেমে পড়া আর ভালোবাসা তো এক নয়। ভালো তো তাকে মন্ত্রী সাহেব বেসেছে। তার দেওয়া আঘাত নীরবে সয়েছে। ঢাল হয়ে সবসময় তার পাশে থেকেছে। সে কী করেছে অপমান অবহেলা ছাড়া? মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল নুর। সূক্ষ্ম ব্যথায় বুকের পাঁজর ভেঙে আসছে তার।

আশমিনের সামনে হাত-পা বাধা অবস্থায় কায়সার কামাল বসা। বিরোধী দলের এত বড়ো একজন নেতাকে গুম করে দেওয়া মুখের কথা নয়। যা করার নিপুণভাবে করতে হবে। কায়সার কামালকে বাসা থেকে তুলে এনেছে সে। সাথে তার বিশ্বস্ত বডিগার্ড থাকায় কেউ সন্দেহ করেনি। এই গার্ডকে মোটা টাকায় কিনে নিয়েছে আশমিন। ফলস্বরূপ কায়সার কামাল তার সামনে।

"আমাকে ধরে এনে লাভ নেই, ছোড়া। কিচ্ছু করতে পারবি না আমার।"

"ছি, আমার এমন ঢ্যামনা পুরুষ মানুষে কোনো ইন্টারেস্ট নেই। আমার শুধু বউয়ের প্রতি ইন্টারেস্ট। পচা কথা বলবেন না, কাকু।"

আশমিনের ঢং দেখে আলি হাসল। এগিয়ে এসে কয়েক ঘা লাগাতেই আশমিন থামিয়ে দিলো, "আহা, মারিস না বেচারাকে। এমনিতেও কয়েক ঘন্টার মেহমানমাত্র। এর পরই তো জাহান্নামের উদ্দেশে রওনা হবে বেচারা।"

কায়সার কামাল ঘামছেন। হাতের বাঁধন খোলার চেষ্টা করে ছটফটে গলায় বললেন, "দেখ, আমাকে মেরে তোদের কোনো লাভ নেই। আমি তো তোর কোনো ক্ষতি করিনি। যা করার মিজু করেছে। তোদের বিজনেসের আড়ালে ড্রাগসের ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছে। তোর শ্বশুরকেও ওর বউয়ের ঠিক করা লোকেরা মেরেছে। আমি এর সাথে জড়িত না। আমাকে ছেড়ে দে।"

আশমিন থমথমে মুখে বলল, "আমি কেন আপনাকে মারতে যাব? আমাকে কি আপনার এমন নিষ্ঠুর মনে হয়? এমন ভাবেন আমাকে আপনি? কষ্ট পেলাম, কাকু।"

আশমিন কষ্ট পাওয়ার ভান করে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা সানভির দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, "আংকেলকে গাড়িতে তুলে দাও, সান। বেচারা কিছু করেনি। একেবারেই নির্দোষ।"

সানভি কায়সার কামালকে তার গাড়িতে বসিয়ে দিলো। ড্রাইভিং সিটে বসে ক্রুর হাসলেন তিনি। আশমিনকে মনে মনে বোকা বলে ভর্ৎসনা দিয়ে খুশিমনে গাড়ি স্টার্ট দিলেন। আশমিন পকেটে হাত গুঁজে দাঁড়িয়ে রইল। কায়সার কামালের গাড়ি বেরিয়ে যেতেই আলি আর আশমিন হাসল। পকেটে থেকে ফোন বের করে কানে গুঁজে বলল, "বাহাদুর, শিকার বেরিয়ে গেছে। উড়িয়ে দাও বেচারাকে। এত নিষ্পাপ মানুষের জন্য এই পাপের পৃথিবী উপযুক্ত নয়।"

গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে বিরোধী দলের নেতার আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে আশমিন। সাংবাদিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজের আবেগ খোলাখুলি প্রকাশ করে তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছে সে। নিজে গিয়ে তার দাফন-কাফনে শরিক হয়েছে। দেশের জনগণ আশমিনের এই উদারতা খুব ভালোভাবেই গ্রহণ করেছে। নিউজ চ্যানেলগুলোও এটা খুব ফলাও করে প্রকাশ করছে ।

এক সপ্তাহ পরই শ্বশুরবাড়িতে হাজির হয়েছে আশমিন। গাড়ি ভরতি বাজার নিয়ে নতুন জামাইয়ের মতো বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করতেই আশেপাশের ফ্ল্যাট থেকে সবাই বেরিয়ে এসেছে। ইয়াং হ্যান্ডসাম মন্ত্রীকে সামনাসামনি দেখে বিল্ডিংয়ের তরণীদের চোখ বেরিয়ে আসার উপক্রম। শুভ্র পাঞ্জাবিতে এক টুকরো পনিরের মতো লাগছে আশমিনকে। আশমিনের কারও দিকে নজর দেওয়ার সময় নেই। বউ ছাড়া সে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট করে ফেলেছে। বউ ছাড়া জীবনকে আবার জীবন বলে নাকি? ছি! দ্রুত পায়ে লিফটে ঢুকল সে। আলি আশমিনের তাড়াহুড়ো দেখে টিপ্পনী কেটে বলল, "আস্তে ভাই, তোর বউ পালিয়ে যাচ্ছে না।"

"তুই চুপ কর, গেদার বাপ। লজ্জাহীন মানুষের সাথে আমি কথা বলি না।"

"আমি আবার নির্লজ্জের মতো কী করলাম?"

আশমিন কটমট করে তাকাল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "কী করা বাকি রেখেছিস? সিনিয়রদের সামান্য সম্মানটুকু দিতে এত কষ্ট তোর? বিয়ে করে বছর না ঘুরতেই বাচ্চার বাপ হতে হবে? এত তাড়া! দেশের গণ্যমান্য মন্ত্রী এখনো সুখবর পেল না। আর তুই তাকে অপমান করে বাচ্চা কোলে নিয়ে ঘুরবি? কোনো নৈতিকতা নেই? দেশে কি প্রোটেকশনের অভাব ছিল? ইরেস্পন্সিবল পিপলস!"

সানভি শব্দ করে হাসতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল। আলি অসহায় গলায় বলল, "উত্তেজনায় প্রোটেকশনের ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিলাম, ভাই। সরি! আর কিছু বলিস না প্লিজ। আশেপাশে ছোটো মানুষ আছে।"

আশমিন চশমার ফাঁকে সানভিকে দেখল। সানভিকে ঠোঁট টিপে হাসতে দেখে গম্ভীর গলায় বলল, "ও তোর মতো অসভ্য নয়। যথেষ্ট ভদ্র ছেলে ও। বড়োদের সম্মান করে। তাই ও কখনো বিয়ে করবে না। তাই না, সান?"

সানভির হাসি থেমে গেছে। তার যে জীবনে বিয়ে করা হবে না, সে নিশ্চিত। এই লোকের বোনকে বিয়ে করে জীবন প্লাস্টিক করার চেয়ে সে চিরকুমার থাকবে সেটাই ভালো। চোখের সামনে লুবানার চেহারা ভেসে

উঠতেই সানভি গলে গেল। সিদ্ধান্ত বদলে মিনমিনে গলায় বলল, "বিয়ে না করলে গার্লফ্রেন্ড খুব বকবে, স্যার!"

আশমিন মনে মনে হাসল। লুবানার জন্য সানভি একেবারে যোগ্য পাত্র। এমন সরল মনের মানুষ আজকাল পাওয়া যায় না। লতিফা চৌধুরীর সাথে কথা বলেছে সে। তিনি অমত করেননি। হুট করেই একদিন চার হাত এক করে ছাগল দুটোকে চমকে দেবে।

কলিংবেল চেপে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে আশমিন। বিল্ডিংয়ের সবাই তার আসার খবর পেয়ে বেরিয়ে এসেছে। অথচ তার শ্বশুরবাড়ির কারোর হুঁশ নেই! কয়েকবার কলিংবেল চাপতেই আশিয়ান দরজা খুলে দিলো। দরজার বাইরে আশমিনকে দেখে নিঃশব্দে সরে দাঁড়াল সে। আশমিন ভদ্র বাচ্চার মতো ভেতরে ঢুকল। আশিয়ানের পিঠে জোরে এক থাবা বসিয়ে এক হাতে গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "কী রে শালা, কী খবর? সব ঠিকঠাক?"

আশিয়ানের পিঠ বাঁকা হয়ে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করে বলল, "জি, শালার ভাই। সব ঠিকঠাকই আছে।"

"সোজা তোমার বোনের রুমে যাও। গিয়ে বলবে তার একমাত্র বর তার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে। মুরব্বিরা আসার আগেই টুপটাপ কয়েকটা চুমু খেয়ে ফেলতে হবে। এসব ব্যাপার ফেলে রাখতে নেই।"

আশিয়ান মুখ কুঁচকে ফেলল। বিড়বিড় করে "নির্লজ্জ" বলতেই আশমিন গম্ভীর গলায় বলল, "আমি শুনেছি, শালা। এর ফল তোমার বিয়ের পর হাতেনাতে পাবে। তোমাকে যদি বান্দরবান ট্রান্সফার না করেছি তাহলে আমিও তোমার দুলাভাই নই। বউ দূরে থাকার মজা তখন হাড়ে হাড়ে বুঝবে।"

আশিয়ান আর কথা বাড়াল না। দ্রুত পায়ে ভেতরে চলে গেল। নাফিজা শিকদার নামাজ পড়ছিলেন। আশমিনের গলা শুনে ড্রয়িংরুমে আসতেই ভড়কে গেলেন। এত বাজার দেখে অস্থির গলায় বললেন, "এত কিছু এনেছেন কেন, বাবা? আমরা এই কয়জন মাত্র মানুষ। আশিয়ান তো সারাদিন বাসায়ই থাকে না। সব তো নষ্ট হবে।"

আশমিন নাফিজা শিকদারকে সালাম দিয়ে তাঁকে এক হাতে জড়িয়ে ধরল। মুচকি হেসে কুশল বিনিময় করে বলল, "একা খাবেন কেন, আন্টি? সবাইকে দিয়ে খাবেন। বিল্ডিংয়ের সবার বাসায় অল্প করে দিলে এতগুলো থাকবে না।"

নাফিজা শিকদার সন্তুষ্ট হলেন। আশমিনকে বসতে বলে নিজেও বসে পড়লেন। আলি আমতা আমতা করে বলল, "আন্টি, পিঠা নেই?"

নাফিজা শিকদার হেসে ফেললেন, "আছে, বাবা। তুমি বসো। আমি নিয়ে আসছি।"

নাফিজা শিকদার যেতেই আশমিন উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণ অপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। শালাটা কোনো কাজের না। এর কপালে বান্দরবানের জঙ্গলই লেখা আছে। অপদার্থ একটা!

বউয়ের রুমে অসভ্যের মতো ঢুকে পড়ল সে। খাটের এক কোনায় জড়সড়ো নূরকে দেখে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল। এক হাত থুতনিতে রেখে মুখ উঁচু করতেই বুকে চিনচিন ব্যথা হলো তার। এই কয়েকদিনে চেহারার কী হাল করেছে মেয়েটা! চোখের নিচে গাঢ় কালির প্রলেপ তার রাত জাগার গল্প বলে দিচ্ছে। আশমিন টেনে নিজের বুকের মাঝে চেপে ধরল তার ডাকাত–রানিকে। প্রিয় পুরুষের ছোঁয়া পেয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল নূর। দুহাতে আঁকড়ে ধরল তাকে। আশমিন বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। এতদিন পরে ভালোবাসার আলিঙ্গন পেল সে। এই আলিঙ্গনের অপেক্ষায়ই তো ছিল। দুহাতে নূরের চোখ মুছে কপালে ঠোঁট ঠেকাল আশমিন। বুকে চেপে ধরে নরম গলায় বলল, "কেঁদো না, সহ্য করতে পারি না।"

নূর থামল না। কাঁদতে কাঁদতে অস্পষ্ট গলায় বলল, "সরি, আমি এমন কিছু চাইনি। বিশ্বাস করুন!"

"হুস, আমি জানি, জান আমার। কেঁদো না।"

আশমিন নূরকে বুকে চেপে বসে পড়ল। বহুদিন পরে প্রেমিক পুরুষের বুকে লেপটে রইল নূর।

"আমার সাথে চৌধুরী-বাড়িতে যাবে না, নূর?"

নূর মাথা নিচু করে ফেলল। ওই বাড়ির মানুষগুলোর মুখোমুখি হতে অস্বস্তি হচ্ছে তার। তাছাড়া মায়ের আদেশ অমান্য করে সে কীভাবে যাবে? আশমিন নূরের মনের কথা বুঝে ফেলল। শান্ত গলায় বলল, "তোমার মতামতটা জানাও, নূর। বাকি সব আমার ওপর ছেড়ে দাও। যাবে তো আমার সাথে?"

নূর আশমিনের বুকে মাথা রেখেই ঘাড় নাড়ল। আশমিন নূরের ঠোঁটে লম্বা চুমু খেয়ে বলল, "তৈরি হয়ে নাও। আমরা বের হব। তোমার জন্য সারপ্রাইজ আছে।"

নাফিজা শিকদারের থেকে বিদায় নিয়ে নূর আর আশমিন বেরিয়ে পড়ল। মৌরির কল আসায় আলি চৌধুরী-বাড়িতে ফিরে গেছে। একটা ভাঙা বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামল আশমিনের। গাড়ি থেকে নেমে অবাক চোখে

চারিদিকে চোখ বুলাল নুর। নুরের হাত ধরে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল আশমিন। ভেতরে ঢুকতেই এক ভ্যাপসা গন্ধ নাকে বাড়ি দিয়ে গেল। মেঝেতে চোখ পড়তেই শিউরে উঠল নুর। কয়েকটা কঙ্কাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। আশমিন শান্ত গলায় বলল, "এগুলো তোমার বাবার খুনিদের কঙ্কাল, বউ। হাই বলো।"

নুর চোখ বড়ো বড়ো করে তাকাল। আশমিন নিষ্পাপ মুখ করে বলল, "এভাবে তাকিয়ো না, সোনা। তোমাকে দেখাব বলে আমি খুব যত্ন করে রেখেছি তাদের।"

নুরের মাথা ঘুরে উঠল। আশমিনকে শক্ত করে ধরে বলল, "আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলুন। আমার ভালো লাগছে না।"

আশমিন তৎক্ষণাৎ নুরকে নিয়ে বেরিয়ে এলো। গাড়িতে বসিয়ে নুরের দিকে পানি এগিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি ঠিক আছ?"

নুর পানি খেয়ে মাথা নেড়ে সায় জানাল। আশমিন গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বলল, "আসল অপরাধী এখনো বেঁচে আছে, বউ। কাল তার সাথে দেখা করব। ঠিক আছে?"

চৌধুরী-বাড়িতে নুরকে খুব স্বাভাবিকভাবেই বরণ করা হলো। কামিনী চৌধুরী নিজে এসে নুরকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। অনেক তো ক্ষোভ পোষা হলো। এবার না-হয় একটু ভালোবেসেই দেখা যাক। নুরের চোখ আর্দ্র হয়ে এলো। অপরাধবোধে মাথা নিচু হয়ে গেল তার। কাসেম শিকদারের বলা মিথ্যার জের ধরে এই মানুষগুলোর সাথে অন্যায় করেছে সে। যদিও কাসেম শিকদার সবিস্তারে স্বীকার করেছেন। তবে এর জন্য তিনি মোটেও অনুতপ্ত নন। তাই নুর তার সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

চেনা পরিচিত বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাতের আকাশ দেখছে নুর। বাবার হত্যাকারী শাস্তি পেয়েছে। আশমিন তাদের কতটা ভয়ংকর মৃত্যু দিয়েছে ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে তার। আশমিন এসে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল নুরকে। গলায় নাক ঘষে ফিসফিস করে বলল, "আমাকে ভাবছিলে, তাই না?"

"উঁহুঁ, আমার কুমির প্রেমিককে ভাবছিলাম।"

আশমিন নুরকে নিজের সাথে চেপে ধরে বলল, "আমি কিন্তু কুমিরের চেয়ে কোনো অংশে কম নই। ট্রাই করে দেখতে পারো। একটা কামড়ও কম দেবো না।"

নুর ছোটার চেষ্টা করতেই আশমিন আরও শক্ত করে চেপে ধরল তাকে। গলার ভাঁজে মুখ ডুবিয়ে অস্থির গলায় বলল, "আর না প্লিজ, আর দূরে থেকো না। সহ্য হয় না। একটু ভালোবাসি? প্লিজ!"

নুর কেঁপে উঠল। আশমিনের অস্থির আকুলতায় লজ্জায় চোখ নত হলো তার। আশমিন উত্তরের আশায় নেই। নিজের মতো উত্তাপ ছড়াচ্ছে নুরের গায়ে। অনুভূতির জাঁতাকলে ছটফট করতে থাকা নুরের শাড়ির ভাঁজে হাত গলিয়ে কোলে তুলে নিল সে। ফুলহীন বিছানায় নুরের কোমল দেহখানা আস্তে করে রেখে ঠোঁটে ঠোঁট ডুবাল। রাত বাড়ার সাথে সাথে রুমের উত্তাপ বেড়ে গেছে। সারা রুম জুড়ে অস্পষ্ট গোঙানি পরিবেশ মাতাল করে তুলছে। সাদা বালিশে নুরের কাজলরাঙা চোখের পানির দাগ লেগে গেছে। সারা রাতের তাণ্ডবে নেতিয়ে পড়েছে নুর।

আশমিন সকাল সকাল তৈরি হয়ে গেছে। শুভ্র পাঞ্জাবিতে নিজেকে জড়িয়ে স্বভাবতই শান্ত মেজাজে কফিতে চুমুক দিচ্ছে। বউয়ের চোখ রাঙানিতে মনোযোগ নেই তার। পত্রিকার পাতায় মিজু সিদ্দিকের কাটাছেঁড়া লাশটা মনোযোগ দিয়ে দেখছে সে। গতকাল রাতেই এই অমানুষটাকে দলের ছেলেদের হাতে তুলে দিয়েছিল সে। সবাই নিজেদের হাতের কারিশমা নিপুণভাবে দেখিয়েছে। অধর বাঁকিয়ে হাসল আশমিন।

নুর ধীর পায়ে নিচে নামল। এই মুহূর্তে নড়াচড়া করার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তার, কিন্তু ওয়াশরুমে যাওয়া প্রয়োজন। নুরকে নামতে দেখে এগিয়ে এলো আশমিন। ধরতেই ফোঁস করে উঠল নুর। কটমট করে বলল, "দূর হন। কাল রাতের কথা মনে আছে আমার। বর্বর মন্ত্রী!"

আশমিন আলাভোলা চোখে তাকিয়ে বলল, "আমি কী করলাম?"

"একদম ঢং করবেনা না! শরীরে দাগ বসিয়ে এখন নাটক করা হচ্ছে? একদম কাছে ঘেঁষবেন না। সামাজিক দূরত্ব বাজায় রাখুন, অসভ্য মানুষ!"

"বারে! আমি তো কুমিরের চেয়ে ভালো পারফরম্যান্স দিতে চেয়েছিলাম। এখন সব দোষ আমার, তাই না?"

নুরের বিন্দুমাত্র শক্তি নেই ঝগড়া করার। তাই সে কথা বাড়াল না। জেদ করে একা উঠতে গেলেই আশমিন কোলে তুলে নিল তাকে। দুষ্টু চোখে তাকিয়ে বলল, "তোমাকে খুব হট লাগছে, বউ। আসো, একটা চুমু খাই।"

নুর মুখ ঘুরিয়ে নিল। থমথমে গলায় বলল, "আমি কুমিরমুখো মানুষের চুমু খাই না। দূরে যান।"

আশমিন হাসল। বউয়ের কথায় কান না দিয়ে চুমু খাওয়ায় ব্যস্ত হলো সে।

আশমিন গম্ভীর মুখে বাড়ির আউট হাউজে বসে আছে। আলির ওপর চরম চটে আছে সে। বদ বাপের শোকে কোন কোনায় গিয়ে মাতম করছে, কে জানে। এদিকে একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী তার অপেক্ষায় বন্দুক হাতে বসে আছে। টোটালি ম্যানারসলেস ছেলে একটা!

আলি এলো মিনিট দশেক পরে। আশমিনের পাশে বসে হাই তুলে বলল, "এত সকালে ডাকিস কেন, ভাই? সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা আমার দ্বারা প্রায় অসম্ভব।"

"এই মহিলাকে উপরে পাঠাতে হবে। ভাবলাম তোর হয়তো ব্যাপারটা ভালো লাগবে। তাই ডেকেছি।"

আলি চোখ তুলে সুমা সিদ্দিককে দেখে সোজা হয়ে বসল। হাত-পা বাঁধা সুমা সিদ্দিক ফ্লোরে কই মাছের মতো কাতরাচ্ছেন। আশমিন ঘড়ি দেখল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে মন্ত্রণালয়ে পৌঁছাতে হবে। সানভির ওপর চরম মেজাজ খারাপ হলো তার। নুরকে আনতে গিয়ে আটকে গেছে গাধাটা। মিনিমাম কার্টেসি নেই।

সানভি নুরকে নিয়ে আসতেই আশমিন উঠে দাঁড়াল। নুরের হাতে রিভলবার তুলে দিয়ে বলল, "উনিই তোমাদের বাড়িতে ডাকাতগুলো পাঠিয়েছিল, নুর। তোমার বাবার খুনের পিছনে দায়ী এই মহিলা।"

নুর শান্ত চোখে তাকাল মেঝেতে ছটফট করতে থাকা সুমা সিদ্দিকের দিকে। সুমা সিদ্দিকের দিকে রিভলবার তাক করে আশমিনের দিকে তাকাল। আশমিন শান্ত গলায় বলল, "শুট।"

নুর টলমলে ঝাপসা চোখে ট্রিগার চাপতেই গুলি সুমা সিদ্দিকের বুকে বিঁধে গেল। একে একে সবগুলো গুলি তার বুকে বিঁধিয়ে দিয়ে থামল নুর। কাঁপতে থাকা নুরকে বুকে জড়িয়ে নিল আশমিন। আলি এক দৃষ্টিতে সুমা সিদ্দিকের নিথর শরীরটা দেখছে। এই মহিলার রূপে পাগল হয়েই তো তার জন্মদাতা তাদের ত্যাগ করেছিল। আজ সেই রূপসী মহিলাকে কতই না বীভৎস লাগছে!

নুর কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আব্বুর কাছে যাব, প্লিজ নিয়ে চলুন।"

"যাব তো। কালই নিয়ে যাব। এখন রুমে গিয়ে রেস্ট নাও।"

আশমিন সদর দরজা পর্যন্ত নুরকে পৌঁছে দিয়ে ফুলিকে ডাকল। বরাবরের মতো এবারও ছুটে আসতে গিয়ে দেওয়ালের সাথে বাড়ি খেল সে। কপাল ঘষতে ঘষতে আশমিনের সামনে এসে দাঁড়াল। আশমিন ফুলির হাতে দশটাকা গুঁজে দিয়ে বলল, "তোর ভাবিকে ভেতরে নিয়ে যা।"

নুরকে বিদায় দিয়ে বাহাদুরকে আউট হাউজ পরিষ্কার করতে বলে বেরিয়ে গেল আশমিন। জীবন আজ ঝামেলামুক্ত।

FREE PDF PETE FOLLOW TELEGRAM, CLICK KORUN

@ebook_bangla_robinhood

CamScanner



দারোয়ান রহমত আলির সাথে সাপে-নেউলে সম্পর্ক ফুলির। অজানা কারণে রহমত আলিকে সে সহ্য করতে পারে না। এই ছেলের বোকা বোকা চাউনি দেখলেই মেজাজ খারাপ হয় তার। বাগান থেকে লেবু পেড়ে বের হতেই রহমত আলি এগিয়ে এলো। ফুলির দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, "খাড়াও, ফুলবানু। ইদানীং তোমার ভাবসাব কিঞ্চিৎ বদলাইয়া গেছে। শুনলাম ছোডো ম্যাডামের লগে সই পাতাইছ?"

দারোয়ান রহমত আলির কথায় সোজা হয়ে দাঁড়াল ফুলি। তার দিকে না তাকিয়ে সামনে চোখ রেখে হালকা মাথা নাড়িয়ে বলল, "ঠিক শুনছেন। ভাবি ভালা মানুষ। তাই হের লগে থাকতে ভালা লাগে।"

বাগানে বসে বাবার সাথে কফি খাচ্ছিল আশমিন। দুজনের কথা শুনে সমস্ত ধ্যান সেদিকেই দিলো সে।

ফুলবানুর কথা শুনে রহমত আলি বিরক্ত মুখে বলল, "আমাগো স্যার নিশ্চয়ই খারাপ লোক না, ফুলবানু? স্যারের মতো অমন সজ্জন ব্যক্তিরে রাইখা তুমি শত্রুপক্ষের সাথে হাত মিলাইয়া কাজটা ভালো করো নাই। বেইমান মেয়েমানুষ!"

ফুলবানু রেগে গেল। রহমত আলির দিকে না তাকিয়েই গজগজ করতে করতে বলল, "আপনে একটা বেয়াদপ ব্যাটাছেলে, রহমত আলি। আপনের লগে কতা কইতে ম্যাডাম নিষেধ করছে। ম্যাডাম বলছে, তোমার স্যারের কোনো চ্যালার সাথে কথা বলবা না, ফুলি। তোমার স্যার খুব অসভ্য মানব। এক্কেবারে গুয়ের পোকার মতো জঘন্য। তার চ্যালাগুলোও তা-ই। তাই তাদের থেইক্কা দূরে থাকবা।"

ফুলবানুর কথা শুনে গরম কফিতে আশমিনের মুখ পুড়ে গেল। নিজের এমন ঘৃণ্য উদাহরণ দেখে বিরক্তিতে কপাল কুঁচকে গেল তার। আমজাদ চৌধুরী ছেলের করুণ মুখ দেখে মিটমিট করে হাসছেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সানভি নিজের পেট ফেটে বেরিয়ে আসা হাসি গিলে ফেলল। ফুলবানুর এমন কথায় স্তব্ধ হয়ে কথা বলা ভুলে গেল রহমত আলি। আশেপাশের কয়েকজন গার্ডের দিকে চোখ বুলিয়ে নিচু গলায় ধমক দিয়ে বলল, "গর্দভ

মেয়েছেলে! স্যার শুনলে আর আস্ত রাখব না, কান খাড়া কইরা শুইনা রাখো, ফুলবানু। তোমার কর্মকাণ্ড এমন থাকলে আমি তোমারেও শত্রুপক্ষ ঘোষিত করতে বাধ্য হইমু।"

আশমিন আর শুনতে পারল না। অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা সানভিকে ডেকে বলল, "দুটোকে কান ধরে পুকুরপাড়ে দাঁড় করিয়ে রাখো, সান। আর তোমার ম্যাডাম অফিস থেকে ফিরলে আমাকে খবর দেবে। তার সাথে গোপন আলোচনায় বসতে হবে।"

আমজাদ সাহেব শব্দ করে হেসে ফেললেন। ছেলের বেহাল অবস্থা দেখে ইদানীং তাঁর দিনকাল ভালোই যাচ্ছে।

"হাসছ কেন? কাল রাতে আম্মু তোমাকে রুম থেকে বের করে দিয়েছে, জানি না ভেবেছ?"

আমজাদ চৌধুরী চুপ করে গেলেন। মুখের সামনে পত্রিকা ধরে চুপ করে বসে রইলেন। এই ছেলের সামনে হাসাও যাবে না। আস্ত বেয়াদব পয়দা করেছেন তিনি।

আশমিন রুমে ঢুকতেই দেখল নুর ল্যাপটপে কাজ করছে। মাসখানেক হলো সিনিয়র ক্রাইম রিপোর্টার হিসেবে জয়েন করেছে সে। গত এক সপ্তাহ যাবৎ আশমিনের সাথে কথা বলছে না নুর। বউয়ের রাগের কারণ খুঁজতে খুঁজতে অবস্থা নাজেহাল তার। অথচ এই নিষ্ঠুর মেয়ের কোনো হেলদোল নেই! আশমিন নুরের সামনের সোফায় বসল। গম্ভীর গলায় বলল, "আমাকে একটা অসভ্য নোংরা পোকার সাথে তুলনা করতে ঠোঁট কাঁপল না তোমার?"

"নাহ।"

নুরের স্পষ্ট জবাবে দমে গেল আশমিন। হঠাৎ হঠাৎ বউয়ের রেগে যাওয়ার রোগ আছে। তাই বলে রেগে সপ্তাহ পার করে দেবে? এ কেমন অবিচার! আশমিন নুরের গা ঘেঁষে বসল। নুরকে টেনে কোলে বসিয়ে নরম গলায় বলল, "কী হয়েছে, বউ? রেগে আছ কেন?"

নুর জবাব দিলো না। চুপচাপ বসে রইল। আশমিন হাল ছেড়ে দিলো। বউয়ের গালে চুমু খেয়ে বলল, "আচ্ছা, সরি। আর কোনো ভুল হবে না।"

"আমাকে সরি বলছেন কেন? সুন্দরী মেয়েদের গা ঘেঁষে বসে থাকুন গিয়ে।"

আশমিন বুঝল। গত সপ্তাহে এক কলেজ পড়ুয়া মেয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলেছে। এতেই চটে গেছে তার বউ। আশমিন মুচকি হেসে

নুরকে আদর করে বলল, "তুমিই আমার চোখে সেরা সুন্দরী, বউ। তুমি আমার আমরণ তৃষ্ণা। যা পৃথিবীর অন্য কাউকে দিয়ে-ই মিটবে না।"

স্বামীর উষ্ণ স্পর্শে গলে গেল নুর। নিজেও সাড়া দিলো আশমিনের ছোঁয়ায়।

আলির মেয়ে হয়েছে। মেয়ের নাম রেখেছে আয়েশা। মেয়েকে দেখলেই তার চোখের সামনে মায়ের মুখটা ভেসে ওঠে। লিনা এখন তাদের সাথেই থাকে। বাবা-মা আর বোনকে হারিয়ে মানসিকভাবে খুব ভেঙে পড়েছিল সে। সেসময় আলি তার পাশে থেকেছে। শক্ত হাতে সামলেছে বোনকে। ছোটো আয়েশাকে সারাক্ষণ নিজের কাছেই রাখে লিনা। আলি আর মৌরি লিনাকে স্বাভাবিক হতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে।

অমি বিয়ে করেছে কয়েক মাস হলো। নাফিজা শিকদার নিজে পছন্দ করে বিয়ে করিয়েছেন ছেলেকে। আশিয়ান ক্যারিয়ার গড়তে ব্যস্ত। তাদের সংসার ভালোই চলছে। আগামী মাসে সানভি আর লুবানার বিয়ে। সানভির থাকা বাড়িটাতে রেনোভেশনের কাজ চলছে। এই মাসেই শেষ হবে। বিয়ের পর লুবানা সেখানেই থাকবে।

আশমিন কবরস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। সামনেই রাফসান শিকদারের কবর। কবর জিয়ারত করে দেওয়ালের বাইরে দাঁড়ানো নুরের দিকে তাকাল আশমিন। নুর এক দৃষ্টিতে বাবার কবরের দিকে তাকিয়ে আছে। ভেজা চোখে মনে মনে বাবাকে বলল, "তোমার খুনিরা তাদের শাস্তি পেয়েছে, আব্বু। তবুও কেন মন শান্ত হয় না? তাদের মৃত্যু কেন তোমার শূন্যতা ছাপিয়ে আমার হৃদয় শান্ত করতে পারে না, আব্বু? আমি তোমাকে খুব মিস করি। তোমাকে খুব ভালোবাসি, আব্বু।"

আশমিন বাইরে এসে নুরকে আগলে ধরল। আশেপাশে পুলিশ আর গার্ডদের তোয়াক্কা না করেই স্ত্রীকে বুকে জড়িয়ে নিল সে। মাথায় হাত বুলিয়ে নরম গলায় বলল, "হুস, কাঁদে না। আংকেল ভালো আছে। বেশি বেশি দোয়া করো তার জন্য। এভাবে কাঁদলে আংকেল কষ্ট পাবে।"

নুর চোখ মুছল। স্বামীর বুকে পরম আবেশে লেপটে রইল সে। এই উষ্ণ পরশে একটা জীবন কেটে যাক!

সমাপ্ত